সতী দেহখণ্ডপাতে একান্ন পীঠের বিশ্বাস্যতা সম্পর্কে

তিব্বতে কোন অসাধারণ মানুষের দেহত্যাগ ঘটিলে সেই দেহের সংস্কার নানা প্রকারেই হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে একটি এই যে, মৃত দেহের পূর্ণ অংশ অথবা অংশ বিশেষ লইয়া তাহার উপর সমাধি অথবা স্তূপ নির্মাণ করা। কেশ, অস্থি, নখ, দন্ত প্রভৃতি মহান ব্যক্তির মৃতদেহের কোন অংশই সেখানে ফেলা যায়না। এমনকি হাড়গুলি পর্যন্ত মালা করিয়া ধারণ করা হয়।

ভারতে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার নখ, চুল, দাঁত লইয়া কত কত স্তূপ নির্মিত হইয়াছে। অবশ্য সে সকল হয়তো তাঁহার জীবিত অবস্থায়ই সংগৃহীত, কিন্তু তিব্বতে দেহত্যাগের পরেও এগুলি সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই প্রকার ব্যবহার যে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর ভারতে আচরিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট।..... বুদ্ধ অপেক্ষা শিব অনেক প্রাচীন কালের মানুষ, আর কৈলাস হইল তাঁহার অতি প্রিয়স্থান, যাহা তিব্বতের মধ্যে বলিয়াই আমরা জানি, সুতরাং এ-প্রথা তিব্বত হইতে ভারতে আসিয়াছে ধরিলে ভূল হয়না। কাজেই সেকালে সতীর দেহত্যাগের পর সেই শরীর বহুধা খণ্ডিত করিয়া ভারতের সর্বত্র ছড়ানো হইয়াছে—ইহা আমার মোটেই কাল্পনিক মনে হয়না। প্রথমে শিব প্রচারিত তন্ত্রধর্মের প্রত্যেক কেন্দ্রেই উহা ক্ষুদ্র স্তূপাকারে রক্ষিত হইয়াছে। ক্রমে তাহার উপর মন্দির উঠিয়াছে, পরবর্তীকালে তাহার মধ্যে মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাই ভারতের মহাপীঠের আদি ইতিহাস।

—প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ, প্রথম খণ্ড

পৃঃ ৩২৬।

মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে

নিগূঢ়ানন্দ



শরৎ পাবলিশিং হাউস
১৮/এ টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
সত্যেন্দু চ্যাটার্জী

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

ফ্যান্সী বাইণ্ডার্স-এর সৌজন্যে

মুদ্রাকর :
শ্রীমুকুল চক্রবর্তী
দি প্রিণ্টকো
৭/৮ নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড
কলিকাতা-৭০০০১১

কুড়ি টাকা

যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

গ্রন্থের নাম	রচনাকাল
১। হেবজ্রতন্ত্র	অষ্টম শতাব্দী
২। রুদ্রযামল	একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ
৩। কালিকাপুরাণ	দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত
৪। কুব্জিকাতন্ত্র	বেশ প্রাচীন (সময় অজ্ঞাত)
৫। দেবী ভাগবত	১১০০ খ্রীষ্টাব্দ
৬। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল	১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ
৭। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল	১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ
৮। জ্ঞানার্ণবতন্ত্র	ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ
৯। তন্ত্রচূড়ামণি	ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ
১০। পীঠমালাতন্ত্র	পঞ্চদশ, ষোড়শ অথবা সপ্তদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দী
১১। পীঠনির্ণয়	১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ
১২। কুলার্ণবতন্ত্র	উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ
১৩। প্রাণতোষণী তন্ত্র	১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ
১৪। শঙ্করাচার্যের অষ্টাদশ পীঠবর্ণনা	সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ
১৫। শিবচরিত	অষ্টাদশ শতাব্দী
১৬। ষট্‌চক্রনিরূপণ, শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরি	১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ
১৭। সাধন মালা	সময় অজ্ঞাত
১৮। মহেন-জো-দড়োর লিপি ও সভ্যতা —রাজমোহন নাথ বি.ই. তত্ত্বভূষণ	১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ
১৯। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব —ডঃ নীহাররঞ্জন রায়	১৩৫৬ বঙ্গাব্দ
২০। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ	১৯৫৬-৫৮ খ্রীষ্টাব্দ

২১। পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন
—ভূপতিরঞ্জন দাস ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ
২২। ভারতের তীর্থপথ নির্দেশ
—ভূপতিরঞ্জন দাস ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ
২৩। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য
—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দ
২৪। দেবতা ও আরাধনা
—পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বিংশ শতাব্দী
২৫। বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু বিংশ শতাব্দী
২৬। উত্তর হিমালয় চরিত—প্রবোধকুমার সান্যাল ১৩৫২ বঙ্গাব্দ
২৭। তন্ত্রকথা—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৩৫২ বঙ্গাব্দ
২৮। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়
—অক্ষয় কুমার দত্ত ১২৭৭-৮৯ বঙ্গাব্দ
২৯। তন্ত্রতত্ত্ব, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, ভট্টাচার্য ১৮১৫ শকাব্দ
৩০। শ্রীমদ্ভাগবত
৩১। অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বিংশ শতাব্দী
৩২। পুণ্যতীর্থ ভারত—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ বিংশ শতাব্দী
৩৩। শিবায়ণ, হরিচরণ আচার্য বিংশ শতাব্দী
৩৪। ঈশ্বর সন্ধানে ভারত—সচ্চিদানন্দ সরকার ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ
৩৫। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ
৩৬। কুলকুণ্ডলিনী—অমলেশ মজুমদার ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ
৩৭। তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ
—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ
৩৮। The Serpent Power, Arthur Avalon
(Sir John Woodroffe) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ
৩৯। History of Assam, E.A. Gait ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ
৪০। The Cultural Heritage of India
Vol. IV,V. (Published by the Ramkrishna
Mission Institute of Culture) ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে

৪১। The Wonder that was India
—A.L. Basham ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ
৪২। A History of India Vol 1
—Romila Thapar ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ
৪৩। The Birth of Indian Civilisation
—Bridget and Raymond Allchin ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ
৪৪। Pre-Historic India, Stuart Piggot ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ
৪৫। Pre-Aryan and Pre-Dravidian
—B.C. Bagchi বিংশ শতাব্দী
৪৬। Indo-Aryan and Hindi
—S.K. Chattarjee বিংশ শতাব্দী
৪৭। The Art of Indian Asia
—Heinrich Zimmer ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ
৪৮। Nationalism in Hindu Culture
—R.K. Mookerji ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ
৪৯। Landmarks of the World's Art (classical world)
—Donald E. Strong ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ
৫০। The Soul of India, B.C. Pal ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ
৫১। The Humanism of Art
—Vladislav Zimenko ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ
৫২। Indian Philosophy
—Dr. Radhakrishnan বিংশ শতাব্দী
৫৩। The Book of Popular Science
—Herbert Kondo (Editor in chief) ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ
৫৪। Introduction to Indian History
—D.D. Kosambi ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ
৫৫। Ancient India, R.C Majumdar ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ
৫৬। The History and Culture of the
Indian people. (Vedic Age and Classial Age)
—General Editor R.C Majumdar বিংশ শতাব্দী

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের বক্তব্য

দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন বক্তব্য কিছু নেই। তবে পাঠকের কাছে প্রকাশ করছি এই কৃতজ্ঞতা যে, কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছেন আমার এই আলোচনা গ্রন্থটি। পাঠকের কৌতুহলে অতিদ্রুত প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের। চাহিদা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দ্বিতীয় মুদ্রণ করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়নি গ্রন্থটিকে। যথাসম্ভব ভুল ত্রুটি সংশোধন করে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ হিসেবে করা হয়েছে প্রকাশ। নির্ভুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চেষ্টার হয়নি ত্রুটি। তবে বর্তমানকালে আলোর অভাব ও মুদ্রাকরের অসহযোগিতা সর্বজনবিদিত। তা ছাড়া আছে প্রুফরীডারের অভাব। সুতরাং যদি কোন মুদ্রণপ্রমাদ থেকে থাকে দ্বিতীয় সংস্করণেও, আশা করি তা হবে ক্ষমার্হ। সম্ভবতঃ প্রুফরীডারের ভ্রান্তিতে দক্ষিণা কালীর পায়ের বর্ণনায় ঘটে গেছে কোন ত্রুটি। সে ত্রুটির জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করছি পাঠকের কাছে। প্রথম মুদ্রণের মত দ্বিতীয় সংস্করণও যদি শেষ হয় দ্রুত তবে নতুন চর্চা ও নতুন সাধনার ফসল ফলাবার চেষ্টা থাকবে তৃতীয় সংস্করণে। এ এমনই এক বিষয় সাধনার ফলে যার হয় নতুন নতুন দিগ্ উন্মোচন। মহাশক্তির যদি ইচ্ছা হয় নবকলেবরে নতুন ব্যাখ্যায় নিজেই আবির্ভূতা হবেন আমার মাধ্যমে। ভাবি কালের কাছে জমা রাখছি সেই ভবিষ্যৎ।

৪৮/৩৯ পূর্ণ মিত্র লেন
সুইসপার্ক, টালিগঞ্জ
কলিকাতা-৩৩

লেখক

প্রথম মুদ্রণে লেখকের বক্তব্য

গ্রন্থ সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই। সমস্ত গ্রন্থই লেখকের বক্তব্য তুলে ধরবে পাঠকের চোখের উপর। বক্তব্য আছে পাঠককে লক্ষ্য করে দু-একটি। বর্তমান গ্রন্থটি আমাদের বহুলোকের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কিন্তু এ-গ্রন্থকে শুধুমাত্র সেই ধর্মবিশ্বাসের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই রচনা করা হয়নি। লক্ষ্য রাখা হয়েছে তাঁদের দিকে, যাঁরা বিচাব বিশ্লেষণকে বিশ্বাসের চাইতে বড় বলে মনে করেন। সেই কারণে এ গ্রন্থের আবম্ভ ইতিহাস দিয়ে। সেই ইতিহাস দেখে কেউ যেন চিন্তা করতে বসে যাবেন না যে, এটা একটা ইতিহাস গ্রন্থ। এর মূল লক্ষ্য যথার্থই একান্নপীঠ। এর রচনা কৌশল তিনটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে আছে ইতিহাস, দ্বিতীয় পর্যায়ে দর্শন, এবং তৃতীয় পর্যায়ে স্থান নির্ণয়। কোন ধর্মভীরু পাঠক যেন ইতিহাস দর্শনেই অপাংক্তেয় বলে ত্যাগ করবেন না এ গ্রন্থ। আবার দর্শনের আলোচনা দেখে কোন বাস্তববাদীও যেন অচ্ছুৎ বলে মনে করবেন না এ রচনাকে। সত্য স্ব-মহিমায় ভাস্বর। কেউ তাকে ঢাকতেও পারেনা আবাব কেউ তাকে প্রকাশ করতেও পারেনা। ধৈর্য ধরে সবটা পড়বার পর নিজের মনে এ বচনার প্রয়োজনীয়তা আপনার কাছে কতটুকু তা স্থির করুন। মতামত প্রত্যেকের নিজস্ব। এবং আমার বক্তব্য, সত্যই আমার লক্ষ্য—সে সত্য যদি দার্শনিক হিউমের মত হয়—অর্থাৎ Truth without God, তবু আমার অভিযাত্রা সেই সত্যের উদ্দেশ্যে বন্ধ হবেনা কখনও।

পরিশেষে, বিশেষ কারণে লেখকের বক্তব্যটিকে নতুন করে ছাপাতে হল এবং সেই সঙ্গে তন্ত্রবিষয়ে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত জনৈক অধ্যাপকের ভূমিকা। জনৈক তন্ত্রাচার্যের লেখা পত্র থেকে বি.দ্র. অংশে কয়েকটি পীঠের যে নির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে তারও উল্লেখ করা গেল।

১৭১/১ বিবেকানন্দ কলেজ রো লেখক

ঠাকুরপুকুর, কলিকাতা-৬৩

ভূমিকা

শিব, শক্তি ও বিষ্ণু হিন্দুদের প্রধান আরাধ্য দেবতা; তাই শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবতীর্থ ভারতের সর্বত্রই রয়েছে ছড়িয়ে। একান্নটি মহাপীঠ প্রধানতঃ শাক্ত পীঠস্থানরূপেই পরিচিত।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে একান্নটি মহাপীঠের উদ্ভব কবে হলো সে সম্পর্কে সঠিক ভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগণ মনে করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তীর্থ হিসাবে একান্নটি মহাতীর্থের ধারণা পূর্ণতা লাভ করেছিল। একান্ন পীঠের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কাহিনী বঙ্গদেশে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। উপাখ্যানটি নিম্নরূপ :

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতী, শ্মশানবাসী শিবকে করেন পতিত্বে বরণ। দক্ষের কিন্তু জামাতা শিবকে পছন্দ নয় মোটেই। শিবও দক্ষকে অপদস্থ করতে ছাড়েন না। একবার প্রজাপতি দক্ষ করলেন এক মহাযজ্ঞ। ঐ যজ্ঞে সকল দেবতাই হলেন নিমন্ত্রিত, কিন্তু শিব কোন নিমন্ত্রণ পেলেন না। সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে হাজির হলেন। যজ্ঞস্থলে দক্ষ শিবের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞস্থলেই সতী দেহত্যাগ করলেন। সতীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে শিব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করে মৃত সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তিনি উন্মত্ত তাণ্ডবে বিচরণ শুরু করলেন। তাঁর উন্মত্ত কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য—উপায়ান্তর না দেখে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা মৃত সতীর পবিত্র দেহ করলেন খণ্ড বিখণ্ড। সতীর ঐ খণ্ডিত দেহাংশ যে যে স্থানে পড়েছিল সেই সেই স্থানেই গড়ে উঠল পবিত্র তীর্থস্থান—এক একটি মহাপীঠ।

কাহিনীটি পাঠে মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে একান্নটি মহাপীঠের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। মহাপীঠের

ইতিহাস আলোচনা কালে দেখা যায় যে, আদিতে তিন চারটির অধিক শাক্তপাঠ বোধহয় ভারতে ছিল না। বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে শ্রীহট্ট, কামরূপ, পূর্ণগিরি, উড্ডীয়ান প্রভৃতি চারটি মহাপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়, পরে ক্রমশঃ এই মহাপীঠের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মনে হয় বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির পর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষভাবে পূর্বভারতে শৈব ও শাক্ত ধর্মের দ্রুত বিস্তার ঘটে। শক্তি উপাসক ও সাধকদের সাধনার ফলেই যে এই ধর্মের ব্যাপক উন্নতি ও জনপ্রিয়তা ঘটেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। শাক্ত ধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি-সাধকদের সাধনার পীঠস্থানগুলিও বিপুল খ্যাতি অর্জন ক'রে ক্রমশঃ মহাতীর্থের গৌরব লাভ করতে থাকে। এইভাবে মহাতীর্থের সংখ্যা কালক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ সংখ্যা ৫১ পীঠে প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, একান্ন পীঠের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস যে আর হয় নি, তা নয়, যদিও ঐ প্রয়াস খুব একটা সাফল্য লাভ করে নি।

ভারতবর্ষে শাক্ত ধর্মের উদ্ভব, বিকাশ ও শাক্ত মহাপীঠগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারের ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'The Sakta Pithas'। বর্তমান লেখক নিগূঢ়ানন্দ ঐ গ্রন্থটি থেকে অনেক তথ্য আহরণ করে মনোজ্ঞ ভংগীতে তা স্বলিখিত গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। ফলে নিগূঢ়ানন্দের গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার ৫১টি মহা-পীঠের প্রত্যেকটি পীঠস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন নি। যদিও অধিকাংশ পীঠস্থানের অবস্থান তিনি নির্ধারণ করেছেন। নিগূঢ়ানন্দ "মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে" গ্রন্থটিতে অনির্ণীত আরও বেশ কয়েকটি মহাপীঠের অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি জনৈক বহুদর্শী ভ্রমণকারীর অভিজ্ঞতাকে বাস্তবে নিপুনভাবে প্রয়োগ করেছেন। লেখক মহাপীঠগুলির অবস্থান নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি ঐ তীর্থস্থানে যাতায়াতের পথ এবং বিশ্রাম

ভবনাদির নির্দেশও দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থটিতে। ফলে তীর্থলোভী ভ্রমণকারীদের পক্ষে বইটি অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে আশা করি। তা ছাড়া, একাম্রপীঠ সম্পর্কিত কোন উল্লেখযোগ্য বই বাংলা ভাষায় অদ্যাপি রচিত হয় নি। বর্তমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে ঐ অভাব পূরনের দাবি রাখে।

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন পাল (এম. এ. ট্রিপল)
ইতিহাস বিভাগ,
শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া।

'Krishna meaning 'dark' has led to his being associated with the flute-playing Tamil God Mayon, 'the dark one', the herdsman who spent many hours in the company of the milkmaid, which is what the cowherd of Mathura is associated with—in the northern tradition. It is believed that the Abhiras a pastoral tribe of the peninsula, brought this god with them when they travelled north and settled in central and western India.—Romila Thapar, A History of India. Vol. I. P. 260.

('মহাতীর্থ একাম্রপীঠের সন্ধানে' গ্রন্থে S. K. Chatterjee-র Indo-Aryan and Hindi প্রসঙ্গে আলোচনা অংশে বিষ্ণুর সঙ্গে তুলনীয়।)

উৎসর্গ

স্বর্গতা পিতৃস্বসা—

শরৎকামিনী গুহ-নিয়োগী

জ্যেষ্ঠতাত পরলোকগত

অশ্বিনীকুমার সরকার

ও

তদীয় পত্নী স্বর্গতা ননীবালা সরকার

দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাত পরলোকগত

নিবারণচন্দ্র সরকার

পরলোকগত পিতৃদেব

অমৃতলাল সরকার

ও

স্বর্গতা মাতৃদেবী স্নেহলতা সরকার

পরলোকগত খুল্লতাত

প্রাণগোপাল সরকার

ও

তদীয় পত্নী স্বর্গতা সুধালতা সরকারের

পুণ্যস্মৃতি—স্মরণে

কয়েকটি চিঠির অংশ :

বিখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ টাইটাস বেনজামিনের দীর্ঘ চিঠির মূল কথা :—'এমন বাংলা বই আর পড়িনি।'

মহাশয়,

সদ্য প্রকাশিত নিগূঢ়ানন্দের 'মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে' গ্রন্থখানি পড়লাম। শ্রমনিষ্ঠ এ-গ্রন্থটি বিদগ্ধ পাঠকসমাজকে প্রবুদ্ধ করবার মত একখানি অসাধারণ সংযোজনা। বিষয় নির্বাচনে সম্পূর্ণ নূতন—এমন একত্রিত আকারে ইতিহাসজ্ঞের গ্রন্থ, গবেষক তথা সাহিত্য-অনুরাগীদের অন্তর স্পর্শ করে। পডতে পডতে মনে হয়, বাংলার সারস্বত চিন্তার এটি-ও একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনা ছাড়াও প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠার এ-গ্রন্থের শেষে একত্রীকৃত কয়েকটি দুর্লভ 'প্লেট' গ্রন্থটির মহার্ঘ্যতা আরও বাড়িয়েছে। প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান এমন দুঃসাহসিক অথচ সার্থক প্রকাশনার দ্বারা বিদ্যানুরাগীদের মন জিজ্ঞাসু করে তুলেছেন। ঘরে ঘরে এই সুলিখিত গ্রন্থটি স্থান পাবার যোগ্য।

বি, এন, কলেজ — শুভানুধ্যায়ী—

ধুবড়ী, আসাম। — অধ্যাপক মানিক মুখোপাধ্যায়।

'লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক নিগূঢ়ানন্দকে সাধুবাদ—আমাদের অনেক দিনের অভাবকে পূরণ করে দিলেন 'মহাতীর্থ একান্নপীঠ' সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ উপহার দিয়ে। ঘরে ঘরে এই গ্রন্থের নিশ্চিত 'ঠাই' —সাহিত্যিকের ঘরে, ধার্মিকের ঘরে, ঐতিহাসিক বা যুক্তিবাদীর ঘরে। তাঁর কাছ থেকে এই ধরনের আরও একটি গ্রন্থ আশা করি।'

—সরিৎশেখর মজুমদার

৪২, নন্দনা পার্ক, কলিকাতা-৩৪

'আপনার প্রকাশিত ও শ্রদ্ধেয় নিগূঢ়ানন্দ রচিত 'মহাতীর্থ-একান্নপীঠের সন্ধানে' গ্রন্থটি পড়িয়া খুবই আনন্দ পাইলাম। আমি একজন কৌলাচারী মাতৃসাধক—মোটামুটি Guide হিসাবে বইটি শক্তি-সাধক-সাধিকাদের খুবই সাহায্যে আসিবে।

—তন্ত্রাচার্য শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মৈত্র

১০৮/৩, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০

ছোটবেলার স্মৃতি মানুষের জীবনধারা নির্ধারণে বড় একটা ঘটনা। মনের অকৃত্রিমতা যখন সমাজের কষ্টিপাথরে বিশ্লেষিত হবার ধার ধারে না তখন তার দর্পণে পারিপার্শ্বিকের যে রঙিন চিত্র ধরা পড়ে তার এক-একটা যেন এক-এক খণ্ড স্বতন্ত্র মেঘ, অন্তর্গভীর আকাশে বসে থাকে স্থির হয়ে। এবং যখন সে চেতনার অজ্ঞাতসারে রহস্যময় আকাশ থেকে রঙ ছড়ায় তখন তা মনের অধীশ্বর 'আমি' বলে যে একটা পার্থিব সত্তা আছে তার ধারণার বাইরে। সেই অবিশ্লেষী ছোট বেলার মন অদ্ভুত এক সার্বভৌম ক্ষমতার অধীশ্বর। পার্থসারথীর মত বিশ্লেষী মনের রজ্জু যে সে-ই ধরে আছে, সেটা আমাদের নিত্যদিনের সংসারে ঘানিঠেলা মন বুঝতে পারেনা বটে, তবে ফ্রয়েড জাতীয় কোন মনোবিজ্ঞানী যখন নিবিড় অনুসন্ধিৎসায় সেই রহস্যময় আকাশের দিকে তাকান, তখন সেই অস্পষ্ট আলোর আকাশে নক্ষত্রের অনেক আশ্চর্য লেখা পান দেখতে, যে লেখাগুলো বিস্ময়ের পর বিস্ময় ছড়াতে থাকে শুধু। যেন একটা অতীন্দ্রিয় রহস্যময় চন্দ্রালোকের দেশ। বাইরে না তাকিয়ে মনের গভীরঘন গূঢ়জগতের দিকে যাঁরা তাকান তাঁরাও সেই রহস্যময় জগতের একটা দুর্বোধ্য খেলার পান ইশারা। শিশিরস্নাত প্রভাতের কোন অলৌকিক রঙে, ক্লান্ত মধ্যাহ্নের কোন নিবিড় নীলে, বিবর্ণ কোন হলুদ রৌদ্রে, এমনকি কখনও কখনও আটপৌরে কিছু গৃহস্থ ইঁদুরের চলাফেরায়, কিংবা নির্লজ্জ আরশোলার শুণ্ড আন্দোলনের মধ্যেও সেই দুর্বোধ্য অতীত পারে তার রঙ ছড়াতে। এবং প্রতিনিয়তই কখন কোন্ ফাঁকে শৈশবের সেই স্মৃতিগুলি আমাদের খেয়ালখুশির মূলে দেয় উঁকি ঝুঁকি, তা আমরা পারিনা অনুমান করতে। কিন্তু সেটা যে আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহারের মূলে বড় একটা ডিটারমিনাণ্ট ফ্যাক্টর যে-কোন স্থিতধী ব্যক্তিই পারেন তা বুঝতে।

শাস্ত্রে বলে স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে। কিন্তু আমি যে নই সেই ধরনের স্থিতধী ব্যক্তি, সে বিষয়ে অন্তত আমার নিজের কাছেই নেই কোন-রকম সংশয়। বরং আমার মধ্যে আছে প্রচণ্ড রকমের একটা অস্থিরতা। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে একটা বিশেষত্ব এই যে, সেই অস্থিরতার কারণ আমি নিজেই বুঝতে পারি অনেকটা। এবং আমার সেই বুঝতে পারার মূল কথা এই যে : আমার বর্তমান আমার শৈশবের অনাবিল উপভোগের সঙ্গে খাপ খায়না বলেই প্রতিপদে খাই হোঁচট, এবং নিজেকে করি অস্থির বোধ। যেমন ধরুন—১৯৪৭ সালে দেশের অঙ্গচ্ছেদ হবার পর থেকে আমার মন সুস্থির নয় কোথাও, বিশেষ করে শহর জীবনে। ভাড়াটে বাড়ির পরিসরকে জ্যামিতির ত্রিভুজাবদ্ধ ভূমির চাইতে বড় বলে মনে হয়না কখনও। সুতরাং জ্যামিতি যেমন চিরকালই বেদনাদায়ক আমার কাছে, তেমনই জ্যামিতির ডায়াগ্রামাকৃতি যে-কোন বাসস্থানও। সেইজন্য ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে নিজে বাড়ি করেও শান্তি নেই। কারণ, সাতমহলা বাড়িতে জগৎ ছিল সম্পূর্ণ নৈশঃব্দে পূর্ণ অথবা আত্মীয়-কলকোলাহলে মুখরিত। ত্রিশ বিঘের পরিবর্তে তিন কাঠার সংকীর্ণ বেধ-এ সেই স্বাতন্ত্র্য যখন ব্যহত হয় পার্শ্বস্থ গৃহের উপস্থিতিতে—তখনই বড় অস্থির ঠেকে। মনটা করে পালাই পালাই। কোন কিছুকেই আর মনে হয় না আপন বলে।

আমি বুঝতে পারি, এবং সমস্ত অস্থিরতা সত্বেও বড় স্পষ্ট করেই বুঝতে পারি যে, আমার শৈশবের সার্বভৌম মানসিকতাই আমার জীবনে অসঙ্গতি ও অস্থিরতার কারণ, এবং পার্থিব জীবনের রন্ধ্রপথে সেই হারানো দিনগুলোর লুণ্ঠক আলোই আবার অমৃত-জীবনের ইশারাও। বর্তমান এবং অবুঝ অতীতের মধ্যে একটা সেতুবন্ধনের চেষ্টা চলে সর্বদাই। অতীতই ভবিষ্যতের স্বপ্ন হয়ে বসে থাকে। এবং তাকে ছুঁবার প্রচেষ্টার নামই জীবন।

আমি বেশ বুঝতে পারি এবং স্পষ্ট করেই বুঝতে পারি যে, আমার সাহিত্য-জীবনে কলম ধরবার মূল কারণ হল বাস্তব জীবন ও অবুঝ অতীতের মধ্যে সেতুবন্ধনের ব্যর্থতা। যা বাস্তব-জীবনে সম্ভব নয় তাই

স্বপ্ন-জীবনে সম্ভব করবার জন্যেই অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কলমের মুখে দেওয়া স্বাধীনতা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার বর্তমান রচনার প্রারম্ভে আমি কিন্তু ছিলাম বেশ কিছুটা দিশেহারা অবস্থাতেই। প্রেম নয়, প্রণয় নয়, স্নেহ এবং ভালবাসাও নয়, বিদ্রোহও নয়, ক্ষোভও নয়, অথচ এমন একটা বিষয় নিয়ে কলম ধরবার কেন যে ইচ্ছে হ'ল, যার বিষয়বস্তু জ্ঞানতঃ আমার নয় অভিপ্রেত। এবং আমার মনে হয়, এখানেও সম্ভবতঃ রয়েছে সেই সুবিশাল অবুঝ অতীতের একটা ব্যাখ্যার অতীত মর্জি। সেই মর্জির কারণ আমার এই অস্থির মনের মধ্যবর্তী ক্ষীণজীবী স্থিতধী মনটুকু যা বুঝতে পেরেছে, তা হল এই—আমার পিসিমা।

আমার পিসিমাকে আপনারা দেখেন নি। তিনি একটা বিশেষ ধরনের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নন কোনমতেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও ভারতীয় গ্রাম্যসমাজে মধ্যযুগের এক নির্ভরযোগ্য ছবি তিনি। বিদ্যাসাগরের মুখে ঝাঁটা মেরে, ডালহৌসিকে অস্বীকার করে, তিনি এক বাল্য-বিধবা। কদমছাঁট চুল আর থান ধুতি। লাল আতপ চালের ভাতের সঙ্গে সজনে ডাটা লাউডগার চচ্চড়ি, একটু ডাল-বড়ার বিলাস কিংবা ধনেপাতা। ক্ষীণজীবী বঙ্গ-পুরুষের গৃহে হেন বিধবার অভাব ছিল না কোনদিনই, আজও নেই। এবং সেই বাল্যবিধবা পিসিমাই যে আমার বর্তমান কাহিনীর কারণ, এখন সেটা বুঝতে আর নেই কোন অসুবিধেই। দস্যু-শৈশব সেই পিসিমাকে কেন্দ্র করেই আমার বর্তমান কলমের উপর চাইছে ঝাঁপিয়ে পড়তে। যে স্মৃতিটি সুযোগ পেলেই আমার মনের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমাকে করে তোলে উন্মনা তা হল আমার পিসিমার।

এই বিধবাকণ্টকিত বঙ্গদেশেও আমার অত্যন্ত প্রবল দুর্ভাগ্য এই যে, আমি আমার মাকে হারিয়েছিলাম অত্যন্ত ছোটবেলাতেই। এবং সেজন্য একান্নবর্তী গ্রাম্যপরিবারে অন্যকোন মায়ের স্নেহে ভাগ বসাবার সুযোগ হয়নি বলে আমাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এই বাল্য-বিধবা পিসিমার দিকেই। এবং সম্ভবতঃ তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে আমিই

হয়েছিলাম একটা সান্ত্বনারও কারণ। দিনের শাসন ও তর্জন-মার্জনের পরে রাত্রির জন্য তাঁর কাছে জমা থাকতো স্নেহ। রাত্রে পিসিমার বুকের কাছে শুয়েশুয়ে এক নতুন জগৎ তৈরী করতাম নিজেও অজ্ঞাতসারেই।

হ্যাঁ, আমার সেই পিসিমা, এবং আমার সেই দুর্বোধ্য অতীতকে বুঝতে হলে পিসিমার সেই পারিপার্শ্বিকেরও সামান্য হিসেব নেবার দরকার আছে জানবেন। কারণ, পিসিমা এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক, সব মিলেই শৈশবের আকাশ রচনা করেছে আমার মধ্যে। ক্ষুদে জাম, তাল আর কামরাঙ্গার ছায়ার নিচে হবিষ্যিঘর, আর তুলসীতলার পাশে নীল আকাশের নিচে টিনের চৌচালা মন্দির। সামনে ভাদাল দুর্বার ক্ষীণ আক্রমণে আক্রান্ত বহিরাঙ্গন। তার সামনে ধনুকের মত বাঁকানো কাছারী ঘর। কাছারী ঘরের মাথায় জড়াজড়ি করা কয়েকটা গাছ—নিম, বেল, হরীতকী, জাম আর মাধবীলতা। তার সামনে একজোড়া দুষ্টু ধরনের তালগাছ। বাঁয়ে ঘন কালোমেঘের মত পাতা-ছড়ানো বকুলঝাড়। তারও বাঁয়ে তপোবনসদৃশ গোঁসাইয়ের বাগিচা। দক্ষিণে আমবাগান, পাটক্ষেত এবং অজানা-গাছের ঘন জঙ্গল। মাঝখানে একটা খেলার মাঠের পাশে বৌদ্ধস্তূপের মত বিরাট এক প্রাচীন বটগাছ। তার গা ঘেঁষে শ্মশান। তারপর গাছ গাছালীর মাথায় ঢেউ খেলতে খেলতে অনন্ত ভবিষ্যৎ।

ঠিক এমনি একটা পরিবেশে পিসিমার মণ্ডপঘরের বেদীতে যদি দেখেন—৺মা কালীর পট, দুর্গার ছবি, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি এবং যদি ঘণ্টা বাজিয়ে পিসিমাকে দেখেন পুজো করতে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে এবং সেই বেদীকে কেন্দ্র করে দেখেন বারোমাসে তেরপার্বন, সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের পুজা, বাঁ হাতের ঘণ্টা, নৈবেদ্য, মন্ত্র-উচ্চারণ, এবং প্রকৃতি যদি ঋতুতে ঋতুতে বিশেষ পরিবেশ তৈরী করে সেই মণ্ডপ ঘরের মাথার উপরে এবং যদি সেই অতীন্দ্রিয় পরিবেশে পিসিমার সঙ্গে আপনি শুয়ে থাকেন মণ্ডপ ঘরে, যদি নিদ্রাজড়িত চক্ষে সেই মুহূর্তে কোন পিসিমার মুখে শোনেন ধর্মবিষয়ক গল্প : এক যে ছিলেন

রাজা, দক্ষ রাজা। তাঁর কন্যা সতী···এবং সেই মুহূর্তে যদি দক্ষিণ-নদীর জল থেকে ভিজে একটা সির্‌সিরে হাওয়া তালগাছের মাথা কাঁপিয়ে করে ফড়্‌ফড়্‌ শব্দ, গোঁসাইয়ের বাগানের কোন নির্জন গাছের মাথায় ব'সে ডাকে নিমপাখি,—পুরনো গাছের কোটর থেকে প্রহর ঘোষণা করে পেঁচা, অন্ধকারের বুক কাঁপিয়ে শেয়াল ডেকে উঠে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল থেকে, তখন সমস্ত নিসর্গটাই কেমন একটা অতি-প্রাকৃত হয়ে উঠে না চতুর্দিকে? বেদীর উপর ৺মায়ের ফটো, পূজোর গন্ধ জড়ানো পিসিমা, ঠাকুর মশায়ের মন্ত্র উচ্চারণের স্মৃতি, সব মিলে সৃষ্টি করে একটা ভিন্নলোক। এবং সেটা এমন এক শাশ্বত জগতের ছায়া সৃষ্টি করে অস্পষ্ট অন্তর্জগতে যে, তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া কোনদিনই নয় সম্ভব।

সেই নির্ভেজাল সরল বিশ্বাসের জগতে সবই তখন অত্যন্ত জীবন্ত অপ্রমাণ সত্যতায়। সারা দেশটাই তখন উদ্ভাসিত এক অতীন্দ্রিয়তায়। কতবড় ভারতবর্ষ, সে-কথাও জানিনা তখন আমরা। কিন্তু আমাদের চর্মচক্ষুর অদৃশ্য কোন স্থানেই থাকেন ঈশ্বর—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা এতটুকু। কোথায় পুরি, ভগবান জগন্নাথ থাকেন যেখানে —সেখান থেকে দাশরথি পাণ্ডা আসতো প্রতিবছর গ্রামে, তীর্থপুণ্য-প্রত্যাশীদের নিয়ে বেরুতেন দেশের প্রান্তে প্রান্তে—কাশী, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, পুষ্কর, রামেশ্বর, সেতুবন্ধ, কত অসংখ্য! এই সব বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট স্থানে ভগবান আছেন জাগ্রত হয়ে, এ-বিশ্বাসে আর বিন্দুমাত্র ফাঁকি ছিল না সেই কারণে। আর এতেও কোন অবিশ্বাস ছিল না যে, পিসিমা স্বচক্ষে দেখেছেন ঈশ্বরের সেই প্রত্যক্ষ লীলা।

সেই পিসিমা, ভগবানের নানাবিধ লীলা যিনি করেছেন প্রত্যক্ষ তাঁর কাছে কিন্তু তাঁর মাতৃরূপা লীলাই ছিল বেশী প্রিয়। সেই জন্য মণ্ডপ ঘরের বেদীতে যত মূর্তি ছিল, তাতে ছিল ৺মায়ের যত বিভিন্ন রূপ পুরুষ দেবতার তত নয়। পুরুষের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র গুরুদেবের ফটো, তাঁর চন্দন লেপা খড়ম, একটি শিবের মূর্তি আর নারায়ণ।

পিসিমা, যাঁর আরাধ্যা দেবী কালী, আর যে কালীর বেদী

আছে দক্ষিণের শ্মশানে পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর, যাঁর কাছে এক নির্দিষ্ট প্রহরে একটা নীল আলো বহুদূর এক মহাশ্মশান থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসে প্রত্যেক রাত্রিতে, তা দেখবার পর ৺মায়ের উপর অবিশ্বাস থাকা সম্ভব কারো পক্ষে? এবং তারপর যখন শৈশবের চোখে স্পষ্ট দেখা যে, শ্মশানে ৺মায়ের পূজার সামান্য ক্রটিতে গ্রামে দেখা দেয় কলেরা মহামারী, নতুন করে পুজো করলেই হয় সব শাস্তি, তখন অবিশ্বাস আর থাকতে পারে কী? এবং এত সব দেখবার ও শুনবার পরও পিসীমা যদি গল্প করেন: এক ছিল যে রাজা, দক্ষ রাজা তাঁর এক কন্যা—নাম সতী। বিয়ে হয়েছিল শিবের সঙ্গে। কিন্তু শিবকে তেমন পছন্দ নয় দক্ষ রাজার, কারণ, নিজের জামাতা হয়েও সে তেমন মান্য করেনা দক্ষকে। সুতরাং দক্ষ করলেন এক যজ্ঞের আয়োজন···। এবং তার পরেই যখন কলকাতা থেকে কিনে আনা কলেরগানে (গ্রামোফোনে) রেকর্ড বাজতো দক্ষযজ্ঞের এবং কোন এক কবির কবিতা পড়তাম: রে সতী! রে সতী! কাঁদিছেন পশুপতি···ইত্যাদি, তখন আর কোন অবিশ্বাসই থাকতো না সে গল্পে। সেই সব, সেই পিসিমা, তাঁর মা কালী, রাত্রিবেলা সতীর গল্প, রেকর্ডে দক্ষযজ্ঞ, মনের মধ্যে সব চাইতে বেশী শেকড় গেড়ে বসে ছিল এই সবই। এবং এখন আমি বুঝতে পারছি যে, উপন্যাস লেখার হাতে অকস্মাৎ অতিপ্রাকৃতের চিত্র আঁকার জন্য অজ্ঞাত মনের এই নির্দেশের কারণ কি বার বার।

হ্যাঁ, এই ৺মা, যিনি পিসিমাকে টেনেছিলেন, আমাকেও টেনেছিলেন তেমনি করে। বঞ্চিত মানুষের কাছে ৺মায়ের চাইতে আর বড় আছে কি? সমস্ত দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণায় পরম সান্ত্বনা যাঁর কাছে প্রার্থনা করা যায়, তিনিই তো মা। পার্থিব মায়ের যদি অভাব ঘটে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অপার্থিব মায়ের দিকে হাত বাড়ায় লোকে। এবং বিশেষ করে সেইরকম কোন মা যদি ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে থাকেন আসন তৈরি করে বসে, তবেতো কথাই নেই।

প্রাকৃতজগতে এবং অতিপ্রাকৃতজগতে মানুষের কাছে যদি প্রথম

আরাধনা লাভ করে থাকেন কেউ তবে তিনি মা। কি আফ্রিকা, কি ইউরোপ, কি এশিয়া, কি আমেরিকা, মানুষের কাছে প্রথম পূজা লাভ করেছেন মা-ই প্রথম। এর কারণ কি? সমাজ-বিজ্ঞানীরা হয়তো এর কারণ হিসেবে দেবেন নানা তত্ত্ব ও তথ্য। আমাদের তাতে নেই প্রয়োজন। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি যা বলে তাই দেখা যাক এক্ষেত্রে :—

জন্মের পরই মানুষের কাছে মা ছাড়া আর প্রথম আছে কে? মায়ের বুকের স্তনই জীবন ধারণের ক্ষেত্রে প্রথম অন্ন। মায়ের অঙ্কই শয্যা। মায়ের সেবাশুশ্রূষাই হল লালন-পালন। প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণেই হয় এমন। কিন্তু প্রকৃতির ধারা যে কেন এমন একথা আর কে বলতে পারে স্বয়ং প্রকৃতির স্রষ্টা ছাড়া?

একটা নির্দিষ্ট সময় মায়ের অঙ্গে অঙ্গেই বেড়ে উঠতে হয় জীবজগতের সকলকেই। এবং স্বাবলম্বী হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও মায়ের চাইতে বড—কোন প্রাণীর কাছেই আর নেই কেউ। সুতবাং সকল প্রাণীরই—বুদ্ধিবৃত্তি যখন দাঁড়ায় এসে একটা ধারণযোগ্য পর্যায়ে তখন সব চাইতে বড ছাপ সেখানে যেটা পড়ে, সেটা মায়ের ছাপ ছাড়া আর হবে কি?

পশুজগতে মা-ই একমাত্র আশ্রয় সন্তানের। নইলে প্রজননকারী এমন পিতা-পশুও আছে—যারা দ্বিধা বোধ করেনা নবজাতককে ভক্ষণ ক'রে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে। এবং এটা প্রায আমরা সকলেই জানি যে, এই কারণেই বাঘিনী প্রসবকালে দুর্গম অরণ্যে চলে যায় পুরুষ-বাঘের দৃষ্টির আড়ালে এবং যতক্ষণ না নবজাতক হয় স্বাবলম্বী, ততক্ষণ পর্যন্ত আসেনা পুরুষের দৃষ্টির সামনে। গৃহপালিত মার্জারগুলিকে লক্ষ্য করলেই বুঝবেন সব! মাদি বেডাল হুলো বেড়ালের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য নবজাতককে রাখেনা কোন এক নির্দিষ্টস্থানে কখনও; নানা স্থানে রাখে লুকিয়ে লুকিয়ে। শুধু বিহঙ্গকূলের ক্ষেত্রেই বোধহয় ব্যাপারটা একটু উন্নতমানের—যে-জন্য সন্তান পালনের দায়িত্ব

পিতামাতা নেয় যুগ্মভাবে। কিন্তু তবুও পিতার চাইতে মাতা বড়। লালনের ভার মায়ের নিজের বুকের নিচে।

মানুষের ক্ষেত্রে যদিও ব্যাপারটা নয় পশুজগতের মত, তবু মা যে একটা বিরাট ফ্যাক্টর, সে বিষয়ে নেই সন্দেহ। এবং মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠা যে-কোন একটা মানবককে জিজ্ঞাসা করলেই দেখতে পাবেন —নিঃসন্দেহে সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে—মায়ের স্থান বুকের একটা বিরাট অংশ জুড়ে। এবং এই জন্যেই মাতৃহীন শিশুর পক্ষে বড় দুষ্কর মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠা। কিন্তু পিতৃহীন শিশু মানুষের মত মানুষ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দারিদ্র্যের মধ্যেও এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। (অবশ্য এই প্রসঙ্গে কথাটা একটু ব্যতিক্রম হলেও বলতে হচ্ছে বাধ্য যে, মানুষের মানসিক স্তরে বোধহয় প্রকৃতি-বাঁধা সেই নিয়মের ঘটেছে অনেকটা ব্যতিক্রম। প্রকৃতিকে জয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাতেই নাকি মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা। সেই জন্য বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে চাইছে প্রকৃতির উপর, শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতার বাইরে ব্যস্ত গভীর অন্তর্জগতে ডুব দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টিতে। সেজান, মাতিস, পিকাশো থেকে আমেরিকার পোল্লক পর্যন্ত দেখুন চিত্র-শিল্পীদের এবং পড়ুন আধুনিক কবিদের কবিতা, দেখবেন, প্রকৃতির অনুকৃতি নেই সেখানে। এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই মানুষের মানসিক স্বাভাবিকতারও পরিবর্তন এসেছে বাৎসল্য ও স্নেহের ক্ষেত্রেও। আমার চতুষ্পার্শে এমন অনেক রমণী আমার নিত্যদিন চোখে পড়ে, যারা নবজাতক শিশুকে একা ঘরে তালাবদ্ধ করে যায় সিনেমা দেখতে, দেখেছি কামারপুর তাড়নায় অস্থির হয়ে নিজের চোখে শিশুহত্যায় উদ্যত রমণীকেও। এবং শিশুসন্তান রেখে বিবাহবিচ্ছেদ ক'রে পরপুরুষকে বিবাহ করছে, এরকম নারী অসংখ্য। আমার এক বিশেষ অধ্যাপক বন্ধুর কাছে সেদিন আমি শুনেছি যে, জার্মানীতে Children's Security Force তৈরী হয়েছে পিতা মাতার অবজ্ঞার হাত থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য। সুতরাং আজকের এই মানসিকতা নিয়ে আদিম কালের মা-বাবারা যদি চলতেন, তাহলে

মানুষের আরাধ্যা হিসাবে মায়ের কল্পনাই মানুষের কাছে প্রথম আসতো কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে যথেষ্ট। এবং সেক্ষেত্রে বোধহয় ৺মায়ের আরাধনার ব্যাপার নিয়ে এমন করে কলম ধরবার সাহসও দেখাতাম না আমি। অবশ্য বর্তমান লেখকের মত দু'এক জন হতভাগ্য—যারা শৈশবে মাকে হারিয়েও মনুষ্যাকৃতি নিয়ে বেঁচে আছে দেহবৃদ্ধি করে, তাদের ক্ষেত্রে মায়ের স্থান নির্ণয়ে—প্রথমা হিসেবে তাঁকে নির্বাচনের কোন কারণ আছে কি না, এমন প্রশ্ন তুলতে পারেন অনেকেই। কিন্তু সেক্ষেত্রেও নেই জননীকে স্থানচ্যুতা করবার মত কোন সুযোগ। তার কারণ এই যে, এই জাতীয় জাতকেরা—মাতৃস্নেহের জন্য হয়ে উঠে এত বেশী লালায়িত যে, বাস্তবের অভাব কল্পনায় পূরণ করে নেবার জন্য আরো অনেক বেশী মহিমময়ী শক্তিশালিনী ৺মায়ের কল্পনা ক'রে সেখানেই সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেন তাঁরা। এবং সত্য সত্যই এ-ধরণের কিছু ঘটে কিনা বড় জাতের কোন জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করলেই পারবেন তা জানতে। সুতরাং মা সম্পর্কে আমার এই বিশেষ রকমের ধারণা সমাজ বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যার অবকাশ না রেখেই দৃঢ়মূল।

আপনারা সকলেই এ ধরনের একটা সমাজবিজ্ঞানসম্মত ধারণার সঙ্গে যুক্ত আছেন যে, আদিম সমাজে মানুষও যখন চলত পশুর মতই, কোন সংহিতার নিয়মকানুন মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে দেয়নি ধরেবেঁধে, তখনও নতুন মানুষকে বেড়ে উঠতে হত মায়েদের কেন্দ্র করেই। পিতার ছিলনা কোন পরিচয়। তারপর যখন শুরু হল পারিবারিক জীবনের একটা বন্ধন—তখনও মায়েদের কেন্দ্র করেই ঘুরতেন পিতারা, পিতাদের কেন্দ্র করে মায়েরা নন—অর্থাৎ যাকে বলে কিনা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। সুতরাং দীর্ঘদিন মায়ের প্রাধান্যেই বেড়ে উঠতে হয়েছে মানুষের সমাজকে। ফলে মা একটা বিশেষ রকমের প্রাধান্য পেয়েছেন মানুষের মনে। এবং সেই জন্যই প্রাকৃত মা—অতিপ্রাকৃত মায়ের রূপ ধরে মানুষের পূজার বেদী আছেন অধিকার করে।

কিন্তু ব্যাপারটাকে যদি একটু গভীরভাবে ভেবে দেখেন—তাহলে দেখবেন, যতটা সহজভাবে যায় ঐ ধরনের চিন্তা করা ততটা সহজ নয় ব্যাপারটা। একবার নিজের মনের মধ্যেই চিন্তা করে দেখুন—মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্যই বা কতদিন, আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্যই বা কতকাল! Animality+Rationality নিয়ে মানুষ। Rationality দেখা দিয়ে দ্বিহস্ত দ্বিপদযুক্ত লাঙ্গুলহীন জীব মানুষ বলে গণ্য হবার পরে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব বোধহয় সমাজে থাকেনি বেশীদিন এবং সেই কোন্ এক প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ করে সারা ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণ ভরে মানুষের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে জয়যাত্রার এতদিন পরেও মানুষের মধ্যে মায়ের প্রাধান্য এমন করে থাকতে পারত না যদি না অন্য কিছু কাজ করত এর পেছনে।

হয়তো প্রশ্ন করবেন, আছে যে, তাই বা বললে কে? জগতের কোন সভ্যসমাজই ধর্মের ক্ষেত্রে মাকে দেয়না প্রাধান্য। খ্রীষ্টানরা দেয় না, ইহুদীরা দেয় না, দেয়না মুসলমানেরাও। এমন কি নয় বৌদ্ধরাও। সভ্যতার নিকৃষ্টমানে যারা আছে, তারাই শুধু মাকে তুলে রেখেছে তুঙ্গে। এমন ধরনের কথা বললে অনেকটাই চুপ করে যেতে হবে নেই সন্দেহ। তবে মনে রাখতে হবে, খ্রীষ্টানদের মধ্যেও মা মেরী নন ক্ষীণজীবা কিছু একটা। ইহুদীদের ধর্ম সম্পর্কে আমার নেই জ্ঞান, তবে, Old Testament যদি না হয় ইহুদী বর্জিত, তা হলে আদম এবং ইভ তুল্যমূল্যের, এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রেও হবা এবং আদম। বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে না থাকলেও পরে এসেছে প্রজ্ঞাপারমিতা।

আর্যরা প্রথম মায়ের মূল্য দেয় নি তেমন, অন্ততঃ আর্যশাস্ত্র-পণ্ডিতেরা ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বলেন সে কথাই। মাতৃদেবতা ছিলেন আর্যদের মধ্যে গৌণ। অথচ দেখা যাচ্ছে, লোকাচারে শেষপর্যন্ত আর্যসমাজব্যবস্থাবিধৃত হয়েও ভারতীয় মানুষের মধ্যে মায়ের প্রভাব অপরিসীম। মা নিজের মহিমায় নিজেকে আবার করেছেন প্রতিষ্ঠা। এবং আমার বক্তব্য, এজন্য মায়ের সামাজিক পজিশন তত নয়, যত তাঁর প্রাকৃতিক অবস্থা তাঁকে করেছে দেবীত্ব দান।

মায়ের প্রাকৃতিক অবস্থা থেকেই মা দেবী। এবং কোথাও কোথাও আজ তাঁর মর্যাদা পুরুষ দেবতার পাশে হীনপ্রভা হলেও, একদিন সর্বত্রই কিন্তু মাকে নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল মানুষের অতিপ্রাকৃত জগতের অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়লোকের সাধনা। সামান্য একটু হিসেব নিয়ে দেখুন, চর্চা করুন, তাহলেই দেখতে পাবেন, মায়ের কি সর্বাত্মক বিস্তার ছিল একদিন। এবং এখন হয়তো তা আমাদের দেশেই বেশী রকমে সীমিত। কিন্তু সেজন্য কোন প্রকার হীনমন্যতায় ভুগবার নেই কারণ। কারণ, মা মায়ের স্ব-মহিমাতেই এখানে প্রতিষ্ঠিতা, এবং মায়ের প্রকৃত অর্থ কি, সেটা যদি বিশ্ব বুঝতে পারে, তবে আবার সারা বিশ্বে যে মায়েরই উঠবে জয়ধ্বনি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোন। কিন্তু সে-কথা একটু পরে, তার আগে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অংশে মায়ের রূপ নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করে নি প্রথমে।

খুব একটা বড় আলোচনাতে যাচ্ছি না আমি, তত্ত্ব আলোচনাতেও নয়। প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষেরা লিপিতে ধরে রাখেনি তাদের তথ্য, রেখেছে নমুনাতে। যখনই তা এসেছে লিপিতে তখনই তা এসেছে ইতিহাসের পর্যায়ে—প্রাগৈতিহাসিক আর নয়। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে লিপি পাওয়া গেলেও হয়নি তার অর্থোদ্ধার। যেমন মহেন-জো-দড়োর ক্ষেত্রে। সে-ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং প্রাক্-ইতিহাসের মধ্যে তা দোদুল্যমান। সুতরাং তত্ত্ব ও তথ্য নয়, কতকগুলি অতি প্রাচীন নিদর্শন তুলে ধরে দেবীরূপে মায়ের পরিচয় রাখছি আপনাদের কাছে প্রথম।

ইউরোপ দিয়ে আরম্ভ করা যাক প্রথম। ইউরোপীয়দেরই তো প্রথম অবজ্ঞা মূর্তি পূজাতে। অথচ ইউরোপে অতিপ্রাকৃতের সাধনা প্রথমেই আরম্ভ হয়েছিল মায়ের রূপ দিয়ে, ধরুন গিয়ে খ্রীষ্টের জন্মের আগে চল্লিশ হাজার বছর থেকে বিশ হাজার বছরের মধ্যে কোন এক প্রত্নপ্রস্তর যুগের সময় থেকে। আর্ট প্লেটের ক, খ এবং গ চিহ্নিত ছবি তিনটি দেখুন। এগুলি আনুমানিক উপরোক্ত সময়ের মধ্যেই পাওয়া কতগুলি মূর্তি। এ মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপে

মৃত্তিকা খনন কালে। 'ক'-চিহ্নিত মূর্তিটি দেখুন, বুঝতে পারেন কিছু? এটিকে পাওয়া গেছে দক্ষিণ ফ্রান্সের গেরোন উপত্যকায়। কিছু বুঝতে পারেন দেখে? যেন একখণ্ড আধুনিক কালের ভাস্কর্য। হ্যাঁ, আধুনিক ভাস্কার্যই বটে, যদিও তৈরী অত্যন্ত প্রাচীন কালের মানুষের। আধুনিক চিত্রশিল্প বা ভাস্কর্যের মূল কথা মনোহারা প্রকৃতির কোন অনুকৃতি নয় —একটা ভাবের প্রকাশ মাত্র। প্রকৃত শিল্প করে না কারো অনুকরণ, করে সৃষ্টি। এটা হল আদিম শিল্পীর সৃষ্টি—সভ্যতার বহু ধারা অতিক্রম করে বর্তমান মানুষ আজ যার যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারছে অনেক দিন পরে।

প্রকৃতির অনুকৃতি নয়, ভাব ও মনের অনুভবের প্রকাশই হল বড় শিল্প। সেই জন্য আধুনিক শিল্পীরা স্পর্ধা করেন মনেরও তুলিচিত্র আঁকবার। Expressionist শিল্পীরা ফিগার আঁকতে জেনেও ছবি আঁকেন তাকে বিকৃত করে। পিকাশো জলজ্যান্ত মানুষকে ভেঙ্গে-চুরে সাজান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে। এর অর্থ আর কিছু নয়, আপাতসৌন্দর্য ভেদ করে দর্শককে নিয়ে যাওয়া একটা বিশেষ রকমের ভাবলোকে। এবং সেই অর্থে যদি ভারতের ধর্মীয় চিত্র বা ভাস্কর্যগুলো দেখেন— তাহলে ইউরোপীয় কোন মধ্যম শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির মত নিশ্চয়ই বলবেন না যে, সবটাই একটা অসভ্য বর্বর মানুষের কাজ। কালীঘাটের ভয়ঙ্কর কালী মূর্তির মধ্যে আছে মহাবিশ্বজগতের এক আশ্চর্য রূপ। এবং এই একই মূর্তির অনুকৃতিকে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পাশে রাখা হয়েছে যেখানে, সান্ধ্য-প্রদীপের আলোতে যদি সেই মূর্তিকে দেখেন আপনি, এবং সেই সঙ্গে মহাবিশ্বজগৎ সম্পর্কে যদি আধুনিক বিজ্ঞান প্রসঙ্গে থাকে আপনার পড়া শুনা, তাহলে বিস্মিত এবং বিহ্বল আপনি হবেনই। একমাত্র নিকৃষ্টমানের মানসিকতার অধিকারী মানুষই বলতে পারেন যে, একটা বর্বর মানসিকতার প্রকাশ হল এটা। হয়তো বলবেন, এটা কখনও সম্ভব যে, একটা মানুষের থাকে চার হাত, দশ হাত, চার মাথা বা দশ মাথা ইত্যাদি? হয় না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চার, দশ বা বিশ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে না তাকিয়ে আপনি

যদি এর মধ্যে খোজেন বিশেষ রকমের একটা ভাবের দ্যোতনা, তাহলেই সব পেয়ে যাবেন। মানুষের চাইতে বেশী কিছু অতিপ্রাকৃতত্ব বোঝানোর জন্যই এই ব্যতিক্রম। এই জন্যই ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা সাধু-সন্তের প্রতিকৃতিতে দেখবেন অস্বাভাবিক রকমের একটা দৈর্ঘ্য। স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে সাধুসন্তদের বোঝাবার জন্যই যে করা হয়েছে এরকম, শিল্পে সামান্য জ্ঞান থাকা যে-কোন মানুষই তা বুঝতে পারে। সহজে শুধু বুঝতে পারেনা তারাই, বুদ্ধিমত্তার মুখোশ পরে যারা ভেতরে লুকিয়ে রাখে একটা মহা ইডিয়টকে।

অতীন্দ্রিয় শক্তিকে বোঝানো যায় না কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দিয়ে। সেইজন্য করতে হয় প্রতীক অবলম্বন। প্রতীক-মূর্তির প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হল এক-একটা ভাবের প্রতীক। অতীন্দ্রিয়কে যে করা গেছে অনুভব সীমিত রেখা বা সীমিত ভাষা দিয় যায় না তা প্রকাশ করা। তাই বোঝাতে হয় নিকটবর্তী কোন এক সাদৃশ্য দিয়ে, সংস্কৃতজাত বাংলা ভাষায় যাকে বলে প্রাতিমতা। প্রতিম থেকেই প্রতিমা—অতীন্দ্রিয় জগৎকে বোঝাবার জন্য আমাদের কুমোরটুলির পটুয়ারা প্রতি পূজার মরশুমে যা করে তেরী। দেবতা যখন মূর্তিতে ধরা দেন—তখন সবাংশে দেননা ধরা—দেন তার সাদৃশ্যে, প্রতিমতায়—যাকেই বলে বলে প্রতিমা। কালী বলুন, দুর্গা বলুন, সরস্বতী বলুন, সবই প্রতিমা—সাদৃশ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের একটা আভাস মাত্র। এবং এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও জানিয়ে দিয়ে রাখি, এইসব দেব-দেবীর সঙ্গে যে বাহন, সেগুলিও বিশেষ এক-একটি ভাবের দ্যোতক। ধরুন বিষ্ণুর বাহন গরুড়, কেন? জানেন তো যে, দেবদেবীরা দ্যু-লোক, অন্তরীক্ষ-লোক এবং ভূলোক—নানা স্তরের এক-এক জন প্রতীক? সুতরাং দ্যু-লোক বা অন্তরীক্ষলোকের কোন দেবতার বাহন হিসেবে—যদি দেখানো হয় মাটিতে বিচরণশীল কোন পশুকে, সেটা অসম্ভব। সেই জন্যই শক্তিশালী বহু ঊর্ধ্বগগনে বিচরণশীল ঈগল পাখি বা গরুড় হল বিষ্ণুর বাহন। এমনি করে ময়ূর, সিংহ, ইঁদুর, পেঁচা প্রত্যেকটি বাহনই হল দেবতাদের এক একটি ক্ষেত্র নির্দেশক।

এ সবই হল শিল্প। প্রতিমা। ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতে যাবার মাধ্যম। যদি আপনাকে বুঝতে হয় আধ্যাত্ম জগতের কথা, ধর্ম জগতের কথা, তবে এগুতে হবে এসব কথা মনে রেখেই। অনেক ভেবে ভেবে আশ্চর্য হই, যে-মানুষ আধুনিক কবিতার তারিফ করে, করে আধুনিক শিল্পের প্রশংসা, সেই মানুষই আমাদের কোন দেবদেবীর মূর্তি দেখলে নাক সিট্‌কে বলে—ন্যাষ্টি! সেই তাদের উদ্দেশ্যেই একটা কথা স্পষ্ট করে বলে রাখি যে, যদি আপনারা মূর্তি পূজাকে বলেন অসভ্যতা, তাহলে জানবেন যে, লক্ষ লক্ষ মূর্তিপূজা করেও একমাত্র আমাদের দেশই বিশ্বাস করে না কোন মূর্তিতে। মূর্তির পাদদেশে বসে সন্ধান করে অমূর্ত ব্রহ্মলোকের। এবং সেই জন্যই একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মূর্তি ধ্বংসকারী সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে এসে মূর্তি পূজার ঘোরতর বিদ্বেষী অলবিরূণী পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এ সবই হল বাহ্য। আসলে ভারতীয়েরা সামনে রেখেছে অমূর্তকেই তাদের লক্ষ্য হিসেবে। বরং আমি বলি—যারা মূর্তিতে করেনা বিশ্বাস তারাই রয়েছে সীমার মধ্যে। হিন্দু তান্ত্রিক দেখবেন মদ খেয়ে থুথু ছিটিয়ে করে ৺মায়ের পূজো। কোন খ্রীষ্টান পারবে তার অলটারে থুথু ছিটোতে? কালীকে প্রসাদ দেবার আগে নিজের মুখেই নৈবেদ্য তুলে দিয়েছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। দেবীর উদ্দেশ্যে আনা ফুল দিয়েছেন নিজের পায়ে। কোন মুসলমান সিন্নি দেবার আগেই কি পারবেন তা নিজের মুখে দিতে? গীর্জা এবং ক্রুশ আসনে না রেখে কোন্ খ্রীষ্টান প্রার্থনা জানাবেন রোববার? পশ্চিম দিকে বা মক্কার দিকে মুখ না রেখে কোন্ মুসলমান পড়বেন নামাজ? কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে যিনি মূর্তি পূজো করেন তিনিই গিয়ে বসতে পারেন মূর্তির মাথায়। মূর্তির নিচে বসেও কোন মূর্তি কল্পনা না করেই পারেন অমূর্ত ব্রহ্মে লীন হতে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনকে যেমনভাবে কালী দেখিয়েছিলেন, সেটাই হল ভারতীয় মূর্তি পূজার বড় কথা। কেশবচন্দ্র একদিন নাকি ঠাকুরকে বলেছিলেন—যিনি ব্রহ্মময়ী, বিশ্বময়ী, তিনি এত ছোট কেন? ঠাকুর বলেছিলেন, কাল সকালে এসো সূর্যোদয়ের মুহূর্তে, দেব বুঝিয়ে।

কেশবচন্দ্র পরদিন ঠাকুরের কাছে এলে ঠাকুর বললেন সূর্যের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে—সূর্য বড় না পৃথিবী? কেশব বললেন—সূর্য অনেক বড়। রামকৃষ্ণ বললেন, তাহলে কেন ছোট দেখায়? কেশব বললেন—দূরে বলে। ঠাকুর বললেন—৺মাও তোমার কাছ থেকে দূরে, তাই ছোট দেখ। অর্থাৎ প্রতিমার যাথার্থ যাঁরা বুঝতে পারেন তাঁরাই বোঝেন যে, এ হল গিয়ে প্রতিম—ছোট নয়। এ হল একটা অসীম অর্থের, ভাবের দ্যোতক।

নকল শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের আবির্ভাবের আগে অকৃত্রিম মানুষই প্রথম যথার্থ বুঝতে পেরেছিল এই প্রতিমার অর্থ। তাই প্রতিমার মাধ্যমেই অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ধরা দিয়েছিল জগতের মধ্যে। সেই জন্যই প্রাচীন মানুষের সকলেই প্রতিমার মাধ্যমে করতেন অতীন্দ্রিয়ের পূজা। তাই বিশ্বশক্তি অসীম এক মহিমময়ী ভঙ্গীতে ধরা দিয়েছিল তাঁদের কাছে। প্রতিমরূপের মধ্য দিয়েই এসেছিল অপ্রতিম অনন্ত। প্রত্নপ্রস্তর যুগের ইউরোপের 'ক' চিহ্নিত মূর্তিটি হল তারই প্রতীক। প্রাচীন মানুষের হাতে তৈরী হলেও এটি অত্যন্ত মূল্যবান এক অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তি। এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে যে-ভাব তা হল উর্বরাশক্তি ও মাতৃত্বের পরিচায়ক। উর্বর হলেই মা দেন জন্ম এবং সতেজ হলেই করেন প্রতিপালন। এই জন্য মূর্তিটির সেই অঙ্গই পুষ্ট—যা জীবন ধারণে করে সাহায্য—যেমন, স্তন। জীবন দান করবার জন্য যে উর্বর ক্ষেত্র—উদর, তা হল স্ফীত। এবং জন্মদাত্রী বলেই মা হলেন উলঙ্গ। দেখুন 'খ' এবং 'গ' চিহ্নিত মূর্তি দুটি। প্রথমটি প্রাপ্ত অস্ট্রিয়ার ড্যানিউব উপত্যকাতে। দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি, মেনটন (Menton) নামক স্থান থেকে। এ দুটোও মাতৃমূর্তি, প্রতীকের মাধ্যমে বিশ্বজননীর প্রতিমা। সেই জন্যই স্ফীতোদরা এবং পুষ্টস্তনা, এবং একইসঙ্গে বলিষ্ঠ নিতম্বা—অর্থাৎ উর্বরা শক্তি ও প্রতিপালিক শক্তির প্রতীক।

মাতৃমূর্তি কল্পনায় শিল্পের সৌন্দর্য আর সূক্ষ্মতা বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে, পরবর্তী পর্যায়ে। আর্টপ্লেটে 'ঘ', 'ঙ' এবং 'চ' চিহ্নিত ছবি তিনটি দেখলেই পারবেন বুঝতে।

'ঘ' আর 'ঙ' হল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে, মিশরের। 'চ' চিহ্নিত ছবিটি হল মেসোপোটেমিয়ার, ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এখানে শিল্পকর্ম নয় তেমন স্থুল, সূক্ষ্ম; কিন্তু একই অর্থের প্রতীক, অর্থাৎ মাতৃত্বের। তা ছাড়া উর্বরাশক্তি ও মাতৃত্বের উর্ধেও আরও একটু ভাবের দ্যোতনা আছে এখানে—যেটা বিশেষ করে বোঝা যাবে 'চ' চিহ্নিত ছবিটি একটু দেখলেই। লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, 'চ' চিহ্নিত ছবিটির মুখ যেন কোন সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর। কিন্তু ব্যাপারটা কি হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এজন্য? মনে হচ্ছে আদিম কোন বর্বর-মানুষের কল্পনা? আপনি যদি হন সে-রকম কোন মানুষ, সেই ধরণের ধারণা মনের মধ্যে করেন পোষণ, তাহলে আমার কাছে আপনিই হবেন পরিহাসের পাত্র। যদি এই মূর্তিকে আপনি ধরেন বর্বর মানসিতার প্রকাশ বলে —তাহলে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পী পিকাসোর দিকে কিছুতেই মাথা নোয়াতে পারবেন না শ্রদ্ধাভরে। কারণ, পিকাশো প্রাচীন মিশরের মিশ্রিত মূর্তিগুলি থেকেই শিল্পের এক নতুন ইঙ্গিত পেয়েছিলেন খুঁজে —গতির ইঙ্গিত। আপনি যদি আধুনিক শিল্প না বুঝেও অজ্ঞতা ঢাকবার জন্য মাথা নুইয়ে বলেন—চমৎকার, তাহলে প্রাচীন এই মাতৃমূর্তির অর্থ কিছু না বুঝলেও বলতে বাধ্য হবেন চমৎকার। যদি পিকাশোকে বুঝে বলেন—চমৎকার, তাহলে প্রাচীন এই শিল্পের অর্থও বুঝে বলবেন—চমৎকার।

আপনি ক্লান্ত বোধ করছেন কি রীতিমত? এবং সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলছেন ধৈর্যও? আমার অনুরোধ, ধৈর্য ধরুন একটু। উপন্যাস লেখকের হাতে যদি আপনি আশা করেন গাল-গল্প অবতারণাকারী ধর্মগ্রন্থ লেখকের বিচার বিশ্লেষণহীন লোক-ঠকানো রচনা, আমাকে পাবেন না সে দলে। আমার রচনার সঙ্গে যাঁদের আছে ক্ষীণ সম্পর্ক, তাঁরা জানেন যে—ঈশ্বরের সঙ্গে রীতিমত বিবাদে লিপ্ত আমি (দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার 'ঈশ্বর মরে গেল' ও 'দণ্ডিত আসামী, পঠিতব্য)। সুতরাং সেই আমার অবচেতন মন থেকে যখন এমন একটা বিষয় উঠেছে লাফিয়ে—যা মাটির গভীর অন্তঃপুরে

সরীসৃপের মত ছিল ঘুমন্ত—সেই অবচেতন ইচ্ছাটাকে বিচার বিশ্লেষণ না করে সচেতন মন, আধুনিক বিদ্যাবুদ্ধিতে ভারাক্রান্ত মন গ্রহণ করতে পারেনা কিছুতেই। সুতরাং পূজোর চাইতে বাদ্য একটু বেশী হবেই। মূল বিষয়ে আসার আগে অবতরণিকা হবে একটু দীর্ঘ। সুতরাং ক্লান্ত হবেন না। হবেন না বিরক্তও। সরাসরি অতীন্দ্রিয়-লোকে যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এবং বিশ্বাস করি উচিত নয় আপনার পক্ষেও। সুতরাং বুদ্ধির সূত্র ধরেই অতীন্দ্রিয়-লোকে শুরু করছি যাত্রা। স্থূল লোকের ধাপে ধাপে এগুতে গিয়ে যদি পাই অতীন্দ্রিয়লোকের সন্ধান, মেনে নেব, না হয়তো আর একটা জগৎকে অস্বীকার করব ভূয়া বলে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান হয়ে হবেনা ওমর খৈয়ামের মৌলানা সাহেব—যাদের উদ্দেশ্য করে কবি বলেছেন—মূর্খ তোদের একুল ওকুল ডুবল ঘূর্ণিপাকে।

বিবেকানন্দের মত সাধকও কিন্তু অবিশ্বাস নিয়েই যাত্রা শুরু করে-ছিলেন প্রথম। ভারতীয় অধ্যাত্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে গীতার মত গ্রন্থ সম্পর্কেও তাঁর মনে ছিল সন্দেহের অবকাশ। সুতরাং গীতারহস্য ভেদ করতে গিয়ে স্থূল জগৎ থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। যেমন ধরুন—'Thoughts On The Gita' নামক আলোচনাতে বিবেকানন্দের প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন গীতার রচয়িতা সম্পর্কে, তিনি কি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস না বাদরায়ণ ব্যাস? না স্বয়ং শঙ্করাচার্য গীতা রচনা করে মহাভারতের অঙ্গে দিয়েছেন জুড়ে?

শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত যে গীতার বাণী, সে সম্পর্কেও সন্দেহ নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। শ্রীকৃষ্ণ বলে সত্যি কি কেউ ছিলেন গীতার প্রবক্তা? ছান্দোগ্য উপনিষদের এক কৃষ্ণ আছেন, দেবকীনন্দন, ঘোর ঋষির শিষ্য। মহাভারতের কৃষ্ণ হলেন দ্বারকার রাজা। আবার বিষ্ণুপুরাণে এক কৃষ্ণ আছেন, গোপীবল্লভ। গীতার প্রবক্তা কোন্ কৃষ্ণ? কিংবা একই কৃষ্ণ সেই উপনিষদের যুগ থেকে মহাভারতের যুগ পর্যন্ত ছিলেন বেঁচে? কিন্তু মানুষের পরমায়ু সম্ভব কতদিন? ভগবানের মুখনিসৃত বেদে

আছে—পুরুষ শতায়ু। কিন্তু পুরাণে দেখি আছে দশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছর পরমায়ুর লোকও। তাহলে ?

বিবেকানন্দ আরও বড় প্রশ্ন তুলেছেন—গীতা বর্ণনার স্থান ও কাল সম্পর্কে। কুরুক্ষেত্রে ঠিক যখন যুগান্তকারী এক যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে সারা ভারতের রাজ-রাজড়াদের নিয়ে, যুদ্ধারম্ভের শঙ্খ প্রায় বাজে বাজে, ঠিক সেই মুহূর্তে কি সম্ভব ব্যাখ্যা করা গীতার মত দুরুহ কোন তত্ত্ব ? না কোন যোদ্ধার পক্ষেই সময় আছে মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করার ?

অর্জুনের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ ছিল বিবেকানন্দের মনে। প্রাচীন গ্রন্থ, শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে অশ্বমেধ যজ্ঞকারীদের এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। এতে অর্জুনের প্রপৌত্র, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়-এর নাম আছে, কিন্তু নেই অর্জুনের। অথচ শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের কাছে করেছিলেন গীতা ব্যাখ্যা, অর্জুন যে করেছিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ আর চার ভাইয়ের সঙ্গে মিলে—এ কথা না জানে কে। সুতরাং সন্দেহ, সন্দেহ আর সন্দেহ। বাস্তব চক্ষে গালগপ্প সম্পর্কে এমনি সন্দেহই স্বাভাবিক। বরং যা কিছু আছে প্রচলিত, তাকেই বিশ্বাস করে যাত্রা শুরু করার নাম বিশ্বাস নয়, মূর্খতা। এতে ধর্ম সম্পর্কে, অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। এতে চোর-জোচ্চোরের যত সুবিধা, অধ্যাত্ম এবং অতীন্দ্রিয় জীবনের সন্ধানী কোন মানুষেরই তত নয়। সেই জন্যই যে-বিষয়কে কেন্দ্র করে আমার এই কাহিনীর আরম্ভ, তাকে স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্যই এই বিপুল ভূমিকার অবতারণা। বিবেকান্দ যেমন সন্দেহের খোলা ভেঙ্গে সত্যের শাঁসে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, তেমনি শাক্তপীঠের বর্ণনার প্রারম্ভেই কিছুটা ঐতিহাসিক ও শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যা আমার। এ-সবই হল এ-লোকের, ঐতিহাসিক দৃষ্টি সম্মত, একালের। হলপ করে এ-কথা এখনই বলার উপায় নেই যে, একান্ন মহাপীঠের বর্ণনায় এক আশ্চর্য অতীন্দ্রিয়লোকের স্পন্দন জাগাবো আপনার মধ্যে। আমার বস্তুসম্মত মন যদি বিচার বিশ্লেষণে পৌঁছুতে পারে তার ধারে কাছেও তবে আমায় সঙ্গে আপনিও পাবেন সেই অবর্ণনীয় অমৃতলোকের পরশ,

সস্তায় ঘুষ দিয়ে যাকে পাবার জন্য করি আমরা আঁকুপাঁকু। যেমন ধরুন গিয়ে—পাঁচসিকে ব্যয় করে দৈবকৃপা লাভ, কিংবা ১২্ টাকায় মহাপুরুষের জীবনী পড়ে ঈশ্বর সন্দর্শন। আমার এ প্রয়াসটা নয় একেবারেই সে-জাতীয় কিছু। আসলে আমার এটা আশ্চর্য এক কৌতূহল, রহস্যময় একটা ঘটনার অর্থ বুঝবার চেষ্টায়—যেমন, একটা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেমন করে ছিট্‌কে পড়তে পারে সমগ্রদেশের নানা প্রান্তরে, এবং তা থেকেই বা কেমন করে মহাতীর্থ গড়ে উঠতে পারে দেশের নানা স্থানে! মৃতদেহের অংশেও কি করে থাকে অমৃত-জীবনের স্পর্শ! গীতার মূল্য যেমন তার গল্পে নয়, বক্তব্যে, তেমনই কি এই সতী-শিব সংক্রান্ত গল্পের অন্তরালে আছে এক মহাসত্য লুকিয়ে? যদি দার্শনিক দৃষ্টিতে, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে কি সত্যিই আশ্চর্য কোন অলৌকিক মাহাত্ম্য করে আত্মপ্রকাশ? সুতরাং—ধার্মিকের চোখে, বিশ্বাসীর চোখে বিষয়টা সূক্ষ্ম হলেও, আমার যাত্রা স্থূল থেকেই। সুতরাং লেখকের অনুরোধ পাঠককে, ধৈর্য আপনাকে ধরতেই হবে। যদি আমি নিজে পাই অমৃত জগতের কোন কণা, আপনিও পাবেন। যদি না পান, ধরে নিতে পারি আপনার হবে আশা ভঙ্গ। বিরক্ত হবেন আপনি, এবং শেষপর্যন্ত যাবেন গ্রন্থান্তরে পরিতৃপ্তির জন্য। কিন্তু তার আগে আমার অনুরোধ—আপ্তবাক্যে বা ধর্মের নামে কোন ধর্মগ্রন্থবাক্যে বিশ্বাস না করে, একটু বিচারের মন নিয়ে এগোন আমার সঙ্গে, তারপর দেখা যাক—কি হয় কিংবা না হয়।

হ্যাঁ, সুতরাং আবার আসা যাক মূলে ফিরে। সেই যে আমাদের আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল ৺মাকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ বিশ্ব-মাতাকে। অর্থাৎ আমরা বলতে চেষ্টা করছি যে, ঈশ্বরীয় জগতের সন্ধান শুরু করেছিল অধিকাংশ মানুষ মায়ের মধ্য দিয়েই প্রথম। সেই যে মা, ইউরোপ, মিশর আর মেসোপোটেমিয়ায় তাঁর রূপকল্পনার কয়েকটি শিল্পচেতনা সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমরা। সেই মাতৃরূপের আরও চারটি প্রাচীন মেসোপোটেমীয় ও সিরীয় চিত্র আপনাদের চোখের ওপর তুলে ধরে (পরিশিষ্ট ছ, জ, ঝ ও ঞ চিত্র দেখুন) অতি প্রাচীন-

কালে আমাদের দেশেই সেই মাতৃকল্পনা ছিল কি ধরনের তাই নিয়ে এবার করছি সামান্য কিছু আলোচনা।

আর্ট প্লেটে ক[১] এবং খ[২]-এ একটি মূর্তি এবং মূর্তির মস্তিক দেখুন। পাওয়া গেছে আমাদের দেশেই, সিন্ধু-উপত্যাকাতে। নব্য প্রস্তর যুগের মূর্তি এগুলো। কিন্তু এ-সব মূর্তির মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার চাইতেও বসুন্ধরা মাতার মূর্তিকল্পনাই অনেক বেশী প্রবল।

৺মায়ের রূপের চূড়ান্ত ধারণা এসেছে তখনই, যখন তাঁকে শুধুমাত্র অন্নদা ধরিত্রীর উর্বরতার প্রতীক হিসেবেই করা হয়নি কল্পনা, যখন তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে শক্তিরূপে। কিন্তু মাতৃরূপের মধ্যেই সিন্ধু-উপত্যকার লোকেরা যোজনা করেছিলেন একটি বিশেষ অর্থ যখন তাঁকে পুরুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি কল্পনা না করে প্রতীকের সাহায্যে দেখিয়েছেন মাতৃরূপ, যেমন, যোনি দ্বারা বুঝিয়েছেন মাতাকে, এবং লিঙ্গ দ্বারা পুরুষকে। হ্যাঁ, প্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকাতেই জগৎ-উৎস কল্পনাতে এই লিঙ্গ ও যোনির কল্পনা করেছিলেন সেখানকার মানুষেরা —যা নাকি পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছে শিব-শক্তিরূপে। আপাত-দৃষ্টিতে এটা দুই, কিন্তু দার্শনিক ও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এক। যেমন— পরবর্তীকালে শিব-শক্তির চিন্তাতে এইরকম একটা ধারণা উঠেছে স্পষ্ট হয়ে যে, শিব আর মাতৃরূপা বা প্রকৃতিরূপা শক্তি এক! শিব অর্থাৎ পুরুষ, অর্থাৎ মূল; অপরিবর্তনীয় এই সৎ-এর গুণই হল শক্তি। অবিচ্ছেদ্য 'এক' দৃষ্টিভেদে 'দুই'। এবং এখানেই শক্তিরূপা ৺মায়ের কল্পনা এক অতীন্দ্রিয় অর্থে ভরে উঠেছে অধ্যাত্মচিন্তায় উন্নত মানুষের কাছে। কিন্তু সেকথার আলোচনা হবে যথাসময়ে, এখন থাক। আপাতত এইটুকু কল্পনা করলেই যথেষ্ট যে, আদিম মানুষের মাতৃরূপ-কল্পনা প্রত্নপ্রস্তর যুগে ভারতে এসেই মোড় নিয়েছিল এক বিশেষ ধরনের, যে ধরনের গতি-পরিবর্তন খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, সভ্যতায় প্রচণ্ড উন্নত গ্রীস এবং রোমও পারেনি দেখাতে।

উর্বরাশক্তির প্রতীক বসুন্ধরা মায়ের রূপচিন্তার উর্ধ্বেও গ্রীস ও

রোমে এসেছিল ৺মায়ের শক্তিরূপের বিশেষ একরকম কল্পনা। যার ফলে এথেনা জাতীয় শক্তিরূপা দেবীর কল্পনা করতে পেরেছে গ্রীস। কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয় সৎ-এর গুণ ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশে শক্তি যে অর্থহীন, এমন উন্নত ধরনের কল্পনা করতে পারেননি গ্রীসের অতিলৌকিক জগতের সন্ধানী ব্যক্তিরাও খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এথেনাকে দেখা যাচ্ছে অসুর নিধন করতে আমাদের দেবী দুর্গারই মত। কিন্তু দুর্গার ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্যরূপে যেমন যুক্ত রয়েছে শিব, এথেনার ক্ষেত্রে নেই তেমন কিছু। অর্থাৎ মায়ের শক্তিরূপ পরবর্তীকালে ভারতীয় মাতৃরূপ কল্পনার মত অধ্যাত্মতায় বা দার্শনিকতায় উজ্জ্বল নয়, যে উজ্জ্বলতার সূত্রপাত পুরুষ এবং প্রকৃতির একাত্ম সম্পর্কের চিন্তা থেকে, সেই সিন্ধু-উপত্যকার মাটিতে। ভারতের বাইরে দেব-দেবীর যুগলমূর্তি তৈরী হয়েছিল নানা দেশেই, এবং এই ভারতেও প্রত্যেকটি প্রধান দেবতার সঙ্গেই আছেন দেবী যুক্ত। কিন্তু ভারতীয় কল্পনাতে দেবতাকে যে-ভাবে দেখানো হয়েছে সৎ এবং দেবীকে তাঁর গুণ হিসাবে, অন্যত্র নেই সেরকম। অন্যত্র মানবিক পদ্ধতিতে দেবতার একটি স্ত্রী থাকা প্রয়োজন বলেই কল্পনা করা হয়েছে তাঁর এক সহধর্মিনী, যেমন, অধিকাংশ মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় দেবতাই হলেন বিবাহিত। কিন্তু সেই স্ত্রী-মূর্তি নয় শক্তিরূপা ৺মায়ের কল্পনা, নিতান্তই কোন দেবতার স্ত্রী হিসেবে বর্তমান।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীসে মাতৃশক্তির যে দেবীরূপ কল্পনা, তাতে শিল্পোৎকর্ষের ঘটেছে চরম উন্নতি ঠিকই, কিন্তু অধ্যাত্ম চিন্তার নেই তেমন প্রকাশ। এথেনার ভাস্কর্যরূপকল্পনাই তার প্রমাণ। এবং এর সঙ্গে তৎকালীন গ্রীসের চিন্তাধারাও ছিল যুক্ত, যেমন, খ্রী: পূ: পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীসে বিশ্বাস ছিল যে, শক্তির চরম বিকাশ হতে পারে একমাত্র সুসম মনুষ্যরূপেই। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বেই মহাবিশ্বজগতের পূর্ণতা।

কিন্তু ভারতীয় কল্পনাতে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্য প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার সময় থেকেই সাধনার ইঙ্গিত থাকলেও, মানুষের দৈহিক নিখুঁততার নেই কোন অধ্যাত্ম মূল্যই। পূর্ণের পরিপূর্ণতা রূপে কখনও

হতে পারেনা প্রকাশিত। রূপ হল পূর্ণের প্রতিম মাত্র। তাই ভারতীয় শিল্পকল্পনাতে নেই গ্রীসীয় শিল্পীর মানব-কায়ার নিখুঁততা, আছে তারও উর্ধে আকার ইঙ্গিতে অনন্তের আভাস। এবং এ-ধরনের শিল্পের সূত্রপাত হয়েছিল সিন্ধু-উপত্যকা থেকেই ভারতে প্রথম।

আমাদের দুর্ভাগ্য, সিন্ধু সভ্যতার পতনের পর থেকে ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের নমুনা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্যদের উত্থানের পূর্বে আর নেই। মহাকালের অতলে বোধহয় জাগতিক ধ্বংসের নিয়মেই গেছে তলিয়ে। তবে, সম্ভবতঃ আর্য সামন্ত-যুগের একটি সোনার পাত (Plaque), পাওয়া গেছে লরিয়া নন্দনগড়ে (Lauriya Nandangarh), মাটি খনন করে। এই সোনার পাতে পাওয়া গেছে যে মূর্তি, সম্ভবতঃ তা কোন মাতৃদেবতার, হয়তো বসুন্ধরা মাতারই (আর্ট প্লেটে সোনার পাতে মূর্তি দেখুন)। এর সঙ্গে আছে প্রস্তর যুগের ইউরোপের মাতৃকল্পনার সাদৃশ্য, মেসোপোটেমিয়ান শিল্পের নৈকট্য, কিন্তু নেই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রূপায়িত গ্রীক-ভাস্কর্যের মানব দেহের উৎকর্ষ। নেই যে, এর কারণ মানসিকতার তফাৎ। বস্তুত সেই দিক থেকে গ্রীক শিল্প অধ্যাত্মতার ক্ষেত্রে লাভ করতে পারেনি প্রত্নতাত্ত্বিক ইউরোপের সাফল্যও যা পেরেছে ভারতীয় শিল্প। রূপে অরূপকে ধরা যায়না, যায় প্রতিমাতে। তাই দৈহিক পরিপূর্ণতার দিকে নজর না দিয়েও ভারতীয় শিল্প-কল্পনা দিয়েছে অতীন্দ্রিয় জগতের যে সন্ধান, গ্রীসের মত শিল্পের দেশও পারেনি তা দিতে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন আর্টপ্লেটের ঐ মূর্তিটি : জিহ্বা-প্রসারিতা সর্প-কোমরবন্ধা এক নারী। দেখতে যেন ঠিক ভয়ঙ্করী কালীর মতন। শুধু চার হাত নেই এবং পায়ের তলায় নেই শিব, এই যা। কিন্তু অধ্যাত্ম কল্পনার অভাবে এই মেড়ুসা হল রাক্ষসী আর করালবদনী প্রসারিত-জিহ্বা এবং রক্তস্নাত হওয়া সত্বেও কালী হলেন দেবী। মূর্তি ও প্রতিমার মধ্যে এই হল পার্থক্য। ভারতবর্ষের মাতৃরূপকল্পনা এইজন্যই প্রতিমা মাত্র, নয় অন্য কিছু।

মাতৃশক্তির কল্পনা হিসাবে প্রতিমার কিছুটা দ্যোতনা আছে এশিয়া

মাইনরের প্রাচীন দেবী—গ্রীকদের আর্টেমিসের রূপকল্পনাতে। কিন্তু এই দেবী-কল্পনার উৎপত্তি নয় ইউরোপে বরং এশিয়াতে; গ্রীকরা গ্রহণ করেছিল এই মাত্র। বহু স্তনসমন্বিতা এই আর্টেমিস (আর্ট প্লেট দেখুন) প্রাণ-শক্তির প্রতীক। মানুষকে তিনি ধারণ করেন, সংসার সমুদ্রের সংগ্রামে প্রবল সহায়। কিন্তু ভারতের শক্তিরূপা মাতৃমূর্তির সঙ্গে কিছুটা এর সামঞ্জস্য থাকলেও সেই অধ্যাত্মতার পরশ এতে নেই। এই কারণে নেই যে, ভারতবর্ষে মাতৃশক্তিকে পুরুষ বা সৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়নি কখনও, বিশেষ করে ৺মাকে যখন শক্তিরূপে করা হয়েছে কল্পনা। সৎ-এর গুণ হিসাবে ৺মায়ের কল্পনা ভারতবর্ষে শক্তিরূপা ৺মায়ের কল্পনাকে তুলে ধরেছে পৌত্তলিকতার বহু ঊর্ধে, যে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে যথোপযুক্ত সময়ে, এখন থাক।

মাতৃশক্তিরূপে বিশ্বের বিরাট অংশে মানুষের প্রাচীন কল্পনা যেভাবে হয়েছিল উদ্বোধিত, সে সম্পর্কে আরও সামান্য একটু আলোচনার পর ভারতবর্ষে শক্তিরূপে মাতৃ-কল্পনার মূল আলোচনায় আসা যাবে পরে। এবং দেখা যাবে কি করে স্থূল থেকে মায়ের কল্পনা সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম জগতে লাভ করেছে অপরিসীম মহিমা।

আগেই বলেছি, ৺মায়ের মুখ্যতঃ দুই মূর্তি—উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসাবে স্থূল ধরিত্রী ৺মা, এবং শক্তিমূর্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৺মায়ের মূর্তি মানুষের কল্পনায় এসেছে ধরিত্রীর প্রতীক হিসেবেই। এবং এই ধরনের মাতৃরূপকল্পনা ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, কিংবা আফ্রিকা, সর্বত্রই প্রচলিত ছিল একদিন।

প্রাচীন মেক্সিকোতে নাকি আশ্চর্য এক মাতৃমূর্তি ছিল মানুষের কাছে, যাঁকে তারা ডাকতো Tlalli Ilalli বলে। এ কথার অর্থ নাকি পৃথিবীর মর্ম। কেউ বলেন, এই দেবী মূলতঃ ছিলেন চন্দ্রদেবী, পরে রূপান্তরিতা হয়েছেন ৺মা-পৃথিবীতে। আমার হাতে নেই এ দেবীর মূর্তি দেখাবার মত কোন নিদর্শন, দুঃখিত।

প্রাচীন লেখক ট্যাসিটাসের লেখাতে আছে মাতৃরূপে জার্মানদের

আরাধ্যা দেবীর কথা। প্রায় সব জার্মানই নাকি পূজো করতেন নের্থাস নামে এক দেবীর। আর্ট প্লেটের 'খ' চিহ্নিত মূর্তিটি পাওয়া গেছে জার্মান অধ্যুষিত ড্যানিউব নদীর উপত্যকাতে। ইনিই সেই নের্থাস কিনা কে জানে! উর্বরা শক্তির প্রতীক এ-দেবী যে মাতা পৃথিবীরই প্রতিমূর্তি, সে বিষয়ে অন্ততঃ সন্দেহ নেই আমার। আর নের্থাস দেবীও ছিলেন মাতা পৃথিবী।

প্রাচীন গ্রীসে আমরা এথেনাদেবী সম্পর্কে করেছি আলোচনা। কিন্তু এথেনা নয় মাতৃরূপা পৃথিবীর প্রতীক। বরং শক্তিরূপা মাতৃরূপ। মাতৃরূপা ধরিত্রীদেবীর পূজা করতেন তারা 'র্হী' নামে দেবীকে কেন্দ্র করে, যেমন রোমানরা করতেন 'সিবিলি' দেবীর। সিবিলি হলেন দেবজননী অদিতির মত। মূলতঃ এই সিবিলির কল্পনা রোমানরা লাভ করেছিল এশিয়াবাসীদের কাছ থেকেই। সম্ভবতঃ কোন এশীয় মাতৃদেবীই রূপান্তরিতা হয়েছেন সিবিলিতে। অবশ্য রোমানদের ধারণা, গ্রীক দেবী র্হীরই সমগোত্রা হলেন সিবিলি। দেবতা জুপিটারের মাতা ছিলেন র্হী। সিবিলীতে তিনি হয়েছেন সকল দেবতার মাতা, এই যা ব্যতিক্রম। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই সিবিলিও দ্যু-লোকের জননী হিসাবে আবদ্ধা না থেকে ধরিত্রীরূপা মায়ের মূর্তি ধরে এসেছিলেন মানুষের কাছেই। এবং সম্ভবতঃ উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসেবেই।

পৃথিবীতে পৌত্তলিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে ভারতবর্ষের নামই যে প্রথম, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই নিশ্চয়ই। এবং আদিম অধিবাসী ছাড়া ভারতের যে-কোন হিন্দু অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখবেন, সে বলবে, তার জীবনধারা বৈদিক নিয়মকানুনে বাঁধা। অর্থাৎ আর্য-সংস্কৃতির তারা যে উত্তরাধিকারী, সে-কথা জানাতে কেউ দ্বিধা বোধ করবেনা বিন্দুমাত্র। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার হল এই যে, আর্যদের স্তোত্র রচনায় দেবদেবীর কল্পনা থাকলেও, তাদের মধ্যে ছিলনা মূর্তিকল্পনা। আবার দেবদেবীর কল্পনাতেও পুরুষের যত ছিল প্রাধান্য, নারী-দেবতার তত নয়। অথচ সেই মাতৃশক্তিই আজ যে ভারতীয় হিন্দু অধিবাসীদের বিরাট এক অংশের হৃদয় জুড়ে আছে

প্রধান আরাধ্যা হিসেবে, সে বিষয়ে নেই সন্দেহের এতটুকু অবকাশ। সেটা যে কেমন করে হল, কেন হল, সত্যিই তা ভাববার বিষয়।

মাতৃরূপে জগৎশক্তির কল্পনা অনার্যদের মধ্যেই ছিল বেশী, অনেকেই বলেন একথা। এবং তাঁরা আরও মনে করেন যে, অনার্য সংস্কৃতি সর্বাংশেই আর্যসংস্কৃতি থেকে নিকৃষ্ট। ফলে 'গ্রেসামস ল' কাজ করেছে ধর্মের ক্ষেত্রেও। অনার্যদের ইনফিরিয়র মাতৃ-আরাধনা আর্যদের প্রকৃতিরূপ পুরুষদেবতার স্থান বহুলাংশেই নিয়েছে অধিকার করে। Bad money drives away good money—এ তত্ত্ব কাজ করেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও।

কিন্তু এরকম ধারণাকে প্রশ্রয় দেবার মত কোন সঙ্গত কারণ হাতে নেই। অনার্যরা মাতৃ-আরাধনাই করতেন বেশী করে, একথার প্রমাণ কি? অনার্য সিন্ধু সভ্যতায় যেমন পাওয়া গেছে মাতৃরূপ, তেমনই পাওয়া গেছে পশুপতি নামে পুরুষ দেবতার মূর্তিও। আবার পুরুষও প্রকৃতিকে মিশিয়ে দিয়ে যোনি-লিঙ্গের পূজাপদ্ধতিরও প্রমাণ মিলেছে সেখানে। সুতরাং অনার্য মাতৃ-সাধনা আর্য পুরুষদেবতার স্থান দেশের বিরাট এক অংশে দখল করে নিয়েছে ক্রমে ক্রমে, একথা ভাববার নেই কোন কারণ। যদি নিয়েও থাকে—তবে নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ হবে মাতৃদেবতার কল্পনা কোন হীন কল্পনা নয় কখনই। যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে মনে করতে হবে যে, আর্য-চিন্তাতেই ছিল ৺মায়ের জন্য বিশেষ একটা স্থান। সেই আর্য-মাতৃশক্তির ভিত্তিতে অনার্য মাতৃশক্তি এসে আসন পেতে ভারতে শক্তিরূপে ৺মায়ের কল্পনাকে করে তুলেছে আরও প্রবল। সুতরাং আর্য-চিন্তাতে মাতৃরূপের জন্য আসন পাতা ছিল কতটা সেটাই দেখা যাক আগে।

বৈদিক আর্য সাধনায় মূর্তিরূপে নেই বটে কোন দেবদেবী, তবে মাতৃরূপে দেবীর কল্পনা আছে অনেক ক্ষেত্রেই। যেমন, মাতৃদেবীরূপে পৃথিবীর বর্ণনা আপন মহিমাতেই প্রসিদ্ধি অর্জন করে আছে সেখানে। তবে স্বতন্ত্র মহিমাতে নেই জগৎকারণ শক্তিরূপে উজ্জ্বল কোন ৺মায়ের মূর্তি। ঋগ্বেদে পৃথিবীকে কল্পনা করা হয়েছে মাতারূপে। কিন্তু তাঁর

সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে পিতা দ্যৌ-কেও। এখন ধারণা হতে পারে, ৺মায়ের সঙ্গে পিতার একটা অবিচ্ছেদ্য সংযোগ দেখে, যে, পরবর্তী কালে শক্তির সঙ্গে শিবের যে একটা অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ, তার সূত্রপাত বুঝি এখান থেকেই, অর্থাৎ ঋগ্বেদের সময় থেকে। কিন্তু ব্যাপারটা নয় সেরকম। পুরুষ এবং প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ইঙ্গিত সিন্ধু সভ্যতাতেই ছিল স্পষ্ট ভাবে। সিন্ধু উপত্যকার যোনি এবং লিঙ্গ হল তারই প্রতীক।

এবং কথাটা যে নয় আমার স্বকপোলকল্পিত, তার প্রমাণস্বরূপ সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া যোনি ও লিঙ্গের চিত্র তুলে ধরছি আপনাদের কাছে (আর্ট প্লেটে যোনি ও লিঙ্গের চিত্র দেখুন)। আসলে মাতৃকল্পনার প্রথম পর্যায়ে পৃথিবীর অন্য দশজন মানুষ করেছে যে ভাবে চিন্তা আর্যরা যে তা থেকে পেরেছে পৃথক কোন চিন্তা করতে তা নয়। এই পৃথিবীমাতা হল জন্মদায়িনী মাতারই এক প্রতীক। অর্থাৎ এখানেও রয়েছে সেই ফার্টিলিটি কাল্ট। ঋগ্বেদের বেশ কিছু সূক্তে আছে এমন কথা যাতে বলা হয়েছে যে, দ্যৌ-রূপ পিতার বর্ষণ হল রেতঃ এবং এই রেতঃপাতের ফলেই পৃথিবী গর্ভে ধারণ করেন শস্য। অনার্য সিন্ধুসভ্যতায় মাতার কল্পনাতেও যে আছে এই শস্যপ্রদায়িনী মায়ের রূপ, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে হরাপ্পা থেকে পাওয়া একটি Terra cotta seal-এ। এখানে মাতৃমূর্তি আছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভঙ্গিতে, ভূমিতে মাথা রেখে ঊর্ধ্বদিকে পা দুটি ফাঁক করে। একটি শস্যের চাড়া উঠছে তার পেট থেকে। আর পাশে, বাঁদিকে রয়েছে একজোড়া বাঘ পরস্পরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। এই Terracotta sealটির নমুনা আমার হাতে নেই। থাকলে অবশ্যই তুলে দিতাম ব্লক তৈরী করে বর্তমান গ্রন্থের আর্টপ্লেটে।

এ ধরনের কোন মূর্তির কথা শুনবার পর নিশ্চয়ই মনে মনে সন্দেহের থাকেনা কোন অবকাশ যে, মা, আসলে পৃথিবী, জন্মদাত্রী জননী, উর্বরা শক্তিরই প্রতীক। ঋগ্বৈদিক সূক্তের মাতা পৃথিবীও নয় এর উর্ধে অন্য কিছু। বরং যোনি-লিঙ্গ কল্পনা করে এবং লিঙ্গকে

পুরুষের অর্থাৎ পরমপুরুষের প্রতীক করে এবং মহাযোগীর ভঙ্গিতে অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত পশুপতির বসবার ভঙ্গীতে পুরুষকে কল্পনা করে, শিবশক্তির কল্পনাকে প্রাক-বৈদিক ভারতীয় মানুষেরাই এনেছিল মনে হয় প্রথম (আর্ট প্লেটে পশুপতির মূর্তি দেখুন)। এবং হরাপ্পাতে প্রাপ্ত এই মূর্তি আর একটা সমস্যাও তুলে দিচ্ছে বোধহয় অনার্য বিদ্বেষীদের কাছে।

৺মায়ের মূর্তি কল্পনায় দুটো রূপের কথা বলেছি আগেই আমরা, অর্থাৎ একটি স্থূল, আর একটি সূক্ষ্ম। স্থূল যুক্ত প্রজনন ক্ষেত্রের সঙ্গে, সূক্ষ্ম শক্তিরূপা ৺মায়ের কল্পনাতে। ভারতবর্ষে মাতৃমূর্তির শক্তিরূপা কল্পনা বোধহয় দশভূজা দুর্গার মূর্তিতেই চূড়ান্ত। তবে এই দুর্গার নিউক্লিয়স বৈদিক সাহিত্যে এবং উপনিষদে থাকলেও, আসলে তাঁকে কেন্দ্র করে যে-সমস্ত গল্প, সে-সব গল্পের উৎপত্তিই হল পুরাণে, যে পুরাণ সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত এই যে, এর অনেকটাই প্রভাবিত অনার্য ভাব ধারায়। এবং সেক্ষেত্রে সাহস করে বলতে গেলে এ-কথাই হয় বলতে যে, দুর্গা ঠিক বৈদিক আর্যদের দেবী নন, মূলতঃ তিনি অনার্য। তবে, দেবী ঋগ্বৈদিক না হলেও আপনবোধে আমাদের দ্বারা পূজিতা এবং আর্য চিন্তাসম্ভূতা বলে সম্মানিতা।

এই দুর্গা পর্বতবাসিনী এবং সিংহবাহিনী। হরাপ্পাতে প্রাপ্ত দেবীর পাশে যদিও নেই পর্বতের কোন ইঙ্গিত, তবে আছে ব্যাঘ্র। অনার্য মাতৃদেবীর সঙ্গে যুক্ত এই ব্যাঘ্রই কি তবে আর্য পর্বতবাসিনী পার্বতী দুর্গার বাহন, কেশরী সিংহের নিউক্লিয়স? পশু যে সিন্ধু উপত্যকার অনার্যদের জীবনে বিশেষ এক স্থান ছিল অধিকার করে, সে বিষয়ে সিন্ধুসভ্যতা থেকে পাওয়া Terracotta seal দেখবার পর উচিত নয় আর কোন সন্দেহ থাকাও। তবে দেবীর সঙ্গে গিরি বা পর্বতের সম্পর্কটা কাদের চিন্তা? অনার্যদের না আর্যদের?

আপনি যে স্ফীতবক্ষে এ উদ্ভাবনের জন্য আর্যদেরই দেবেন বাহবা তারও নেই নিশ্চিত উপায়। অনার্য সভ্যতার নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত হলেও অনার্যরা যে কেবলমাত্র ছিল সমতল ভূমিরই অধিবাসী

একথা বলতে আপনি সত্যি পারেন কি ? ছোট ছোট গিরিবক্ষে আজো যে বাস করে অসংখ্য সাঁওতাল, কোল, ভীল আর মুণ্ডা জাতের লোক সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা কারও। এবং গগনচুম্বী হিমালয়ের জঙ্গলেও যে তাদের নেই কোন বাসস্থান, এমনও বলতে পারেন না কেউই।

ভারতের গিরিপ্রহরী উত্তর হিমালয়ের অঙ্গনে এমন অসংখ্য মানুষ দেখবেন আপনারা, যারা বর্ণে গৌর, স্বাস্থ্যে চমকপ্রদ এবং রূপে ভুবনমোহন বা মোহিনী। কিন্তু তাই বলে তারা সবাই যে আর্য-বংশসম্ভূত তা বলতে পারেন না কেউই। বেশী দূরে যাবার দরকার কি, কাশ্মীর উপত্যকায় ঐ যে দেখেন ভূবনমোহন বা ভুবনমোহিনীর দল—ঐতিহাসিকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যে, তারা নয় আর্য। এবং এই সব পর্বতাশ্রয়ী মানুষেরা যে পর্বতবাসিনী কোন মূর্তি কল্পনা করেন নি কখনও, তা হলপ করে বলা যায় না আজও। এমন হতে পারে যে, এই সব পর্বতবাসী মানুষেরই আরাধ্যা দেবী হলেন পার্বতী, পরে করেছেন আর্য-জগতে প্রবেশ। কারণ, দেখুন এই একই দেবীর এমন সব বিভিন্ন নাম আছে, যা থেকে নিশ্চিত রূপে জানা যায় যে, এঁরা একদা ছিলেন অনার্যদের দ্বারা পুজিতা। যেমন ধরুন, না—অপর্ণা, যার অর্থ পর্ণ দ্বারা নন আবৃতা। এমন প্রায়-নগ্ন অনার্য যে এদেশে ছিল, তাতে নিশ্চয়ই সন্দেহ করবেন না আপনারা যে, যারা পরিধান করত শুধু বল্কল বা পত্র। আবার এমনও কেউও ছিল যে, থাকতো নগ্নই। ফলে এমন কোন নগ্ন জাতেরই মাতৃরূপ হতে পারে অপর্ণা, অর্থাৎ নগ্ন দেবী, যিনি পরতেন না পত্রও। এবং নগ্ন-শবর জাতীয় কোন অনার্যই হয়তো পুজা করত তাঁকে। আবার পত্রবস্ত্র পরিহিতা দেবীও যে ছিল, তার প্রমাণ আছে, যেমন, পর্ণশবরী। পর্ণশবর বলে যে এক জাত আছে, তিনি ছিলেন সম্ভবতঃ তাদেরই আরাধ্যা। পর্ণশবরী নামে বৌদ্ধদের যে এক দেবী আছেন, সম্ভবতঃ মূলে তিনিও ছিলেন এই পর্ণশবর জাতীয় মানুষেরই মাতৃদেবী। অনেকেরই ধারণা, এই ভাবে কাত্য জাতির দেবী

ছিলেন কাত্যায়নী এবং কুশিক জাতির পূজার দেবী কৌশিকী, পরে যাঁরা শক্তির একীকরণ গল্পের মধ্যে গেছেন মিশে।

স্বয়ং পার্বতীদেবী, যাঁকে আমরা বলি ৺দুর্গা, সিংহবাহিনী আদ্যাশক্তিস্বরূপা তিনি আর্যদের কাছে, একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আপনারা সবাই যে, তাঁরই এক নাম উমা, যখন গিরিরাজ দুহিতা রূপে আমাদের কাছে তিনি প্রকাশিতা। এই উমা শব্দেরই এমন একটা ইঙ্গিত আছে, যা আপনাকে রীতিমত চমকিত না করে ছাড়বে না চিন্তা করলে—যেমন, পণ্ডিতেরাও ঝঞ্ঝাটে আছেন উমা শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে। 'উমা' কথাটা সংস্কৃতজাত শব্দ কিনা তাই নিয়েই প্রথম দেখা দিয়েছে ঝঞ্ঝাট। অভিধানে নাকি করা হয়নি এর কোন প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্দেশ। তবে মন গড়া ব্যাখ্যা আছে অনেকেরই। যেমন, অনেকের মতে 'উ' শব্দের অর্থ হল শিব, আর 'মা' শব্দের অর্থ শ্রী। শিবের শ্রী যিনি, তিনিই হলেন উমা, অর্থাৎ পার্বতী উমা। কেউ কেউ আবার 'মা' শব্দের অর্থ করেছেন মননকারী হিসেবে, অর্থাৎ যিনি শিবকে মনন করেন, ধ্যান করেন, তিনিই হলেন উমা। কোন কোন বাঙ্গালী কবির উর্বর মস্তিষ্ক এমন ব্যাখ্যাও করেছে, যেমন,—জন্মের কালে উমা উম. (উঙা ! উঙা !) করেছিল বলেই নাম হয়েছে উমা। একথা বলেছেন শিবায়নকার রামকৃষ্ণ। যেমন—

'উমা উমা শব্দ হৈল ভূমিষ্ঠের কালে
কেহ কেহ তে কারণে উমা উমা বলে'।

এ ধরনের গোবর সার দেওয়া মস্তিষ্কের কল্পনাকে যদি মানতে হয় ব্যাখ্যা হিসেবে, তাহলে আমার এবং আপনার নামও হওয়া উচিত উমা। জগতের প্রত্যেকেরই নামই হওয়া উচিত ঐ একটাই। কারণ, মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর নতুন পরিবেশে এসে পড়তেই হতচকিত নবজাতক সর্বত্রই উঠে একটা আর্ত চিৎকার করে, এবং সেই চিৎকারই শোনায় উমা, উমার মত। এটা কোন ব্যাখ্যা নয়। কবির, বিশেষ করে বাঙ্গালী কবির ভাবের থাকেনা কোন লাগাম এবং চরসসেবী গল্পকারের গল্পের মত কবিদের ভাবের গরুও পারে গাছে উঠতে।

অর্বাচীনের কথার কোন মূল্য নেই। এমনকি মহাকবি কালিদাসের কবিকল্পনারও এখানে আমরা মূল্য দিতে রাজী নই, যেমন ধরুন না, কালিদাস একজায়গাতে উমার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—মেনকা নাকি শিবের তপস্যাতে কন্যার কষ্ট দেখতে না পেরে বলে উঠেছিলেন, উ মা, 'উ' অর্থাৎ ওহে, 'মা' অর্থাৎ তপস্যা করিও না। সেই থেকে পার্বতীর নাম হয়েছে উমা—'উ মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাৎ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম।' স্রেফ কবিকল্পনা। কবির কল্পনা নিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবা চলে, কিন্তু তার উপর নির্ভর করে যায় না কাজ করা। পুরাণের মত পুরানো পদ্ধতির অনেক উর্বর মস্তিষ্কও এ ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন নানা ব্যাখ্যা দেবার, কিন্তু জেনে রাখুন, এ-সবই হল চরসখোরের গল্পের গরুর গাছে ওঠা—ভিত্তিহীন। উমা শব্দের একটাই আছে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা এবং সেটা দিয়েছেন ঐতিহাসিকেরা। যেমন, দ্রাবিড়দের ওম্ম শব্দ থেকে এসেছে উমা শব্দ। ওম্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে মা। এবং এই দ্রাবিড় ওম্ম বা উম্মের ব্যাবিলনীয় প্রতিশব্দ হচ্ছে উম্মু বা উম্ম এবং একাডীয় প্রতিশব্দ উম্মি। অর্থাৎ অনার্য মা-ই হয়তো উমা হয়ে হয়েছেন পার্বতী। কারণ, সিংহবাহিনী না হলেও অনার্য সিন্ধু উপত্যকার মা যে ব্যাঘ্রবাহিনী হতে পারেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে হরপ্পার Terracotta Seal-এ। আর তা ছাড়া ভারতীয় আর্যদের সিংহবাহিনী দেবীকল্পনার আগেও নানা দেশে পাওয়া গেছে মায়ের সিংহবাহিনী মূর্তি। যেমন, ক্রীট দ্বীপের একটি মুদ্রাঙ্কিত আংটিতে পাওয়া গেছে পর্বতবাসিনী এক দেবীর মূর্তি, যাঁর দুই পাশে দুই সিংহ। প্রাচীন গ্রীসের মাতৃদেবীও ছিলেন অঞ্চলশোভিতা, বর্শাধারিণী এবং পর্বতশিখরবাসিনী। তিনিও সিংহদ্বারা বেষ্টিতা। আবার ক্রীট দ্বীপের দেবী মূর্তি এশিয়া মাইনরের সিবিলি দেবীর সঙ্গে একীভূতা হয়ে দেবীকে করে তুলেছেন নানা বাহনযুক্তা বা পশুসেবিতা। যেমন, আসনযুক্তা সিবিলী দেবীর পদপ্রান্তে দেখতে পাই সিংহ, ভল্লুক, চিতাবাঘ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর সব জন্তু জানোয়ার। আর তাঁরও বাসস্থান দেখতে পাই এমন কতকগুলি স্থানে, যাতে তাঁকে বলা যায়

পর্বতবাসিনী। যেমন, মিসিয়া, লিডিয়া, ফ্রিগিয়া প্রভৃতি স্থানের পর্বতশীর্ষে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মেসোপোটেমিয়ার এক রিলিফে দেখতে পাই (Hittite rock relief) এমন চিত্র, যা প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র পর্বতবাসিনী নয়, ছিলেন সিংহবাহিনী দেবীও। আর্ট প্লেটে দেওয়া ছবিটি দেখুন—তাহলে স্পষ্টই দেখতে পাবেন যে, এতে সিংহারূঢ়া মূর্তিটি (অবশ্যই নারী মূর্তি) সিংহের উপর দণ্ডায়মানা, আর সেই সিংহের পদতলে রয়েছে কয়েকটি পর্বতশীর্ষ। সামঞ্জস্য আছে Cappadocian দেবী 'মা' (Ma)-এর সঙ্গেও। তিনিও সিংহ বা চিতার উপর দণ্ডায়মানা। আমাদের শিবের মত 'মা'-এর স্বামী Teshub আরোহণ করে আছেন বৃষ। তাঁর হাতে আমাদেরই শিবের মত বজ্রত্রিশূল। পীঠ নির্ণয়ের ভ্রামরী বা ভ্রমরবাসিনী দেবীর সঙ্গেও আছে সামঞ্জস্য গ্রীকদেবী আর্টেমিস এবং পশ্চিম এশিয়ার মাতৃদেবী ননইয়ার। ভ্রামরী, ভ্রমরাম্বা বা ভ্রমরবাসিনীর প্রতীক যেমন মৌমাছি, ভ্রমর, তেমনই এঁদেরও প্রতীক ভ্রমর বা মৌমাছি। এবং একথা তো ঐতিহাসিকেরা দিয়েছেন স্পষ্ট করে যে, প্রাচীন ইরান ও আরবের দক্ষিণ উপকূল এবং ফলতঃ মেসোপোটেমিয়া এবং মিশরের সঙ্গেও প্রাচীন ভারতের ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক, এবং সেইজন্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গেও। এবং আপনারা ভালকরেই জানেন যে, যোগাযোগের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ঘটে একটা সংমিশ্রণ, যার ফলে মিশর, গ্রীস আর রোমের শিল্প ও ধর্ম, নানা ভাবে মিলেমিশে গেছে একাকার হয়ে। গ্রীসের প্রভাবে ভারতের ভাস্কর্যশিল্পও পাল্টেছে উত্তরপশ্চিম ভারতে, এসেছে গন্ধার শিল্প; তারপর ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীকদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভাবের ঘরেও একের প্রভাব পড়েছে অপরের উপর। অত্যন্ত সহজ একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবেন ব্যাপারটা। প্রাচীন ভারতীয় নাটকে যবনিকা বলে ছিলনা কোন ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল গ্রীসে। পদ্ধতিটা ভারতীয় নাট্যকারদের ভাল লাগাতে গ্রহণ করতে করেননি বিলম্ব। যবনদের কাছ থেকে ব্যাপারটা গৃহীত হয়েছিল বলেই নাম হয়েছে যবনিকা।

ইতিহাস যাঁরা সামান্য পড়েছেন, তাঁরাতো জানেন যে, আরবদের মাধ্যমে আমাদের ভাবধারা কি করে গিয়েছিল ইউরোপে, আবার প্রাচীন পশ্চিমের ভাবধারাও এসেছিল আমাদের কাছে। ফলে এটা স্পষ্ট যে, মানুষের পরস্পর মেলামেশার ফলে কখন যেন সকলের অজ্ঞাতেই একের ভাব এসে যায় অপরের মধ্যে, এবং এশিয়া ইউরোপের বিরাট এক অংশে প্রাচীন মাতৃমূর্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখে এটা ধারণা করলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না খুব যে, বাইরের বহু ভাব এসে ঢুকে গেছে আমাদের মধ্যে আর আমাদের ভাবধারাও চলে গেছে বাইরে। এবং সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে কোন সিংহবাহিনী পার্বতী মূর্তির এ-দেশে চলে আসাও অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয় কিছু একটা।

একটা চমকপ্রদ উদাহরণ তুলে ধরছি আপনাদের সামনে, যা দেখলে সত্যিই হয়তো ভাবতে বসে যাবেন আপনারা। যেমন, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের ব্যাইরগো (Virgo) বলে ছিলেন এক দেবী। রীতিমত যুদ্ধবিলাসিনী। ভূমধ্যসাগরীয় এই মানুষদের শত্রু ছিল মন-ক্লের বলে এক জাতি, ভারতীয় আর্যদের কাছে অসুরদের মত আর কি। ভারতীয় আর্যদের কাছে যেমন গরু পবিত্র, মন-ক্লেরদের কাছেও তেমন ছিল মোষ। ভূমধ্যসাগরীয়রা এই দেবীর সাহায্যেই জয় বা মর্দন করেছিলেন মন-ক্লেরদের, এককথায় যাকে বলা যায় মহিষমর্দন। আমাদের দেবী দুর্গাও (দুর্গা আর ব্যাইরগো-এর মধ্যে আছে একটা উচ্চারণগত সাদৃশ্যও) আর্যদের অর্থাৎ দেবতাদের হয়ে নাশ করেছিলেন অসুরদের, বিশেষ করে মহিষাসুরকে মর্দন করে তিনি হয়েছিলেন মহিষাসুরমর্দিনী। কোন্ প্রাচীনকালে কে যে কার সঙ্গে কিভাবে গেছে মিশে বলতে পারে কে! হলপ করে এখন বলবার উপায় নেই যে, ব্যাইরগোই নয় দুর্গা।

আর একটা জিনিষও বোধহয় লক্ষ্য করতে পারি। একটু খেয়াল করুন না, বুঝবেন তাহলেই। মা যখন শক্তিরূপা তখন তাঁকে

আরাধনার জন্য আছে একটা তন্ত্রগত ব্যবস্থা। শক্তিপূজার সঙ্গে, বিশেষ করে কালীপূজার সঙ্গে তন্ত্রের আছে এক ওতপ্রোত সম্পর্ক। এ-কথা সবাই জানেন যে, তন্ত্রাচার চীনাচার। বশিষ্ঠ নাকি মহা-চীন থেকে এনেছিলেন এই তন্ত্রের আচার। তন্ত্রের অঞ্চল যদি খুঁটিয়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন, কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কামরূপ এবং বঙ্গদেশ (বাংলাদেশ+পশ্চিমবঙ্গ)—হিমালয় প্রাঙ্গণের এবং প্রাঙ্গণ-নিকটতস্থ এই অঞ্চলই হল মূলতঃ তান্ত্রিক অঞ্চল। কে জানে, তন্ত্রবর্ণিত চীনদেশ এই অঞ্চলই নাকি! তন্ত্রের কিছু অংশ কাশ্মীরে এবং সামান্য কিছু অংশ ভারতের অন্যত্র রচিত হলেও অধিকাংশের উৎপত্তিই বঙ্গ-কামরূপে। আর এর বহুল প্রচার হল নেপাল ভূটান তিব্বতে।

তন্ত্রের মধ্যে আসনের বা যন্ত্রের মূল্য প্রচণ্ড—মহাবিশ্বের নক্ষত্র সমূহের পরিক্রমণ লক্ষ্য করেই ব্যবস্থা কিনা এই আসনের বা যন্ত্রের জানিনা। হয়তো বা জ্যোতির্বিজ্ঞান আর তন্ত্রাসন বিজ্ঞানে আছে এক বিরাট সম্পর্ক—(যদিও তন্ত্রবিদদের মতে এতেই রয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতিতত্ত্ব। যন্ত্রের ত্রিকোণ হল যোনির প্রতীক এবং তার অভ্যন্তরস্থ বিন্দু হল পুরুষের।) অপর পক্ষে দেহ-বিজ্ঞানেরও এক বিরাট আয়োজন এখানে। তন্ত্রের ষটচক্রের কথা না শুনেছে হেন লোক কম—নিম্নতম মূলাধার চক্র থেকে ভ্রূ-মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্র নিয়ে এই ষটচক্র। দেহের এই বিভিন্ন স্থানের অর্থাৎ ষটচক্রের অধিশ্বরী হয়ে আছেন ছয় দেবী, যেমন, ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী আর হাকিনী। আপনি যদি ভাল সংস্কৃত জানেন, তাহলে হয়তো মাথাকুটে রক্তারক্তি কাণ্ড করবেন শব্দগুলোকে করবার জন্য সংস্কৃতজাত, কিন্তু পাবেন কি যথাযথই? না পারার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ, শব্দগুলো সংস্কৃতজাত নয় সম্ভবতঃ। কিন্তু শব্দগুলির উৎস খুঁজে যদি তাকান একটু অন্যত্র, তাহলে হয়তো পেয়ে যাবেন ভিন্ন ধরনের একটা ইশারাই। যেমন ধরুন, আপনি যদি তিব্বতের দিকে তাকান একটু, তাহলে দেখতে পাবেন যে, 'ডাক' বসে আছে একটা তিব্বতী শব্দ—যার অর্থ জ্ঞানী।

তাহলে, ডাকিনী শব্দটা কি 'ডাকে'রই স্ত্রীলিঙ্গ? অর্থাৎ মেয়েজ্ঞানী? বাঙ্গালীদের যে 'ডাইনী' শব্দ সেটা কি তবে ডাকিনীরই একটা ভিন্ন-ধরনের উচ্চারণ? নাথসাহিত্যবিখ্যাত মধ্যযুগের বঙ্গদেশের রাজা গোপীচাঁদের মা, বিখ্যাত ময়নামতী ছিলেন লোকমতে ডাইনী। অথচ তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ গোরক্ষনাথের শিষ্যা, পরম যোগিনী। যোগবলে জানতে পারলেন, ছেলে যদি না নেয় সন্ন্যাস তাহলে অকালে হারাবে প্রাণ। ফলে তিনি ছেলেকে বললেন, সংসার ছেড়ে নাও সন্ন্যাস। গোপীচাঁদ সন্ন্যাস নিলেন জালন্ধরীপাদ বা হাড়িপার কাছে। যোগবলসম্পন্না মহিলা কেন ডাইনী হবেন, নিশ্চয়ই ময়নামতী ছিলেন মহাজ্ঞানসম্পন্না। ডাইনী বলতে লোকে বোঝাতো হয়তো এই মহাজ্ঞানসম্পন্না ময়নামতীকেই। এবং এ-থেকেই মনে হয়, ডাকিনী বোধহয় নয় খুব দূরের শব্দ।

যদিও ষটচক্রের অন্যান্য দেবীর অর্থ যায়নি খুঁজে পাওয়া, শুধুমাত্র ভূটানে খুঁজে পাওয়া গেছে 'লাকিনী' আর 'হাকিনীর' অস্তিত্ব, তবু মনে হয় ষটচক্রের নানা অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উৎপত্তি এই হিমালয় সংলগ্ন দেশগুলিতেই, অর্থাৎ মহাচীনে। তবে ভারতবর্ষে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির সঙ্গে ডাকিনী শব্দের একটা যোগ আছে। পরিব্রাজক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দল যাঁরা মঠের নিয়মকানুন মেনে স্থির হয়ে বসে থাকতেন না বৌদ্ধ বিহারে, গৌতমবুদ্ধ নিন্দিত তুকতাকে করতেন বিশ্বাস, তাদের মধ্যেই সম্ভবতঃ বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের ধারণা করেছিল জন্মলাভ। আর এই বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম বেড়ে উঠেছিল বাংলা বিহারের পাল রাজাদের অনুকূল্যে। এঁরাই গৌতম বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের শক্তিরূপে কল্পনা করেছিলেন নানা তারা মূর্তির! তা ছাড়া আরও কম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি মূর্তিরও কল্পনা করেছিলেন এঁরা। যেমন, মাতঙ্গী (পতিতা স্ত্রীলোক), পিশাচী, যোগিনী (তুকতাককারিনী নারী), এবং ডাকিনী (মড়া খেকো রমনী) ইত্যাদি। সুতরাং মনে হয় বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্ম থেকেও হতে পারে এঁদের উৎপত্তি। কিম্বা বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের পূর্বেই নিজের অস্তিত্বে এঁরা বিরাজ করতেন

মহাচীনে। এবং তা যদি হয়, অর্থাৎ মহাচীনেই যদি হয় এদের উৎপত্তি তাহলে আজকের ভারতে শক্তিসাধনায় বাইরের যে আছে কিছু অবদান সে কথা মানতেই হবে আমাদের। এবং বিশেষ করে যদি শাক্তসাধনায় হ্রীং, ক্লীং, হৈঁ, ক্রীং এই জাতীয় শব্দের পান সন্ধান, তাহলে বোধহয় চোখ বুজেই প্রায় বলে দিতে পারেন যে, আর্য সংস্কৃতজাত এরা নয় কোনমতেই। (কেউ কেউ অবশ্য সংস্কৃতজাত করে একে দেখাবার চেষ্টা করেছেন ব্যাখ্যা করে, যেমন কামনা (ক) প্রাণাগ্নি শক্তির (র) সঙ্গে যুক্ত হয়ে করেছে যে অগ্রগতি (ঈ) তাই সৃষ্টি করেছে ক্রীং, বা কামনা (ক) স্থূলত্বে (ল) পরিণত হয়ে করেছে যে অগ্রগতি (ঈ) তাই সৃষ্টি করেছে ক্লীং ইত্যাদি। মহেন-জো-দড়োর লিপি ও সভ্যতা—শ্রীরাজমোহন নাথ বি-ই তত্ত্বভূষণ পৃঃ ২৭।) এবং শক্তিসাধনায় তান্ত্রাচার আর মন্ত্র যদি বিদেশ থেকে পারে আসতে, তাহলে মূর্তিও যে আসতে পারে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায়না কখনও। এবং আরও বলা যায়না যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিশিষ্টরূপে মহিমময়ী মা বিশ্বমায়ের রূপধরে অনার্যদেরই পূজা লাভ করেছিলেন প্রথম, তার পর আর্যজগতে প্রবেশ করে নিজের মহিমা প্রকাশ করেছেন আর্য-মানুষের ভাবধারায়। অর্থাৎ স্থূল প্রজনন-ক্ষেত্রের প্রতীক মাতা, সূক্ষ্ম হয়েছেন শক্তিরূপে। এবং যেহেতু আদি প্রজনন-ক্ষেত্রের প্রতীক মাতাকে অন্য কোন জাতি পারেনি অধ্যাত্মতায় করতে উন্নত, সেই কারণেই স্থূল মাতার অবলোপ ঘটেছে সেখানে; এবং শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই তিনি এখনও বেঁচে আছেন অমৃত সঞ্জীবনী লাভ করে।

তবুও কিন্তু থেকে যায় একটা প্রশ্ন: আজকের যে ৺মা, ভারতে, স্থূল প্রজনন ক্ষেত্রের প্রতীক হিসেবে মূলতঃ তাঁর উৎপত্তি হলেও তাঁকে সূক্ষ্ম শক্তির মাহাত্ম্য দান করেছে কে? আর্যরা না অনার্যরা?

আর্যদের মাতৃকল্পনার কথা সবে শুরু করেছি আমরা, অর্থাৎ মাতা পৃথিবী ও দ্যৌকে নিয়ে। এবং সম্ভবতঃ এই মাতা পৃথিবীই আর্য দেবী-চিন্তাতে নিউক্লিয়স হিসাবে কাজ করেছেন অন্যত্র, সর্বত্র। এই মাতৃদেবীই যে কখনও লক্ষ্মীর আকারে, কখনও বা জগদ্ধাত্রীর রূপে

(কালিকা পুরাণের মতে পৃথিবী জনক রাজাকে জগদ্ধাত্রী রূপে দেখা দিয়েছিলেন।) কখনও মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর আকারে পৃথিবীর প্রতীক হিসাবে প্রকাশিতা নন, তা নয়; অন্নদা অন্নপূর্ণাও মাতা পৃথিবীরই এক রূপান্তর। এই পৃথিবীদেবীই শেষপর্যন্ত শক্তিরূপা মহাদেবী শ্রীদুর্গা। ৺মায়ের চূড়ান্ত পরিণতি ৺দুর্গাতে, একথা বুঝি স্পষ্ট করেই বলা যায়—যদিও আরও অনেক আর্য মাতৃদেবীর কথাই আছে শাস্ত্রগ্রন্থে, যেমন, সাবিত্রী, অদিতি, সরস্বতী (সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কখনও সিংহবাহনা) রাত্রি, উষা, ইত্যাদি। কিন্তু তাঁরা কেউ ৺দুর্গার মত লাভ করতে পারেননি একচ্ছত্র মহিমা। অবশ্য এই ৺দুর্গাও যে সম্পূর্ণ স্থূলতামুক্ত তা নয়—যদিও আদ্যাশক্তিরূপে আধ্যাত্মতায় তিনি উদ্ভাসিতা। যেমন ধরুন না, চণ্ডীতে দেবীর উৎপত্তি দেবতেজ থেকে হলেও—পৃথিবীমাতার স্থূলতা তিনি সম্পূর্ণভাবে কাটাতে পেরেছেন, তা নয়। প্রমাণস্বরূপ শরৎকালে দেবীর আবাহনে বোধনের কথাই করুন না চিন্তা। বোধনের সময় দেবীর প্রতীক—মূর্তি নয়, বিল্বশাখা। এর পরেই স্নান এবং নবপত্রিকায় পূজা।

নবপত্রিকা কি, যে-কোন বাঙ্গালীই তা জানেন। একটা কলাগাছের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য। এসব মিলিয়ে যা তৈরী হয়—প্রকৃতপক্ষে তা হল একটি শস্যবধূ; আর এই শস্যবধূই হল নবপত্রিকা। আর এই শস্যকেই দেবীর প্রতীক ধরে প্রথমে দিতে হয় পূজা। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে শস্যদেবীরই অর্থাৎ পৃথিবী দেবীরই অর্থাৎ মায়ের প্রজনন ক্ষেত্রেরই পূজা হয় দুর্গামূর্তিতে। এককথায় যাকে বলা যায় আদিম ফার্টিলিটি কাল্ট। এবং সেইজন্যই বলছিলাম কথাটা যে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম আদিম ধরিত্রী মাতা (উর্বরা শক্তির প্রতীক) ভারতবর্ষে বেঁচে থাকলেও ৺দুর্গারূপে তাঁর পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যেও সম্পূর্ণ স্থূলতামুক্ত নন তিনি। অথচ জগৎকারণশক্তিরূপে পুরাণের গল্পে তিনি স্থূলাপ্রকৃতির ঊর্ধে—আদ্যাশক্তি ব্রহ্মস্বরূপা। অর্থাৎ আদিম মানুষের মাতৃ-

কল্পনা যখন আর্য-বেদী অধিকার করে অধ্যাত্মতায় উজ্জ্বল, তখনও তিনি স্থূল থেকে বিচ্ছিন্ন নন সম্পূর্ণ।

স্থূলতা যেটুক্ থেকে গেছে তা কি অনার্যদের? এবং সূক্ষ্মতা আর্যদের? কিংবা স্থূল এবং সূক্ষ্ম দুইই অনার্যদের, আর্যদের নয় কিছুই? ৺মা যথার্থই বিশ্বমাতা? জগতের সমস্ত মানুষের কল্পনাকে একাঙ্গীভূত করে ভারতবর্ষে বিরাজ করছেন সেই অনার্য-যুগ থেকে? অনার্যরাই তাঁকে স্থাপন করেছিল স্থূলরূপে আবার তারাই তাঁকে স্থাপন করেছে সূক্ষ্মে? আর্যরা তাঁকে গ্রহণ করে নিয়েছে এই যা?

অনেকের কাছেই মনে হতে পারে, মন্তব্যটা বড় উদ্ধত। যে আর্যরা উপনিষদের স্রষ্টা, তাদের চাইতে বড় অধ্যাত্ম-কল্পনা আর করতে পেরেছে কোন্ মানুষ? যদি সে-রকম কেউ ভেবে থাকেন তাহলে একটু ভেবে দেখাই দরকার। আর্যদের অধ্যাত্ম-কল্পনার শুরু হল ঋগ্বেদে, যদিও তার ব্যাপকতা নেই অথর্ববেদের আগে। অথচ অথর্ববেদকে একসময় অনার্য-ভাবধারাপুষ্ট বলে বেদ হিসেবে স্বীকার করেননি অনেকে। এই যে দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী, এসব টাইটেলতো এ-জন্যেই, অর্থাৎ কেউ দুই বেদ মানেন, কেউ তিন বেদ (যেমন—ঋক্, সাম, যজুঃ) কেউ বা মানেন চারটিই। অথর্ববেদে যেমন আছে তুক্‌তাক ফুস্‌মন্তর, তেমনই আছে দার্শনিকতার ছড়াছড়ি। এবং শেষপর্যন্ত অথর্ববেদের মূল্য যখন ধরা পড়ে, তখন যজ্ঞক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হন তিনিই, যিনি চতুর্বেদে সুপণ্ডিত। তাহলে অনার্য-ভাবধারাতে যে ছিল উন্নত কল্পনা এটাই কি স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে না পরোক্ষে? বস্তুতঃ অথর্ববেদের আগে, এমন কতকগুলি অভাব ছিল বেদে যে, যার ফলে অধ্যাত্মতার চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছানো ছিল অসম্ভব।

শুধুমাত্র চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা হয় না, যদি না যোগের দ্বারা সাযুজ্য লাভ করা যায় ব্রহ্মের। কিন্তু এই যোগ সম্পর্কে ধারণা ছিল কিনা অথর্ববেদের আগে, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে যথেষ্ট। অথচ যোগ যে মহেন-জো-দড়োর মানুষের কাছে ছিল খুবই পরিচিত, সে-

বিষয়ে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র। সিন্ধুউপত্যকার যে-সব সীলমোহর-মূর্তি, তার মধ্যে অনেকগুলিতেই আছে যোগাসনে উপবিষ্ট মানুষের বা দেবতাব ছবি। উদাহরণস্বরূপ আর্ট প্লেট দেখুন দুটো চিত্র, পশুপতির মূর্তি এবং মস্তকহীন যোগাসনে বসা মানুষ, বুঝবেন তাহলেই।

যোগ আর্যরা লাভ করেছে অনার্যদের কাছ থেকেই। এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও এমনতরই ধারণা। বিশেষ এক পণ্ডিত ব্যক্তির মন্তব্যর কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি এ-ব্যাপারে আপনাদের প্রত্যয় আনবার জন্য, কারণ, প্রমাণ ছাড়া আমার মতো অর্বাচীনের কথার কোন মূল্য কি? Indo-Aryan and Hindi বলে একটি মূল্যবান পুস্তকের লেখক S. K. Chatterjee, এ বিষয়ে বিপুল সাধনার পর এসে পৌঁছেছেন যে সিদ্ধান্তে তার মূল বক্তব্য এই যে, ভারতের অনার্যরা হীনজাত তো ছিলইনা, বরং চিন্তার দিক থেকে উন্নত ছিল এত যে, আর্যরাও তাদের কাছ থেকে ধার করতে বাধ্য হয়েছিলেন অনেক জিনিষ; যেমন ধরুন, কর্ম সম্পর্কে ও জন্মান্তর সম্পর্কে ধারণা। শিব, দেবী বা বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে যে আধ্যাত্মিক চিন্তা, সেটাও হল অনার্যদেরই অবদান। এবং বৈদিক আর্যদের হোমের বদলে ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে বর্তমান এই যে পূজার ব্যবস্থা, সেটাও অনার্যদেরই উত্তরাধিকার। পুরাণ বা মহাকাব্যের অনেক গল্পকাহিনীই পাওয়া অনার্যদের কাছ থেকে। আবার ভারতীয় বস্তুজাগতিক আর সামাজিক আচার ব্যবহারেরও অনেক কিছু অনার্যদের কাছ থেকেই লাভ করা। যেমন ধরুন, ধান চাষ, নানা ধরণের শাকশব্জির ফলন এবং তেঁতুল, নারকেল ইত্যাদি; পানের ব্যবহার, লৌকিক ধর্মাচার, অধিকাংশ লোক-শিল্প, ধূতিশাড়ির প্রচলন, এমন কি বিবাহে সিঁদুর এবং হরিদ্রার ব্যবহার। এবং এরকম আরো নানা কিছুই হল অনার্যদেরই অবদান। এই যে আজ রান্নার স্বাদ বর্ধন করছে রসুন, রসনা তৃপ্ত করছে বেগুন, গ্রীষ্মের তরকারী হয়ে দেখা দিচ্ছে চালকুমড়ো, চিংড়ি মাছের স্বাদ বাড়াচ্ছে নারকেল, এবং ভোজন শেষে তাম্বুলরাগে ওষ্ঠ করছি রঞ্জন, এ-সবের কোনটাই আর্যরা নিয়ে আসেননি সঙ্গে করে, আমাদের

দিয়েছেন অনার্যরাই। এই যে পূজা করি তিথি নক্ষত্র দেখে, বিশেষ করে তিথি; এই তিথি সম্পর্কিত ধারণাটিও অনার্যদের। পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা, তিথি হল Austric in origin। প্রকাশিত দেবতাদের ভেদ করে, বস্তুগ্রাহ্য দুনিয়ার ঊর্ধে ব্রহ্মস্বরূপের যে কল্পনা এবং এই ব্রহ্ম থেকে ব্যাখ্যার অতীত এক ইচ্ছার আবেগে যে বিশ্বসৃষ্টি, সেটাও আর্যপূর্ব ভারতীয়দের—অন্ততঃ ভারতকৌমুদী নামক গ্রন্থের (প্রথম খণ্ড) ২০৬ পৃষ্ঠা দেখলেই বুঝবেন। একথার প্রমাণ পাবেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের Ancient India গ্রন্থেও। সুতরাং আদি স্থূলা আরাধ্যা জননী, ৺মা, যিনি নাকি পৃথিবীর বহুদেশে, বহুলোকের কাছে আদিমকালে ছিলেন একমাত্র পূজিতা, সংস্কৃতিসমন্বয়ে নানাক্ষেত্রেই যিনি মিলে মিশে হয়ে গেছেন একাকার, শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটীতে এসে আশ্চর্যরূপে আশ্রয় নিয়ে আছেন এখানে। তাঁকে স্থূল-সূক্ষ্মে মিলিয়ে শাশ্বত বেদীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন শুধুমাত্র আর্যরাই, একথা বলে অনার্যদের দূরে ঠেলে দেওয়া অসম্ভব। বরং এই ৺মা, স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের মাটিতে যিনি সম্ভূতা—আর্যরা তাঁকে তৈরী করেননি, করেছেন গ্রহণ মাত্র। আর্যদের স্বতন্ত্র মাতৃকল্পনা অনার্যদের মাতৃকল্পনার সঙ্গে মিশে, তথা সকল আদিম মানুষের মাতৃকল্পনার সঙ্গে মিশে গিয়ে এদেশে তৈরী করেছে স্বতন্ত্র এক লোকোত্তর মহিমা। এবং সেই ৺মা ভারতীয় মৃত্তিকার এক অপরূপ বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে বিচিত্রকে করেছেন এক এবং এককে করেছেন বহুরূপে সম্প্রসারিতা। সেই একীকরণ এবং সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে একান্নপীঠকে কেন্দ্র করে, এবং সেই একান্নপীঠের পটভূমিকায় আসবার জন্যই এতক্ষণ আমার এত ভনিতা, আপনাদের ক্লান্তি, এবং লেখকের এত পাণ্ডিত্যের অভিনয়। সুতরাং মুখবন্ধ শেষ করে সেই কাহিনীতেই আসার চেষ্টা করছি এতক্ষণে, যা নিয়ে আমার এই বর্তমান পুস্তকের নামকরণ। আসুন, অলোচনার সেই দ্বিতীয় পর্যায়েই আসা যাক এইবারে।

॥ দুই ॥

একীকরণের সহজাত ক্ষমতাটি কার? আর্যদের না অনার্যদের? আমাদের এই উপমহাদেশটিকে বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে একসূত্রে বেঁধে দেবার ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন কারা? আর্যরা না অনার্যরা? সম্ভবতঃ সঙ্গে সঙ্গে এর জবাবে যে শব্দটি আমাদের মনে আসবে—তা হল 'আর্য'। আর্যরাই এটা করেছিলেন। তা যদি না হয়, তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষ কোন এক আর্য মহাপুরুষের নামেই বা পরিচিত হবে কেন? আর্য পুরুষ ভরতের নাম থেকেই যে ভারতবর্ষ, তা নিশ্চয়ই জানেন সকলেই। বর্ষ মানে মণ্ডল, একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল। এই উপমহাদেশে ভরতের যা মণ্ডল বা বর্ষ, তাই হল ভরতের বর্ষ বা ভারতবর্ষ।

তবে, ইতিহাসে অন্ততঃ এমন কোন সাক্ষ্য নেই যা দ্বারা প্রমাণ মেলে সেই বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে ভরত নামে কোন রাজা ছিলেন এত পরাক্রমশালী যে, এই বিরাট উপমহাদেশের সবটাই জয় করে এনেছিলেন নিজের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে, এবং নানা বর্ষ গঠন করে সমগ্র উপমহাদেশটার নাম দিয়েছিলেন ভারতবর্ষ। বিষ্ণুপুরাণে এই বিরাট উপমহাদেশের যে পরিমাপ, তা হল এই রকম—'সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমাবৃত পর্বতের দক্ষিণে যে দেশ, তাকেই বলা হয় ভারত। সেখানে বাস করেন ভরত বংশধরেরা। তবে সত্য সত্যই এই বিরাট অঞ্চল বাহুবলে ভরত রাজা জয় করেছিলেন বলে বিশ্বাস কম। তবুও এই সমগ্র উপমহাদেশ ভরত রাজার নামেই বা কেন হল পরিচিত?

পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন,—রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নয়, আর্যদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্যই উপমহাদেশকে আচ্ছন্ন করেছিল বলে মানসিক দিক থেকে সকলে অর্থাৎ আর্যপ্রভাব বহির্ভূত মানুষও মেনে নিয়েছিলেন ভরতের প্রাধান্য অর্থাৎ আর্য-সংস্কৃতির অধীনতা। সেই জন্যই সারা দেশের নাম ভারতবর্ষ।

রক্ত ঝরিয়ে, ভয় দেখিয়ে, একচ্ছত্র শাসনের অধীনে আনা যায় বটে লোককে, কিন্তু ঐক্যের জন্য যে একাত্মতা, তা যায় না সম্পাদন করা। বড় বড় সাম্রাজ্য যদি ভেঙ্গে যায়,—ভেঙ্গে গেলে একাত্মবোধ থাকেনা আর কিছুই। একদা বিরাট অঞ্চল জুড়ে যে রোমক সাম্রাজ্য, ভেঙ্গে যাবার পর পরাধীন অঞ্চলের লোকেরা নিশ্চয়ই আর নিজেদের পরিচয় দেয়নি রোমক বলে? তখন যার যার আঞ্চলিক নামে, স্বজাতির নামে পরিচয়। কিন্তু এই ভারতবর্ষে দেখুন--কতবার কত বড় সাম্রাজ্য উঠেছে গড়ে, কতবার ভেঙ্গে আবার দেশ গেছে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে, রাজা এসেছেন, রাজা গেছেন—রাজনীতির হয়েছে উত্থান পতন অনেক, কিন্তু ভারতবর্ষ হিসেবে যে-দেশ, সে-দেশ আছে তেমনই। ভারতবাসী নামে যে মানুষের পরিচয় তাও রয়েছে সেই রকম। অবশ্য শেষপর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসের সব চাইতে বড় এক বর্বর জাতি—ইংরেজরা করে গেছে অসম্ভবকে সম্ভব। ভারত আত্মার ঠিক মর্মে আঘাত করে তার ঐক্যকে করে দিয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন। ভারত হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান এবং শেষপর্যন্ত ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। হূণেরা যা পারেনি, মুসলমানেরা যা পারেনি, ইংরেজরা করেছে তা-ই। কিন্তু ইংরেজরা এ দেশ ছেড়ে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণের যে শক্তি ভারতকে রেখেছিল ঐক্যবদ্ধ, আর্যদের সাংস্কৃতিক শক্তির উৎস হল সেটাই।

কি ভাবে আর্যরা এই সাংস্কৃতিক শক্তির অক্‌টোপাশে বেঁধেছিলেন সমগ্র দেশকে তাই একটু দেখা যাক। এই একসূত্রে বেঁধে দেবার প্রথম প্রয়াসই হল মানবতা। দেশটাকে জয় করে, দেশের আদিম অধিবাসীদের সমূলে উৎখাৎ না করে (ইংরেজরা যেমন আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়াতে করেছে) নিজেদের সভ্যতার অঙ্গীভূত করে নেবার চেষ্টা চালিয়েছিল প্রথম। সেই জন্য উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির অহংকারে নিকৃষ্ট সংস্কৃতির অধিকারীদের (অবশ্য আর্য-পূর্ব ভারতের অধিবাসীরা যে নিকৃষ্ট সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন না, সে কথা বলেছি আগেই।) দূরে না রেখে, নিজের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করবার চেষ্টা করেছিলেন প্রথমেই।

যেমন, অনার্যদের মধ্য থেকে অনেক কিছুকেই নিয়েছিলেন গ্রহণ করে, জাগিয়েছিলেন আর্য-সংস্কৃতির প্রতি অনার্যদের একাত্মতা। চতুর্বর্ণ বিন্যাসে মানুষকে ভাগ করে অনার্যদেরও ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন সমাজে। তারপর ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে সারা দেশকে একসূত্রে বেঁধে দেবার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন অভিনব উদ্ভাবনী শক্তির। যেমন, সমগ্রদেশ যে এক, একথা প্রমাণ করবার জন্য সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপন করেছিলেন নানা তীর্থ। ধর্ম-জীবনের সার্থকতা এই সারাদেশ পরিভ্রমণ করলে, জাগিয়েছিলেন এই বোধ। বৈষ্ণব হলেও সারা দেশে ছড়িয়ে আছে তার তীর্থক্ষেত্র, শৈব হলেও, শাক্ত হলেও। এমন কি জৈন আর বৌদ্ধ হলেও। শুধু তাই নয়, সারা দেশটাতেই একটা দেবত্ব আরোপ করে তাকে প্রাণচঞ্চলা এক শক্তিতে পরিণত করেছিলেন সকলেই, যাতে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করতে না পারেন কেউই। সেই জন্য পর্বত এখানে পর্বত নয়, নদী নয় নদী বা মৃত্তিকা নয় মৃত্তিকা। পর্বত হল দেবতা গিরিরাজ, নদী মা-গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা; মৃত্তিকা মা। ক্ষেত্রে আছে ক্ষেত্রদেবতা। সকলকে নিয়েই ভারতবর্ষ, বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না, সকলকেই দিতে হবে প্রাণের পূজো। সেই জন্যই সমগ্র দেশকে জননী কল্পনায় হয়েছিল বলা, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।'

গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, এবং কাবেরীর নাম উচ্চারণ করে, পূজোর জন্য তৈরী করে নিতে হত পরিশুদ্ধ বারি। কোন বিচ্ছিন্নতা দিয়ে হবেনা, হবেনা একাকীত্বেও, চলবেনা আঞ্চলিকতা দিয়েও, সমগ্রকে ধ্যানরূপে সামনে রেখে তবেই অধ্যাত্ম-সাধনা ভারতবর্ষের। শিবের সাধনা করে যিনি মুক্তি খুঁজবেন—তাঁকে অবশ্যই ঘুরতে হবে ভারতের সকল শৈবতীর্থে। তা না হলে নিত্য স্মরণ করতেই হবে শৈব মহাতীর্থগুলোকে যেমন—সোমনাথ, শ্রীশৈল, মল্লিকার্জুন, ও উজ্জায়নী; অমরেশ্বর, কেদার, ডাকিনী, ও বারানসী এবং গৌমতি, চিতাভূমি, দ্বারকা, সেতুবন্ধ ও শিবালয়। যিনি

বৈষ্ণব—তাঁর চিত্তে কোন পরিতৃপ্তিই নেই যদি না ঘুরতে পারেন মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, পুরী ইত্যাদি। শাক্ত যিনি তাঁকেও ঘুরতে হবে প্রায় সমগ্র ভারত, যেকথা বলছি পরে। এমন কি বৌদ্ধ ও জৈনদেরও হবে ঘুরতে। বৌদ্ধ ও জৈন স্তম্ভগুলি এই জন্যই ছড়িয়ে আছে দিল্লী, ত্রিহুত, সঙ্কিশ, সাঁচী প্রভৃতি স্থানে; চৈত্য এবং বিহার রয়েছে বিহারে, নাসিকে, অজন্তা-ইল্লোরাতে ও কার্লেতে, রয়েছে কানহেরিতে, ভাজ-এ, বেদস-এ ও পমনার-এ, রয়েছে উদয়গিরি ও বঘ-এ; স্তূপ রয়েছে মানিক্যে, সারনাথে, সাঁচীতে ও অমরাবতীতে; তোরণ রয়েছে ভারহুত, মথুরা, গয়া, সাঁচী ও অমরাবতীতে; অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার রয়েছে গন্ধারে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে কেউ যদি করতে চায় ধর্মকর্ম, চলবেনা তাকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে। সমগ্রকে ধারণার মধ্যে এনে, তবেই হবে এগুতে। এবং সেই জন্যই শৈবধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম রয়েছে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত; বৈষ্ণবপ্রধান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় কালীপুজো করতে নিজের হাতে; রাসলীলায় প্রবেশ করেন মহাদেব। বুদ্ধকে একটা ভিন্ন ধর্মের প্রধান করে না রেখে, অবতার হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে দশাবতারে।

আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার পরই বিচিত্রকে একের মধ্যে মিলিয়ে দেবার প্রয়াস হয়েছে স্পষ্ট। সেইজন্যই প্রায় নিশ্চিতরূপে যায় ধারণা জন্মে যে, আর্যরাই হল মিলনের এই অগ্রদূত। কিন্তু, যদি চিন্তা করেন একটু গভীর ভাবে, তাহলে হয়তো ভাবনাটাকে এবার ভিন্ন পথেই দিতে হবে ঘুরিয়ে। যেমন ধরুন না, জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন ইদানীং কালে: Indias' script and architecture and the caste system are also Pre-Aryan (Pre-Ariyan and Pre-Dravidian In India. Ed. by P. C. Bagchi) অর্থাৎ ভারতের বর্ণমালা, স্থাপত্য ও বর্ণব্যবস্থা—সবই হল আর্যপূর্ব। অর্থাৎ এ-সব কিছুই করেননি আর্যরা। তা যদি হয় তাহলে আবার নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের। যেমন ধরুন না, বর্ণ-ব্যবস্থাটা খারাপ যেমন, তেমনই আবার কল্যাণকরও। বর্ণ-ব্যবস্থা

না থাকলে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাতে আর্য অনার্যের স্থান হত না একত্রে। দুটো বিপরীত জাতের মধ্যে খুনোখুনীই হত পরিণতি। সেটা থেকে ভারতবাসীকে বর্ণ-ব্যবস্থাই দিয়েছে বাঁচিয়ে। আর বর্ণ-ব্যবস্থা যদি হয় অনার্য তাহলে অনার্যরাই দিয়েছিল বিপরীতকে মিলিয়ে দেবার পথের ইঙ্গিত। আশ্রম ব্যবস্থাটাও যে আর্য-পূর্ব তারও প্রমাণ এই যে, আর্য সমাজে চতুর্থ আশ্রমের স্থান হয়েছে পরে। বৈদিক যুগের আগেই একদল লোক ছিলেন ভারতীয় সমাজে যাঁরা কৃচ্ছ্রসাধন করে হয়েছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন তাঁরা। কারণ তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ Proto Type ছিলেন মহাদেব, যিনি হিমালয় শিখরে বসে সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন তপস্যায়। এদের প্রভাব শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করা যায়নি বলেই সন্ন্যাস নামে চতুর্থ আশ্রমের সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিলেন আর্য সমাজ-প্রধানেরা। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে A L Basham-এর The Wonder that was India গ্রন্থের ২৪৮ নং পৃষ্ঠাতে। এবং এ যদি সত্য হয়, তাহলে সব কিছুকেই ভাবতে হবে নতুন করে।

যেমন ধরুন, ঋগ্বেদে সমগ্র ভারতকে এক করে ভাববার যদিও আছে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, তা ব্যাপক আকারে প্রকাশিত অথর্ববেদে। যেমন, অথর্ববেদের পৃথ্বী সূক্তে ৬৩টি স্তোত্র আছে মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে ; এবং এতেই মাতৃভূমিকে দেবীরূপে কল্পনা করে তাতে একাত্মতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বেশী করে। এবং অথর্ববেদেই আছে এমন ধরনের প্রার্থনা যা আমাদের দেয় চমকে। যেমন, অথর্ববেদেই মাতৃভূমির কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে এই ভাবে,

'আমাদের কেউ যেন না ঘৃণা করে,
যে আমাদের ঘৃণা করবে, আমাদের সঙ্গে করবে যুদ্ধ,
ঈর্ষা করবে আমাদের, করবে আক্রমণ,
তাকে বশীভূত কর আমাদের।

লক্ষ্য করে দেখবেন, এতে ঈর্ষা বিদ্বেষ অসূয়ার নেই তেমন স্পর্শ। আছে আত্মরক্ষার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা। এবং অপরের

চিত্তবৃত্তি পরিবর্তনের জন্যও ৺মায়ের কাছে আছে আবেদন, যেমন, 'আমাদের কেউ যেন না ঘৃণা করে।'

এখন প্রশ্ন হল, এই যে সুর, এ-সুর আর্যদের, না অনার্যদের? হিংসার ঊর্ধে আর্যরা যে তাঁদের জীবনের প্রথম পর্যায়ে ছিলনা তার প্রমাণ আছে বেদেতেই। বৈদিক স্তোত্রে ইন্দ্রের প্রতি প্রার্থনাতেই আছে হিংসার মনোবৃত্তি সপ্রকাশ। এবং এই যে আর্য-দেবতা (সম্ভবতঃ কোন আর্য-প্রধান) অসুরদের ধ্বংস করেছিলেন বলেই হয়েছেন পুরন্দর। অপর পক্ষে মহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষে আজ পর্যন্ত যে সব পাওয়া গেছে ধর্মায় নিদর্শন, শিল্পের নিদর্শন, সংস্কৃতির নিদর্শন, তত পাওয়া যায়নি যুদ্ধাস্ত্রের, বিশেষ করে মারাত্মক কোন যুদ্ধাস্ত্রের মেলেইনি তো সন্ধান, বরং পাওয়া গেছে অস্ত্রে আহত কিছু নরকঙ্কাল। এ-কথা জানেন আপনারা সবাই যে মহেন-জো-দড়োতে ছিল নগরসভ্যতা। আর এই সভ্যতা হয়েছিল ধ্বংসও। আর্যরা ঘৃণা করতেন শিশ্নদেবকে, অর্থাৎ লিঙ্গপূজারীকে। মহেন-জো-দড়োর লোকেরা যে যোনি ও লিঙ্গ পূজা করত তার প্রমাণ দিয়েছি আমরা পূর্বেতেই। তাহলে আর্য-শত্রু, নগরবাসী এই মহেন-জো-দড়োর বা হরপ্পার সভ্যতাকে ধ্বংস করেই কি ইন্দ্র হয়েছিলেন পুরন্দর?

আরও একটু ভাবুন, অথর্ববেদে অনার্য প্রভাব বেশী বলে একদা রক্ষণশীল আর্যদের কাছে এই চতুর্থ বেদ ছিল একান্তই ঘৃণার। তা যদি হয় তাহলে কি অথর্ববেদে অনার্য চিন্তাধারারই প্রাধান্য? এবং সেই জন্যেই কি উপরোক্ত মন্ত্রে হিংসা বিদ্বেষের এত অভাব? তা যদি হয়, অর্থাৎ অথর্ববেদে অনার্য প্রভাবই বেশী, আর অথর্ববেদেই যদি সমন্বয়ের সুর থাকে বেশী করে—, তাহলে ভাবতে হবে যে, একীকরণের মন্ত্র অনার্যদেরই, আর্যরা তা গ্রহণ করেছিল মাত্র, অন্য কিছু নয়। বোধহয় এ-কথাটার আরও বেশী প্রমাণ পাওয়া যাবে সমগ্র দেশকে যে-সব ধর্মের মাধ্যমে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দেবার চলেছিল চেষ্টা, সেই ধর্মগুলো সম্পর্কে আরও একটু বেশী রকম চিন্তা করলে।

ঋগ্বেদে রুদ্র থাকলেও শৈব ধর্মের যে-শিব আজ আমাদের কাছে

পরিচিত, সেই শিব তিনি নন। আর তাছাড়া ঋগ্বেদের রুদ্রও যে আর্য সংস্কৃতিতে স্বয়ম্ভু অর্থাৎ বাইরের প্রভাব বহির্ভূত, তা নয়। মূলতঃ ঋগ্বেদের রুদ্র হলেন গাছ গাছড়া ও জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে যুক্ত। প্রাক্-আর্য-ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় এর অনেক আগেই পাওয়া গেছে পশুপতির চিত্র। যিনি Lord of Beasts বা পশুপতি হিসেবে পশুকুল দ্বারা পরিবৃত। এবং বৃক্ষ নিম্নে তার যোগাসন থেকে প্রমাণ যে, গাছ গাছড়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত নন তিনিও। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সিন্ধু উপত্যকার পশুপতি হলেন ঋগ্বৈদিক রুদ্রের Proto type. ফলে সেই রুদ্রই যদি শিব হয়ে থাকেন তবুও মূলতঃ তিনি অনার্যই। অথচ এই শিবের নানা প্রতিষ্ঠানই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থেকে একাত্মবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করেছে আমাদের। পণ্ডিত ব্যক্তিদের অভিমত—বিষ্ণুর উৎপত্তিও অনার্য ভারতেই প্রথম, যেমন—S. K Chatterjee তাঁর Indo-Aryan and Hindi—আলোচনাতে বলেছেন—"The ideas of karma and transmigration, the practice of yoga, the religious and philosophical ideas centering round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Visnu······appear to be non-Aryan in origin." অর্থাৎ কর্মফলের ধারণা, জন্মান্তর ও যোগাভ্যাস; শিব, দেবী ও বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় ও দার্শনিক যে চিন্তা, মূলতঃ তার সবই হল অনার্য। তাহলে দেখুন, বৈষ্ণবদের কেন্দ্র করে যে ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা তার উৎপত্তিও অনার্যভারতের মাটিতেই। আবার মাতৃরূপা দেবী এবং শিব-শক্তিকে কেন্দ্র করে যে ঐক্যের জন্য ব্যবস্থা, তার উৎপত্তিও যে আর্যরা আসবার আগেই সে বিষয়ে সাধারণ মানুষেরও প্রায় বিশ্বাসের নেই অভাব। আর বৌদ্ধ ও জৈনদের কথা যদি বলতে চান, তাহলে আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে, এই ধর্মের মূল কেন্দ্রই ছিল সিন্ধুনদের উপত্যকা। প্রমাণের আলোচনায় যাবার নেই দরকার। কয়েকটি উদাহরণ মাত্র তুলে দিচ্ছি, তাতেই হবে যথেষ্ট। আর্টপ্লেটে দেখুন

পশুপতি, ভগবান বুদ্ধ আর সাঁচী-স্তূপের উত্তর তোরণশীর্ষ, বুঝবেন তাহলেই।

প্রথম ছবি পাওয়া মহেন-জো-দড়োতে, Terra cotta seal-এ। দেখে নিশ্চয়ই বুঝছেন যে, দেবতাটেবতা হবে কোন? কিন্তু সে-সব নয় আমার আলোচনার বিষয়। শুধু লক্ষ্য করে দেখুন, মূর্তিটির বসার ভঙ্গী কেমন, এবং মাথার উপর দেখুন কিছু গাছের পাতা। পাশেই দেখুন দ্বিতীয় মূর্তি, বুদ্ধের। প্রথম মূর্তির সঙ্গে দেখুন বুদ্ধ মূর্তির বসার ভঙ্গীর সামঞ্জস্য, দেখবেন, প্রায় এক। যে বোধিবৃক্ষের নিচে বসে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ তার নাম পিপল বা অশ্বত্থ। মহেন-জো-দড়োর মহাযোগীর মাথার উপরে দেখুন গাছের পাতা, দেখবেন প্রায় এক। বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্নের প্রতীক হল সাঁচীস্তূপের উত্তর তোরণশীর্ষ—যা দেখছেন আর্টপ্লেটে। ঠিক একই জিনিষ কি দেখতে পাচ্ছেন না মহেন-জো-দড়োর মহাযোগীর শিরস্ত্রাণে? প্রাচীনকালে বৌদ্ধ স্তূপগুলিতে অবধারিত রূপে স্থান পেত এক ধরণের স্তম্ভ (Column) সম্ভবতঃ সিন্ধু উপত্যকার লিঙ্গের প্রতীক। নইলে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্কই নেই এই স্তম্ভের। A. L. Basham-এর The Wonder that was India-র ২৬৫ পৃষ্ঠাতে আছে এ সম্পর্কিত বর্ণনা। এ বর্ণনা থেকে প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে পরবর্তী বৌদ্ধদের পাওয়া যায় পরোক্ষ একটা সাদৃশ্য। আরও আছে অনেক সামঞ্জস্য। সে-সব কথা বাদ দিন। বৌদ্ধেরা অহিংস, চোখ বুজেও বলে দিতে পারেন একথা। এবং মহেন-জো-দড়োর লোকেরাও যে হিংসার সাধনা করত না খুব, সে-কথা বলেছি আগেই। এবং বৈদিক প্রতিক্রিয়াশীল আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধেই যে প্রতিবাদ করে সাধারণ মানুষকে (অধিকাংশই সমাজের নিম্নস্তরের লোক) মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ, একথা না জানে কে। এবং এই সাধারণ মানুষের অধিকাংশই ছিল অনার্য—যদিও তখন হিন্দু-সমাজভুক্ত। সে-কারণেই বিহার এবং বাংলাদেশে (বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে) বৌদ্ধধর্মের একসময় ছিল এত

প্রভাব, আজও রূপান্তরে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে যার অধিকাংশই আছে টিকে। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যে অনার্যদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা এতটুকু।

তাহলে যে-সমস্ত ধর্ম সমন্বয়সাধনে সহায়ক হয়েছে ভারতবর্ষে, বহুকে করেছে এক, দূরকে করেছে নিকট, তার সবারইতো দেখছি মূল রয়েছে অনার্যভারতে প্রবিষ্ট। তাহলে একীকরণের যে মানসিকতা, বাহ্যতঃ তা আর্য হলেও মূলতঃ তা অনার্যদের, একথাই আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে বিনা দ্বিধায়। এবং তাহলে কেন যে এতক্ষণ একান্ন পীঠের আলোচনা আরম্ভ করতে গিয়েও এতটা নিলাম সময়, সে-কথাটাই এবার বলছি স্পষ্ট করে।

একান্ন পীঠ বলতে আপনারা বোঝেন কি? সরল এবং সাদা ভাষায় যেটুকু বোঝেন, তার অর্থ এই যে, সতীর দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত হয়ে ভারতের একান্নটি বিভিন্ন স্থানে যেখানে যেখানে পড়েছিল ছড়িয়ে সেখানেই গড়ে উঠেছে এক একটি পীঠ। এবং সর্বসাকুল্যে তাই নিয়ে একান্নটি শাক্তপীঠ সারা ভারতবর্ষে।

একান্নপীঠের পেছনে যে আছে ধর্মীয় কাহিনী, তা বলছি পরে। তার আগে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সামান্য একটু আলোচনা করে নিই প্রথমে—যে কারণে একীকরণের প্রশ্ন নিয়েই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা। পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা, কোন মৃত ব্যক্তির দেহ কা'রো কাঁধ থেকে সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে পড়েছে ছিটকে ছিটকে বা কোন এক চক্রের দ্বারা খণ্ড বিছিন্ন হয়ে গেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বিশ্বাস্য নয় একথা। আজকের মত যদি থাকতো অ্যারোপ্লেন, তাহলে হয়তো বা আকাশে উঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হত সম্ভব—যেমন করে কোন রাষ্ট্রনেতার দেহভস্ম ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আধুনিক কালে। পায় হেঁটে বেড়ানো মনুষ্যাকৃতির কাঁধ থেকে আর একটা মানবী আকৃতির দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সারা ভারতে এমন করে ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব। আসলে এ-সব হল একটা গল্প, যার পেছনের অর্থ হল ভিন্নরকম। গল্পটা হল একীকরণের, বহু আঞ্চলিক মাতৃদেবীকে এক মহামাতৃদেবীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে

বিচ্ছিন্নতা দূর করার। পণ্ডিতেরা বলতে চান, আর্যরাই সম্পাদন করেছিলেন এই একীকরণের কাজ, আর আমি বলতে চাই এই যে, একীকরণের বৃত্তি ছিল অনার্যদেরই সহজাত, আর্যদের মধ্য দিয়ে সেই মানসিকতাই করেছে বিকাশ লাভ।

কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে বলতে চান, শিব-সতীকে নিয়ে দক্ষযজ্ঞের যে গল্প, সেটা আর কিছুই নয়, আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের এক সঙ্গমকালের কাহিনী—যখন অনার্য দেবতা শিবকে এবং পুরানো প্রাক-আর্য মাতৃ-দেবীকে আর্যরা গ্রহণ করেছিলেন পরিশুদ্ধ করে নিজেদের মধ্যে। আবার ঠিক এর উল্টো দিকও হতে পারে, অর্থাৎ এই অনার্য দেবতা শিব এবং প্রাচীন দেবী বিশ্বমাতা, আর্যজগতে ঢুকে পড়েছিলেন নিজেদের গায়ের জোরে (বিশেষ করে শিব, কারণ, অনার্য Universal Mother আর্যসমাজে ঢুকতে নাকি আরও নিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন সময়।) শিব যে জোর করেই ঢুকে পড়েছিলেন আর্যদের পূজার জগতে, দক্ষযজ্ঞনাশ গল্পটাই তার প্রমাণ, যেমন, একদিন মনসা ঢুকে পড়েছিলেন বৈদিক দেবদেবীর সূচীপত্রে চাঁদ সওদাগরের গল্পের মাধ্যমে। কাহিনীটাকে যদি বলি একটু বিশদভাবে তাহলেই হবে ব্যাপারটা পরিষ্কার।

সমস্ত দেখে শুনে যা মনে হয়, অনার্য-দেবতা শিবের এটা আর্য পূজার বেদীতে স্থান লাভের কাহিনী। কিন্তু রহস্য তবুও অপার। আর্য-অনার্য এমন ভাবে জড়িয়ে আছে এখানে, যে, প্রকৃত সত্য উদ্ধার করা প্রায় অসাধ্য। আর্য-মানসের নির্ভেজাল প্রকাশ হল ঋগ্বেদ। শিব-সতী ব্যাপারটা অনার্য-জাতীয় ব্যাপার হলেও আর্যদের ঋগ্বেদেই কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে দক্ষ-যজ্ঞ কাহিনীর একটা অস্পষ্ট চিত্র। যেমন, ঋগ্বেদেরই এক জায়গায় পাওয়া গেছে এমন এক গল্পের ইঙ্গিত, যাকে দক্ষযজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করানো যেতে পারে অনায়াসে। ঋগ্বেদের স্তোত্রে পাওয়া এই গল্পের বীজ আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে—শতপথ, ঐতরেয় আর তাণ্ডমহা-ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে। গল্পটা এই ধরণের : যজ্ঞ প্রজাপতি অন্যায় ভাবে নিজের কন্যা দ্যৌ অথবা

উষাকে করলেন বলাৎকার। পিতার এই অন্যায় কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতারা গিয়ে ধরলেন রুদ্রকে : করুন এর প্রতিকার। ভেদ করুন প্রজাপতিকে সুতীক্ষ্ণ আপনার শায়ক দিয়ে। রুদ্র অনুরোধ রাখলেন দেবতাদের। এবং শর নিক্ষেপ করলেন প্রজাপতিকে লক্ষ্য করে। শরের আঘাতে প্রজাপতির ঘটল রেতঃপাত। প্রজাপতি অর্থ যখন যজ্ঞ, তখন তাঁর কোন অংশকেই যজ্ঞের প্রয়োজন ব্যতীত ব্যবহার না করে যায় না ফেলে দেওয়া। ফলে দেবতারা প্রজাপতির রেতঃ নিয়ে দিলেন ভগকে—যিনি বসেন যজ্ঞাগ্নির দক্ষিণপ্রান্তে। ভগ প্রজাপতির রেতের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেলেন দগ্ধনেত্র। দেবতারা তখন এই রেতঃ নিয়ে গেলেন পুষনের কাছে—আর পুষন এই রেতঃ আস্বাদন করার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেলেন দন্তহীন...ইত্যাদি। এ গল্প নিয়ে এগিয়ে আর লাভ নেই, কারণ, এতে একান্নপীঠের সূত্রপাতের নেই কোন লক্ষণই। তবে উপরের গল্পেরই 'গোপথ ব্রাহ্মণে' সামান্য ঘটেছে পরিবর্তন। তাতে দক্ষযজ্ঞের কাহিনীর দিকে ঘটেছে আর একটু অগ্রগতি, যেমন,—'গোপথ ব্রাহ্মণে' আছে—প্রজাপতি আয়োজন করলেন যজ্ঞের, যজ্ঞ করলেন, কিন্তু রুদ্রকে করলেন না আহবান। ক্রুদ্ধ রুদ্র যজ্ঞক্ষেত্র অধিকার করে জোর করে কেটে নিলেন যজ্ঞাগ্নি। 'রুদ্রের এই কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্রই ভগ হারালেন তাঁর দৃষ্টি এবং পুষন দন্ত। কিন্তু এ-গল্পেও নেই একান্নপীঠের কোন সূত্রপাত। এককে বিচ্ছিন্ন করে বহুকে একের অন্তর্ভুক্ত করারও নেই কোন প্রয়াস। শিব নয়, রুদ্রই এই যজ্ঞনাশের কারণ। হয়তো আর্যদেবতাদের ঘরোয়া বিবাদেরই একটা রেকর্ড মাত্র এ-গল্প। অর্থাৎ আমরা যা খুঁজছি তার কোন সম্ভাবনা নেই এখানেও। তবে এই রুদ্রও যে অনার্য উৎস থেকে উৎসারিত ঐতিহাসিকেরা বলেন এমনতর কথাই। এবং যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েই। সুতরাং……

কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, গল্পটা কিন্তু থেমে থাকেনি এখানেই —শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে তো চলেছেই। ঋগ্বেদের বীজ এবং ব্রাহ্মণের ভ্রূণকে দক্ষযজ্ঞনাশ গল্পের আকারে

রীতিমত রূপ নিতে দেখি ঐতিহাসিককালেও, ধরুন—গুপ্তশাসন আরম্ভ হবার সামান্য কিছু আগে।

দক্ষযজ্ঞ-নাশ জাতীয় গল্প দেখা যায় মহাভারতেই প্রথম। এবং সেটাই একটু আধটু রূপ পাল্টে দেখা দিয়েছে নানা পুরাণে, যেমন ধরুন—মৎস্য, পদ্ম, সৃষ্টিখণ্ড, কূর্ম, ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি। এবং, এমনকি কুমারসম্ভবের মত কাব্যেও। আর এ-কথা আপনারাই জানেন যে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর লোক? এই সময়েই দক্ষযজ্ঞে শিবের সঙ্গে সতীর উল্লেখ আমরা দেখতে পাই প্রথম। অবশ্য পুরাণের কোন ঘটনার সময়গত মূল্য নিরূপণ প্রকৃতপক্ষেই কঠিন। সময়ে সময়ে কত কিছু যে ঢুকে গেছে পুরাণের মধ্যে, তার নেই হিসেব নিকেষ। কখন যে ঢুকেছে কোন্‌টা, বলবে কে। যেমন ধরুন না, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কথাই বলি। সুলতান মামুদ যে একাদশ শতাব্দীতে ভাবতে এসেছিলেন সতেরবার, এ কথা বোধ হয় জানেন ভারতবর্ষের আপামর সকলেই। এবং প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই জানেন যে, তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতিসমন্বয়ের এক অগ্রদূত, যাঁর নাম অল্‌বিরূণী, তিনিও এসেছিলেন একাদশ শতাব্দীতেই এ-দেশে। তাঁর লেখাতে দেখতে পাই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এক উল্লেখ। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে এমন ঘটনার বর্ণনা, যা নিঃসন্দেহে আরও অনেক পরের। যেমন, এই পুরাণেই আছে 'জোলা' বলে এক জাতের কথা, যার উদ্ভব হিন্দু এবং মুসলমানের সংমিশ্রণে, অর্থাৎ মুসলিম পিতার ঔরসে এবং হিন্দু তাঁতী-রমণীর গর্ভে। যে পুস্তকের রচনা মুসমমানরা ভারতে আসবার আগে (তা যদি না হত, তাহলে অল্‌বিরূণী এর উল্লেখ করলেন কোত্থেকে?) তাতে জোলার উল্লেখ থাকতে পারে কি করে? সুতরাং চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পুরাণের কোন কাহিনী, বাস্তবিক পক্ষে তা ঐ যুগের না আরো পরের, জোর করে তা বলার কোন নেই উপায়। তবুও অন্ততঃ এইটুকু যেতে পারে বলা যে, এই সময়েরই রচনাতে, দক্ষযজ্ঞনাশ গল্পে, শিব-সতী দুইয়েরই আছে উল্লেখ। অবশ্য তাই বলে যে

একান্নপীঠের উদ্ভবও এ-সময় থেকেই, জোর দিয়ে বলা সে কথাও অসম্ভব। দক্ষযজ্ঞনাশের বৈদিক গল্পে যদি থাকতো একান্নপীঠের ইঙ্গিত, তাহলে হয়তো বলতে পারতাম যে, একীকরণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন আর্যরা নিজেরাই, অনার্যরা নন। যদি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে দক্ষযজ্ঞনাশ গল্পে পেতাম একান্নপীঠের ইঙ্গিত, তাহলে অবশ্য জানি না একীকরণ-মানসিকতার জন্য দায়ী করতাম কাকে, আর্য অথবা অনার্যকে। কিন্তু এ-সময়েও ইঙ্গিত নেই একান্নপীঠের উদ্ভবের। গল্পেতে যা আছে, এইটুকু যায় বোঝা যে, আর্য-দেবতাসমূহের মধ্যে অনার্য-দেবতা শিব তাঁর নিজের করে নিচ্ছেন স্থান। কারণ, এ-সময়ের গল্পগুলোর বক্তব্য হল এই ধরনের, যেমন: মহাভারতে আছে— দক্ষযজ্ঞে সতী দক্ষকে বলছেন নিজের পতি শিবের প্রতি অবজ্ঞা এবং অনাদরের কথা। কিন্তু তিনি নিজে যে দক্ষের কন্যা, এমন কোন ইঙ্গিত নেই। এমন কি পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগের কথাও নেই কোন। তবে পুরাণগুলিতে দক্ষযজ্ঞ সম্পর্কে আগের সকল চিন্তারই একটা মিলন ঘটাবার আছে চেষ্টা। যেমন, প্রজাপতি কর্তৃক আপন কন্যার অপমানের কথাও আছে, আবার আছে রুদ্রের দক্ষযজ্ঞ নাশের কাহিনীও। আর এই দুইধারাকে মিলিয়ে দিয়ে নতুন আছে এক গল্পও। যেমন, এখানেই প্রথম শুনতে পাই পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগের কথা; পত্নীর দেহত্যাগের খবর শুনে শিবের দক্ষযজ্ঞনাশ, স্বয়ং শিব কর্তৃক দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ অথবা বীরভদ্র দ্বারা যজ্ঞনাশ ও দক্ষের লাঞ্ছনার কথা। নিহত দক্ষকে আছে শিবের নতুন করে আবার জীবন দানের কথাও। অর্থাৎ স্পষ্ট বোঝা যায়, মনসামঙ্গলের মনসার মত শিব নিজের মহিমা প্রকাশ করে ঢুকে পড়ছেন আর্য-দেবতার মর্যাদার মধ্যে। অতিপ্রাচীন সেই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বর্ণিত পুরানো কাহিনীর রেশও আছে কোন কোন পরবর্তী লেখাতে, যেমন, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেই আছে দক্ষযজ্ঞনাশ সংক্রান্ত গল্পে (চণ্ডীমঙ্গলের দক্ষযজ্ঞভঙ্গ অংশে) ভগের অন্ধত্বের কথা বা পূষনের (সূর্যের) দন্তহীনতার কথা। অবশ্য সামান্য

পরিবর্তন হয়েছে এই যে, প্রজাপতির রেতঃ দর্শনে ভগের দৃষ্টিনাশ, বা আস্বাদনে পূষনের দন্তনাশের ক্ষেত্রে এসেছে বীরভদ্র দ্বারা ভগের চক্ষু বা পূষনের দন্ত উৎপাটনের কথা। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, গল্পটা একটা ক্ষুদ্র বীজ থেকে ক্রমশঃ মহীরুহ হয়ে উঠছে বেড়ে। এবং সমসাময়িক ধারণা এসে যুক্ত হচ্ছে মূলের সঙ্গে। কিন্তু এসময়েও একান্নপীঠের নেই উল্লেখ। অর্থাৎ, তাতে এইটুকু যায় ধারণা করা যে, অনার্য দেবতা শিব এসময় সাধারণতঃ পুরুষ দেবতার প্রতি আস্থাবান আর্যদের জগতে ঢুকতে পারলেও (এবং এটা একটু আগেই সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, শিবের প্রতিরূপ 'রুদ্র' আর্যদের দেবতা হিসেবে ছিলেন সেই ঋগ্বেদের সময় থেকেই) অনার্য মাতৃদেবী তখনও প্রবেশ করতে পারেন নি আর্য দেবদেবীর জগতে, এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল আরও একটু পরে, যে কথাটা বলতে যাচ্ছি এখনই।

যদি ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করি, গল্পের দিক থেকে, পুরাণের দিক থেকে, তাহলে মনে হয়না যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে একান্নপীঠ সংক্রান্ত ধারণা তেমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে শাস্ত্রগ্রন্থে। মাতৃদেবীর প্রতি ক্ষীণশ্রদ্ধ আর্যসমাজে বিশাল আকার নিয়ে অনার্য মাতৃদেবীর ঢুকে পড়ার সুযোগ বোধহয় এসময়ই ছিল সব চাইতে বেশী।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর ইতিহাস যদি একটু বিচার করেন, তাহলে দেখবেন, আলাউদ্দীন খিলজী সমগ্র ভারতবর্ষের মাটি কাঁপিয়ে দিয়েছেন ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপরই চলেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা অস্থিরতা মহম্মদ তুঘলকের সারা রাজত্বকাল ধরে। যদিও গিয়াউসদ্দীন তুঘলক ছিলেন শাসক হিসেবে ভাল এবং খাঁটি মুসলমান হিসেবে ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বও কিছুটা সমৃদ্ধির প্রতীক, হিন্দুদের ক্ষেত্রে এঁদের দুজনের কেউই ছিলেন না কৃপাদৃষ্টিসম্পন্ন। মুসলিম শাসনের নির্মম দণ্ড প্রথম এসে পড়ে আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ই হিন্দুদের উপর। এবং তারপর থেকে দীর্ঘদিন তা হ্রাস পায়নি আর। নিষ্পেষণটা ছিল কি রকম, তা যদি দেখতে চান একটু খতিয়ে,

তাহলেই বুঝবেন সব। যেমন ধরুন, এসময় কোন হিন্দুই বিলাস দেখাতে সাহস করতেন না, স্বাচ্ছল্য দেখাতেও নয়। সম্পদশালী ব্যক্তিও মাটির নিচে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হতেন সম্পদ। এ-হেন দুর্দশাগ্রস্ত সমাজে যাকে বলে হতাশাবোধ, তাই আসা সম্ভব। এবং এই ধরনের হতাশাবোধে সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে আসে একটা অতি-প্রাকৃতে আস্থা স্থাপনের মনোভাব। এবং এ ধরনের মনোভাবে যদি ভাববাদের না থাকে প্রাধান্য তাহলে অতিপ্রাকৃতে তন্ময় হয়ে থাকা অসম্ভব। ভাববাদী উচ্ছ্বাসের মাকে কেন্দ্র করে যত সহজে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, পিতাকে কেন্দ্র করে তত নয়। এবং সম্ভবতঃ এই মানসিক অবস্থার সুযোগেই অনার্য মাতৃশক্তি মহাশক্তি হয়ে দেখা দিয়েছিলেন আর্য মানুষের ধর্ম-জগতে। এবং তিনি এসেছিলেন দুটো উদ্দেশ্য সাধন করতে—শক্তির উদ্বোধন আর ভাবের প্রকাশ। অনার্য ৺মা হলেন মহাশক্তিরূপা আদ্যাশক্তি। তন্ত্রাচারে তাঁর পূজা হল একধরনের ক্ষাত্র-শক্তির পুনরুজ্জীবন। আবার ভাবের আধিক্যে তাঁর আরাধনায় হল ভক্তির উদ্বোধন। শক্তিরূপা ৺মায়ের পদতলে বসে ভক্তিসূত্র সৃষ্টি করেছিলেন এমনই এক যবন নির্যাতিত সমাজে বসে সাধক রামপ্রসাদ। নির্যাতিত জাতির আশ্রয় হিসেবে এ-সময়ে শক্তিরূপা ৺মায়ের কল্পনা করা ছাড়া উপাও ছিল না কোন। এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই ভারতের বিভিন্ন মাতৃআরাধক জাতিকে ঐকবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল বলেই এসেছিল একান্নপীঠের কল্পনা। এবং সত্যি সত্যি একান্নপীঠের নামে যে বহু আঞ্চলিক দেবী এসে মহাশক্তিরূপা ৺মায়ের সঙ্গে হয়েছেন একীভূতা, তাতে নেই সন্দেহ। তবে এই একীকরণের জন্য যে প্রচেষ্টা, সেটা আরম্ভ হয়েছিল ক্ষুদ্র পরিসর থেকেই প্রথম। প্রয়োজনে সেটা ছড়িয়ে পড়েছে আরো বৃহত্তর বৃত্তে। এবং সে জন্যেই একান্নপীঠের সূত্রপাত প্রথমে অনেক কম সংখ্যক পীঠ দিয়ে, এবং শেষপর্যন্ত তা একান্নপীঠে অথবা আরো অনেক বেশী পীঠে ছড়িয়ে প'ড়ে ভারতে সৃষ্টি করেছে শক্তিসাধনার এক বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডল।

সতীর দেহখণ্ড পতনে পীঠস্থানের সৃষ্টি অত সহজেই হয়তো হতে

পারতো না, যদি না পীঠসংক্রান্ত একটা পশ্চাৎভূমি আগে থাকতেই তৈরী হয়ে থাকতো এদেশে। ঋগ্বেদের বীজ, পুরাণের গল্প, প্রচলিত কিছু মাতৃসাধনার ধারা, এইসব একত্রে মিলেমিশেই ঐতিহাসিক এক সন্ধিক্ষণে সম্ভবতঃ সৃষ্টি করে ফেলেছে মহাতীর্থ একান্নপীঠের কাহিনী। এবং সেটা যদি স্পষ্ট করে বুঝতে হয়, তাহলে যে পশ্চাৎভূমি সেই কাহিনীকে আকৃতিলাভে করেছে সাহায্য, সেই ক্রমবিবর্তনশীল পশ্চাৎভূমি সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নিলেই বোঝা যাবে একান্নপীঠরূপ গল্পকথার উদ্ভবের কারণ।

আবার আপনাদের বলছি, ধৈর্য ধরুন একটু। ধর্মের নাম করে ইতিহাস আলোচনা করছি বলে ক্ষিপ্ত হবেন না একটুও। এবং এতক্ষণ পর্যন্ত একান্নপীঠের অতিপ্রাকৃত কাহিনীতে আসিনি বলে ধৈর্যও হারাবেন না যেন সহসা। আগেই তো বলেছি, সূক্ষ্মে যেতে হলে স্থূল থেকেই হয় যেতে। অর্ধ এবং অন্ধবিশ্বাস নিয়ে ধর্ম করার মহাপাপে লিপ্ত হবার চাইতে অবিশ্বাসও ভাল, কারণ, অন্ধবিশ্বাসে নিজেকেই শুধু হয়না প্রবঞ্চিত করা আর এক দল প্রবঞ্চকের (মোহান্ত, পাণ্ডা, পুরোহিত ইত্যাদি) জন্মদানেও করা হয় সাহায্য। ব্যাপারটাকে বুঝুন এবং লক্ষ্য রাখুন। ঘটনা যদি বিচার বিশ্লেষণের ক্ষুরধার আক্রমণ কাটিয়ে পারে আত্মরক্ষা করতে, তবেই অমৃতলোকে স্থিতি। সীতা, দেবী হয়ে ওঠেন তখনই, যখন তিনি অগ্নিপরীক্ষায় হয়ে ওঠেন পবিশুদ্ধ। বিশ্লেষণহীন অলৌকিকতা হল ধর্মপথে বিপথে চালনার সামিল—লোকপ্রিয় ভারতের সাধকের কাহিনী যেমন। সুতরাং আসুন, অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়েই এগোই আমরা, মহাশক্তিরূপা ৺মায়ের সত্যিকারের রূপের কথা জানি। হ্যাঁ, সেই যে বলছিলাম পশ্চাৎভূমি—, পীঠরূপে শাক্তপীঠের আবির্ভাবের গোড়ার কথা—যা নাকি সহায়ক হয়েছে একান্নপীঠের উদ্ভবে।

পীঠসংক্রান্ত শক্তি তীর্থক্ষেত্র তৈরী করার জন্য ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগের প্রারম্ভে দক্ষযজ্ঞ সংক্রান্ত প্রচলিত গল্পে একটা নতুন কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা। এবং সেটাই হল সতী সংক্রান্ত

কাহিনী। দেবীভাগবত আর কালিকাপুরাণে পুরনো গল্পের উপর নতুন সংযোজনা দেখা যায় এই যে, দক্ষযজ্ঞ নাশ করেই শিব এখানে শান্ত নন, পত্নী বিরহে সান্ত্বনার অতীত বেদনায় তিনি মুহ্যমান। দক্ষযজ্ঞনাশ করে, প্রিয়তমা পত্নীকে স্কন্ধে তুলে, উন্মত্ত নৃত্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন প্রান্তরে প্রান্তরে। দেবতারা চেষ্টা করলেন মৃতা পত্নীর মোহ থেকে শিবকে মুক্ত করতে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি, যোগের সাহায্যে ঢুকে গেলেন সতীর মৃতদেহে এবং ধীরে ধীরে তাঁকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলে দিতে লাগলেন দেশের নানাস্থানে, এবং যেখানে পড়ল সতীর এই দেহাংশ সেখানেই গড়ে উঠল একটি করে শাক্তপীঠ। কিন্তু সতী হলেন শক্তিরূপা, অর্থাৎ সৎ-এর গুণস্বরূপ। অর্থাৎ সতী হলেন নির্গুণ ব্রহ্মের ক্রিয়ারূপে প্রকাশ। ব্রহ্মস্বরূপ শিব, সতী হলেন তাঁর প্রকাশ, প্রকৃতি। সুতরাং সতীর কোন খণ্ডাংশ তো একক ভাবে পড়তে পারেন না কোথাও। শিব ছাড়া সতীর তো কোন অর্থ নেই। তাই যেখানেই মাতৃঅঙ্গ সেখানেই শিবের একটি অংশ ভৈরবরূপে, কিংবা শিব স্বয়ং ভৈরব হয়ে। মাতৃরূপা শক্তির যথার্থ মহিমা এই শিব-শক্তি কল্পনার একাত্মতায়, যে কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে আর একটু পরে, এখন যা বলছিলাম, সেই কথাতেই আসা যাক।

সতীর দেহখণ্ড বিচ্ছিন্ন হবার গল্পে ভিন্ন ধরনের একটা প্রবাদও আছে। যেমন, সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শনি নন, স্বয়ং বিষ্ণু শিবকে অনুসরণ ক'রে তাঁর সুতীক্ষ্ণ শায়ক বা চক্রে টুক্‌রে টুক্‌রো কেটে সতীর দেহ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দেশের নানা স্থানে। কিন্তু দেহ খণ্ডিতকরণের পদ্ধতি হোক না যা-ই কেন—, আমাদের আলোচনার বিষয় নয় সেটা। আমাদের আলোচনার বিষয়—কি করে দেহখণ্ডপাত থেকে পীঠরূপ তীর্থ গড়ে উঠেছে, তাই। এমন কোন পশ্চাৎভূমি কি ছিল, যা পীঠরূপ পীঠস্থান গড়ে তুলতে করেছিল সাহায্য!

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পীঠন্যাস বলে একটা কথা আছে, সম্ভবতঃ পীঠ কথাটা এসেছে সেই অঙ্গন্যাস, ষোঢ়ান্যাস প্রভৃতি কথা থেকেই। তন্ত্রে অঙ্গন্যাসের অর্থ হল মন্ত্র উচ্চরণ করে দেহের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ,

আর ষোঢ়ান্যাস হল গুহ্যমন্ত্র উচ্চারণ করে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে দেহ ছোঁয়া। এবং এ-থেকেই বোধ হয় পীঠবিন্যাস কথার উৎপত্তি। সাধকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের (তান্ত্রিক মতে) বিভিন্ন স্থান স্পর্শকরণের পদ্ধতি থেকেই সম্ভবতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে যুক্ত পীঠস্থানের এসেছে কল্পনা। কিংবা বৌদ্ধ কোন গল্পকথাও হতে পারে এর প্রেরণা। বৌদ্ধ কাহিনীতে আছে নানা স্তূপের কথা, যাতে সংরক্ষিত আছে বুদ্ধের দেহচিহ্ন। কিংবা বারাগত কোন উপকথার প্রভাবেই হয়তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যুক্ত পবিত্র স্থান, বা পীঠস্থানের উদ্ভব হয়েছে ভারতে।

একথা তো কিছু আগেই বলেছি যে, ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেনি সেই প্রাচীন কাল থেকেই। বাণিজ্যসূত্রে ইরাণ, মেসো-পোটেমিয়া, মিশরের সঙ্গে ছিল তার নিকট সম্পর্ক। এবং চিরকাল যা ঘটে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে হলে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বুদ্ধির অগোচরেই একের প্রভাব এসে পড়ে অপরের উপর, (রোম-গ্রীস-মিশরের ক্ষেত্রে যা হয়েছে) সেই রকম একটা কিছু ঘটেছিল কিনা, তাই বা বলবে কে। প্লুতার্কের লেখা থেকে জানা যায়, প্রাচীন মিশরে ওসিরিজ (Osiris) দেবতাকে কেন্দ্র করে এক অবিশ্বাস্য গল্প: ওসিরিজ হলেন মিশরের সবচাইতে লোকপ্রিয় দেবতাদের মধ্যে একজন—সেব (মাতা বসুন্ধরা) এবং নুট-(আকাশের, আমাদের দ্যৌ-এর মতন)-এর পুত্র। তিনি ছিলেন রীতিমত জ্ঞানী আর ন্যায়পরায়ণ রাজা। জয় করেছিলেন সমগ্র মিশর। অসভ্য বর্বর মিশরীয়দের তিনিই করে তুলেছিলেন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান। মিশরের কল্যাণকর আইনের এবং আইন ব্যবস্থার তিনিই হলেন স্রষ্টা। কিন্তু নিজের ভাই সেট (Set)-ই তাঁকে হত্যা করে ক্ষমতালোভে, জীবন্ত অবস্থায় কফিনে ঢুকিয়ে নীলনদের জলে দেয় ফেলে। ওসিরিজকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন দেবী আইসিস (Isis)। স্বামী অবর্তমানে পাগলের মত খুঁজে বেড়াতে থাকেন তাঁকে আইসিস (যেমন সতীর বিরহে পাগল হয়ে তাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে-ছিলেন আমাদের শিব)। অবশেষে নীল নদের ধারে খুঁজে পান তিনি স্বামীর দেহ। কিন্তু স্বামীর দেহের সন্ধান পেলেও সেই দেহ

তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দেয়নি সেট (Set)। ছিনিয়ে নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছিল কেটে, তারপর দেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে দিয়েছিল সেই অংশগুলি। আইসিস (Isis) আবার সংগ্রহ করেন সেই অংশগুলি, শুধুমাত্র একটি অংশ অর্থাৎ লিঙ্গ বাদে। তারপর সেই দেহকে দেন কবর (ভিন্নমতে আইসিস আর সংগ্রহ করতে পারেননি ছড়িয়ে দেওয়া দেহখণ্ডগুলিকে)। পরবর্তীকালে ওসিরিজের চিহ্ন হিসেবে মিশরের নানা মন্দিরে ভক্তদের দেখানো হত সেই সব। অর্থাৎ ওসিরিজের খণ্ডিত দেহাংশগুলি লাভ করেছিল তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য। অনেকের মতে এই ওসিরিজের পূজা হত তাঁর লিঙ্গকে প্রতীক করে। আমাদের শিবের শক্তি ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা তেমনই ওসিরিজের শক্তি হলেন তাঁর পত্নী আইসিস। তিনি পৃথিবীরূপা। তন্ত্রে শক্তির যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি, আইসিস দেবীরও ছিল তেমন ত্রিকোণ যন্ত্র। শিব যেমন সংহারকর্তা, ওসিরিজও তেমনি প্রাণসংহারক। শিবের বাহন যেমন বৃষ তেমনই হল ওসিরিজের বাহন এপিস নামে ষাঁড়। সেই ষাঁড়ও পূজা পেত মিশরবাসীর। শিব এবং ওসিরিজ উভয়েরই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হাতে যেমন ত্রিশূল তেমনি ছিল ওসিরিজের হাতে দণ্ড। শিবের মতন ওসিরিজও নাকি পরতেন ব্যাঘ্রচর্ম। শিবের বিল্বপত্রের মত ওসিরিজের প্রিয় পত্রও ছিল ত্রিধাবিভক্ত। ভারতবর্ষে যেমন শিবের মুখ্যস্থান কাশী, তেমনই সারা মিশরে ওসিরিজের থান ছড়িয়ে থাকলেও মুখ্য থান ছিল মেম্ফিসে। শিবের প্রিয় যেমন দুধ, তেমনই ওসিরিজও ছিলেন দুগ্ধপ্রিয়, তবে পার্থক্য এই, শিব হলেন শ্বেতধবল, আর অসিরিজ কৃষ্ণ বর্ণ। তবে মহাকাল নামে কৃষ্ণবর্ণ শিবমূর্তি নাকি আছে এদেশে, তন্ত্রসার গ্রন্থে আছে যার উল্লেখ। যেমন—

মহাকালং যজেদ্দেব্যাদক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্ ॥

ওসিরিজদেবের লিঙ্গ পূজার কারণ নাকি এই যে, দেবী আইসিস খুঁজে পাননি ঐ অংশটুকু। সেইজন্য ওসিরিজের লিঙ্গ তৈরী করে পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

এই লিঙ্গ পূজা এক সময় প্রচলিত ছিল গ্রীসেও। গ্রীসের বহু নগরে পথে পথে মন্দিরে মন্দিরে নাকি ছিল লিঙ্গমূর্তি। ফেলিফোরিয়া নামে এক উৎসব ছিল বেক্‌সদেবের। কাষ্ঠদণ্ডে চর্মলিঙ্গ বেঁধে, মেষচর্ম করে পরিধান, আমাদের চৈত্রপূজার গাজনের সন্ন্যাসীর মতন বেক্‌সদেবের শিষ্যরাও নাকি করত নৃত্য। গায়ে মেখে নিত কালো কালি। প্রাচীন ব্যাবিলন ও আসিরিয়াতেও নাকি ছিল এই ধরনের লিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা। ছিল রোমানদের মধ্যেও। এই সব গল্পেরই কোন ছায়া এসে পড়েছিল কিনা ভারতবর্ষে, এবং তারই ফলে সতীদেহখণ্ড থেকে একান্নপীঠের উদ্ভব কিনা, কোন কোন ইতিহাসবেত্তা ভেবেছেন এরকমও। কিন্তু, ব্যাপারটা নয় বোধ হয় সেরকম। তার কারণ হল এই যে, মিশরীয় গল্পের ভাবের আদানপ্রদানের প্রভাবে যদি পীঠস্থান গড়ে উঠতো এ-দেশে, তাহলে একান্নপীঠের কথা শুনতে পেতাম আমরা অনেক আগেই, প্রাচীন কালে, মধ্যযুগের চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে নয়। কারণ, মিশরীয় এই ধরণের প্রাচীন গল্পের ছায়ার ভারতে আসা সম্ভব ছিল প্রাচীন কালেই, যখন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে এই সব দেশের চলত ব্যবসাবাণিজ্য। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে ছিল মুসলমানদের প্রভাব। পৌত্তলিকতা-বিরোধী মুসলমানদের মাধ্যমে মধ্যযুগের ভারতে এ-ধরনের কোন গল্পকথা এসে পৌঁছানো ছিল অসম্ভব। সুতরাং পীঠস্থানের উৎপত্তির ছায়া খুঁজতে হবে ভিন্নভাবে, ভিন্নক্ষেত্রে। এবার সেই সন্ধানই করা যাক।

যতদূর মনে হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পীঠস্থান হিসাবে গণ্য করবার সূত্র এসেছে লিঙ্গপূজা থেকেই। লিঙ্গ হল শিবের প্রতীক, পুরুষের। কিন্তু প্রাচীন মহেন-জো-দড়ো থেকেই দেখছি শুধু লিঙ্গ একক নয়, সঙ্গে আছে যোনি, মাতৃশক্তির প্রতীক। এই পুরুষ এবং নারীর সঙ্গমেই সৃষ্টি, জন্ম। অতি প্রাচীন কালেই তাই দেহের অংশ বিশেষও পবিত্র প্রতীকের মর্যাদা লাভ করে হয়ে উঠেছিল পূজার বিষয়। সুতরাং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করে পূজা পদ্ধতি অভিনব কিছু ব্যাপার নয়। ফলে এও হতে পারে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

থেকে পীঠস্থানের উৎপত্তির মূল রয়েছে এই ধরনের লিঙ্গ বা যোনি পূজার মধ্যেই।

মাতৃশক্তির প্রতীক হিসেবে যোনিপূজার স্পষ্ট উল্লেখ আছে পরবর্তীকালের তন্ত্র-গ্রন্থে, যেমন, যোনিতন্ত্র নামক গ্রন্থ। আপনারা জানেন যে, শক্তিরূপা ৺মা, ভগবতী নামেও আমাদের কাছে পরিচিত। ভগবতী শব্দের যদি ব্যাখ্যা হয়, তাহলে অর্থটা দাঁড়ায় এইরকমঃ ভগ-এর অধিকর্ত্রী দেবীই হলেন ভগবতী। 'ভগ' শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, তার মানে দাঁড়ায় স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থাৎ যোনি। এবং সেই অর্থে ভগবতী জন্মদায়িনী মাতৃশক্তির প্রতীক। এবং মাতৃশক্তির বিপরীত, পুরুষ দেবতাকে বোঝাবার জন্য সম্ভবতঃ সেই জন্যই পরবর্তী কালে 'ভগবৎ' শব্দের আমদানী, যার দ্বারা বোঝানো হয় শিব বা অন্য কোন ভিন্ন পুরুষ দেবতা।

দেবতার অঙ্গপূজার প্রতি মানুষের যে অনেক দিন আগে থেকেই ছিল একটা প্রবণতা, তার প্রমাণ মেলে পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সামিল কিছু প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির দিকে মানুষের সশ্রদ্ধ ভাব দেখে। যেমন, পুরুষের লিঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার জন্য প্রাচীন কালে বহু মানুষ পর্বতশৃঙ্গকে পূজা করত শিব-লিঙ্গ বলে। বিশেষ আকৃতির কিছু জলাশয়ও সেই জন্য পেত মায়ের যোনি হিসেবে পূজা। রমণী নারীর বুকের সঙ্গে দেখা যায় অনেক সময়ই যুগ্ম পর্বত শিখরকে তুলনা করতে। যেমন, কালিদাসের রঘুবংশেই পাণ্ড্যদেশের মলয় ও দর্দুর পর্বতের দুই শিখরকে তুলনা করা হয়েছে রমণী নারীর স্তন-যুগলের সঙ্গে। পর্বতশীর্ষ থেকে নিম্নগামী স্রোতস্বিনীধারাকে এই জন্যই মনে করা হত মাতৃদুগ্ধের মত. এ-থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, দেব-দেবীর প্রতীক হিসেবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি পূজার মানসিকতার অভাব ছিল না প্রাচীন কালের মানুষের। সুতরাং দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করে তীর্থরূপে পীঠস্থান গড়ে ওঠার মত সুযোগের অভাব ছিলনা কখনই। এবং এ-ব্যাপারে যে উর্বর পটভূমি ছিল, সেই সুযোগেই দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করে একান্নপীঠ জাতীয় শাক্ততীর্থ

সমূহ গড়ে উঠতে সুযোগ পেয়েছিল কিনা পরবর্তীকালে, এ-ধরনের সন্দেহের মুখও জোর করে বন্ধ করে দেওয়া যায়না কোনমতে। যোনি-কুণ্ডে স্নান ছিল প্রাচীন ভারতীয় তীর্থপুণ্যপ্রয়াসীদের কাছে একটা বড় রকমের ধর্ম। ঠিক এমনিই ছিল স্তনকুণ্ডের জলপানের গুরুত্ব।

দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করে একান্নপীঠের কল্পনাটা কিন্তু হঠাৎ একদিন লাফিয়ে এসে পড়েনি আমাদের উপর। একটা ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসের সূত্র ধরে ধীরে ধীরেই এগিয়ে এসেছে সেটা। ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে এ-ব্যাপারে আমরা যদি একটু খুঁজে দেখি, তাহলে হয়তো পেয়ে যাব একান্নপীঠের উদ্ভবের একটা ঐতিহ্যময় ভূমিও।

মনোক্ষুন্ন হবেন না, হৃদয়ে ব্যথাও পাবেন না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ধর্মের বিচার করছি বলে তাকে যে আমি হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছি, বা হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছি, তা নয়। ইতিহাস ব্যবচ্ছেদ ক'রে অতীন্দ্রিয়কে বস্তুর সীমানায় সাধারণ হিসাবে বেঁধে দিলেও, বস্তুর মধ্যেই থাকে এমন আর একটা জিনিষ, য বস্তুকে আবার বস্তুর অতীত অধ্যাত্মজগতে তুলে ধরতে পারে অনায়াসেই। তাকেই বলে দর্শন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেই ঘটনাটা আমরা এখন দেখছি, তার মানে এই নয় দর্শনকে আমরা দেব বরবাদ করে। ইতিহাস বিশ্বাসকে বস্তুর সীমায় নির্দিষ্ট করে বলেই তা সীমিত, দর্শন বস্তুকে অসীমের মধ্যে পৌঁছে দেয় বলেই তা অনন্ত। দর্শনের কৃতিত্ব এই যে, ইতিহাস যাকে প্রাকৃত ও সাধারণ বলে প্রমাণ করে, সে তাকেই আবার করে তুলে অসীম এবং অতীন্দ্রিয়। সীমিত জীবনের সার্থকতা এই অতীন্দ্রিয় অসীমতায় মিশে যাওয়ার মধ্যেই। আমরা সেই দর্শনের পর্যায়ে আসব পরে। এখনও চলছে ইতিহাস। এবং আমি আগেই বলেছি যে, স্থূলের বুকের উপর দাঁড়িয়েই সূক্ষ্মে যেতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর Thoughts On The Gita-তে, ঘটনা হিসাবে যা অবিশ্বাস্য, তাকে বিশ্বাস্যের পর্যায়ে টেনে আনার চেষ্টাই করেন নি কোন। গীতার শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর মনে ছিল সন্দেহ, পটভূমি সম্পর্কেও বিশ্বাসের অভাব, তবু গীতাকে কেন্দ্র করে যে চিরন্তন সত্যের

প্রকাশ, তাকে উড়িয়ে দেননি কোথাও, বরং অবিশ্বাসের স্থূল জগৎ থেকে যাত্রা শুরু করে অনন্তবিশ্বাসের অতীন্দ্রিয় জগতে গীতাকে করেছেন প্রকটিত। সেই রকম, মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে স্থূল জগতের, অর্থাৎ কাহিনী সম্পর্কিত বাস্তব পটভূমির চুলচেরা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করছি আমরা এখনও, কাহিনীর ভাবলোকে প্রবেশ ক'রে তার অতীন্দ্রিয়কে অনুভব করবার চেষ্টা করিনি একটুও। স্থায়ী মূল্য সেই ভাবলোকে, গল্পলোকে নয়। যথাসময়ে সেই ভাবলোকের দুয়ারে আমরা উঁকি দেব, এখন থাক। বরং যা করছিলাম, গল্প-কথার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, তাই করা যাক। হ্যাঁ, সেই যে দেহের অঙ্গ-বিশেষকে কেন্দ্র করে তীর্থমাহাত্ম্য গড়ে ওঠার পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা, সেই আলোচনাতেই আসা যাক।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করে দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি অত্যন্ত পুরানো ঘটনা এদেশে, তবে, বিশেষ বিশেষ কোন স্থানের সঙ্গে দেবদেবীর বিশেষ অঙ্গকে যুক্ত করে, স্থানমাহাত্ম্য সৃষ্টির প্রয়াসও খুব একটা আধুনিক কালের ব্যাপার নয়। তীর্থকেন্দ্র হিসাবে পীঠের উৎপত্তির গোড়াতেই মাতৃদেবীর যোনি এবং স্তনের সঙ্গে ছিল এক নিবিড় একটা সম্পর্ক। মহাভারতের বনপর্বের তীর্থ-যাত্রা অংশে আছে পবিত্র তিনটি শাক্ত পীঠের উল্লেখ। এই সব পীঠের সঙ্গে যুক্ত আছে মায়ের যোনি কিংবা স্তন। সময়ের হিসাবে যদি মহাভারতের রচনাকাল নিয়ে এ-ব্যাপারে আমরা বিচার করি ঐতিহাসিকের মতও, তাহলেও বোধহয় স্বীকার করতে হবেই যে, কমপক্ষে খ্রীষ্টীয় অব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে, ভারতবর্ষে গুপ্তদের আবির্ভাবের সামান্য কিছু আগেই রচিত অথবা লিপিবদ্ধ হয়েছিল বিশাল এই মহাকাব্য। এবং তা যদি হয়, তাহলে হবে বলতেই যে, মাতৃঅঙ্গকে কেন্দ্র করে পীঠস্থানের উদ্ভব খ্রীষ্টীয় অব্দের চতুর্থ বা আগের কোন শতাব্দীতে। কিন্তু পরের নয় কিছুতেই।

তীর্থস্থানগুলি ছিল এইসব স্থানে, যেমন—ভীমাস্থান। এখানে ছিল যোনিকুণ্ড, পঞ্চনদের কাছে, অর্থাৎ পাঞ্জাবে। একটা পাহাড়ের মাথার উপর ছিল এই কুণ্ড, যে পাহাড়কে লোকে বলত

উজ্জৎপর্বত। স্তনকুণ্ড ছিল গৌরীশেখর পর্বতের চূড়াতে। শক্তিরূপা ৺মা যে গৌরী নামেও পরিচিতা, একথা প্রায় সবাই জানি আমরা। এবং হিমালয় ছুহিতা হিসাবে ৺মায়ের যে আছে নানা নাম, তার মধ্যেই একটি হল গৌরী। ফলে আমার ধারণা, গৌরীশেখর, অর্থাৎ যে পর্বত বা পাহাড়ের শিখরে অর্থাৎ চূড়ায় বাস করতেন গৌরী, তা হবে হিমালয়েরই কোন শিখরদেশ। কিন্তু মহাভারতের বর্ণনার যা ভঙ্গী, তাতে ধারণা, এ ছুটো পর্বতশীর্ষই ছিল উত্তরপশ্চিম ভারতে নয়, পূর্বে। মহাভারতের বর্ণনা থেকে যা বোঝা যায়, তাতে অনুমান, উজ্জৎ পর্বত ছিল গয়া অঞ্চলের কোথাও। তবে সত্য সত্যই এ পর্বতশীর্ষ ছুটো ছিল কোন্ অঞ্চলে, যথাযথ বলা প্রায় অসম্ভব। পীঠ-নির্ণয় বলে একটি গ্রন্থে, আসামের গৌহাটী অঞ্চলে, অর্থাৎ কামরূপদেশে গৌরীশেখর নামে আছে এক পর্বতশীর্ষের উল্লেখ। সেই জন্যই ধারণা, গৌরীশেখর পাহাড়ের চূড়া ছিল আসামেই। তবে, এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলার নেই।

ভীমাস্থান অর্থাৎ ভীমা নামে কারো অধিষ্ঠানের ক্ষেত্র, অর্থাৎ কোন মাতৃশক্তির ক্ষেত্র, একথা বিশ্বাস করে নিতে পারি সহজেই। পণ্ডিতেরা দেখেছেন বিচার করে—উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার জেলায়, শাহবাজগড়ির কাছে, করমর পর্বতশীর্ষে ছিল এই স্থান। শাক্তধর্মের একটা প্রাচীন গ্রন্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণ। এতে আছে হিমাচলে ভীমা দেবীর উল্লেখ। পুরাণে দেবীর যে ১০৮টি নাম আছে, অর্থাৎ নামষ্টোত্তরশতম, ভীমা দেবীর উল্লেখ আছে সেখানেও, যেমন, 'ভীমাদেবী হিমাদ্রৌতু'। সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন গন্ধার দেশে, অর্থাৎ বর্তমান পেশোয়ার এবং রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চলে, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ-ই দেখেছিলেন এই ভীমাদেবীকে। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, পলুশের উত্তরপূর্বে ছিল বেশ বড় ধরনের একটা পর্বত, যেটা দেখতে ছিল ঠিক মহেশ্বরের (শিবের) সহধর্মিণী ভীমাদেবীর মত, অর্থাৎ নীলাভ। ৺মায়ের বর্ণের সঙ্গে সমাঞ্জস্য ছিল বলেই বোধহয় স্থানীয় লোকেরা এঁকে পূজা করত স্বয়ম্ভু মূর্তি বলে। দেশের নানা

প্রান্ত থেকে মাতৃ-আরাধকেরা এসে পূজা দিতেন, অনাহারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতেন সাতদিন। লোকের বিশ্বাস, ভীমা দেবী শুনতেন মানুষের প্রার্থনা; কখনও কখনও নাকি নিজের রূপ ধরে দেখাও দিতেন অনেককে।

আরাধ্য দেবদেবীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাকৃতিক কোন জিনিষ যে, আজো লোককে আকর্ষণ করে কত গভীর ধর্মবিশ্বাসে, তার নানা প্রমাণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আজও পেতে পারেন আপনি, বিশেষ করে কাশীতে যদি সঙ্কটমোচনের মন্দির দেখেন নিজে গিয়ে। আমার সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন মন্দিরটি দেখতে, প্রথম তো তারা কেউ ধারণাই করতে পারেননি দেবতা সম্পর্কে। শুধু আমার চোখেই ধরা পড়েছিল ব্যাপারটা। একটি মহাবীরের (হনুমানের) মূর্তি। কোন ভাস্করের পাথর খোদাই করা মূর্তি নয়, স্বাভাবিক একখণ্ড পাথর, হনুমানের মুখের সঙ্গে সামান্য আছে সাদৃশ্য। এবং সেই কারণেই সম্ভবতঃ স্বয়ম্ভু কোন মূর্তি ভেবে ভক্তের ভিড়ের অভাব নেই। জাগ্রত দেবতা বলে বিশ্বাস। দূর দূর থেকে লোকেরা এসে ধর্ণা দেয়, অনাহারে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে সঙ্কট মোচনের আশাতে। সুতরাং প্রাকৃতিক সাদৃশ্যে ভীমা দেবীর কল্পনা করে প্রাচীন কালে ভেঙ্গে পড়বে ভক্তেরা এটা অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়।

ভীমাদেবীর পর্বতের পাদদেশে ছিল মহেশ্বরের একটা মন্দির। সেখানে থাকতেন ভস্মাচ্ছাদিত তীর্থিক অর্থাৎ পাশুপত যোগিনরা। করতেন পূজা-আর্চা। দেবীর কাছাকাছি এই শিবমন্দিরের আছে বিশেষ একটা তাৎপর্য। এর অর্থ এই যে, দেবীকে একক ভাবে কল্পনা করা হতনা তখনও। তাছাড়া স্বয়ং হিউয়েন সাঙই বলেছেন যে, দেবী ছিলেন মহেশ্বরের পত্নী। অর্থাৎ পরবর্তীকালে শিবের পত্নীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করে যে-সব গড়ে উঠেছে তীর্থস্থান, সেই সব তীর্থের সূক্ষ্ম উপাদান ছিল এই প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই।

মা যদি একক হন তাঁর কোন থাকেনা অর্থ। পুরুষও যদি একক হন তাহলে তিনিও হয়ে দাঁড়ান অর্থহীন। সৃষ্টির আদি এবং

জীবনের অন্ত এ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা থেকেই অতীন্দ্রিয় জগৎ সন্ধানে মানুষের অভিযাত্রা। স্থূল বিচারে দেখা যায়, দুই ছাড়া সৃষ্টি নেই, না পুরুষ না রমণী। সেই জন্য মহেন-জো-দড়োর সময় থেকেই যোনি এবং লিঙ্গ নিয়ে কল্পনা। এবং সেই জন্যই শাক্তরা বোধ হয় ৺মাকে আর বিচ্ছিন্ন না রেখে সব সময়ই জুড়ে দেবার চেষ্টা করেছে শিবের সঙ্গে। কারণ, এককভাবে ৺মা যে হলেন শক্তিহীন। তাঁর তখন নেই জন্মদেবার ক্ষমতা। অবশ্য এই অর্থে পাশাপাশি শিব এবং ৺মায়ের কল্পনা নিতান্তই একটা স্থূল ব্যাপার। পরবর্তী কালে এই স্থূল কল্পনাই হয়েছে মহান এক অধ্যাত্ম জগতে উন্নীত। সেখানে শিব ও শক্তি তখন নয় দুই কিছু, একেরই প্রকাশ দুই রূপে। শিব অর্থাৎ সৎ, নিগু´ণ ব্রহ্ম; যখনই তিনি সক্রিয়, তখনই প্রকাশিত প্রকৃতি রূপে। আবার যখন নিগু´ণ তখনই শিব। ৺মা বা শক্তি হলেন সেই শিবব্রহ্মের গুণস্বরূপ, অর্থাৎ জগৎ শিব থেকে অবিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে পরবর্তীকালে কালীরূপ কল্পনায় শিবের বুকের উপর শক্তিকে দাঁড় করিয়ে এই উচ্চকোটীর অধ্যাত্ম চিন্তাকেই প্রকাশ করা হয়েছে ইঙ্গিতে। কিন্তু সেটা আলোচনার বিষয় পরে। এখন যা বলতে যাচ্ছিলাম, সেই আলোচনাতেই আসা যাক। অর্থাৎ দেবীর প্রতীক হিসাবে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পূজা করার রীতি মধ্যযুগে দক্ষযজ্ঞনাশ গল্পের পরই আসেনি আকস্মিকভাবে এদেশে। এর সূক্ষ্মবীজ ছিল প্রাচীনকালে। এবং ক্রমশঃ তা ডালপালা ছড়িয়ে মহীরুহ হয়ে উঠেছিল বেড়ে। ভীমাদেবীর পাশে যে শিবের মন্দির, একান্নপীঠের দেবীর পাশে ভৈরবের অবস্থানেরই সূচনা করছে সে হয়তো। তবে, একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে অবশ্যই, সেটা এই যে, ভীমাদেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্র ভীমাস্থান পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত ছিল কি না কখনও। সেটা অজ্ঞাত। হিউয়েন সাঙের সময় ভারতে স্বীকৃত পীঠস্থান ছিল সাতটি। কিন্তু তান্ত্রিক অর্থে ভীমাস্থান, উড্ডংপর্বত এবং গৌরীশেখর—পীঠ বলে গণ্য ছিল কিনা কোনদিন বলা দুঃসাধ্য এখনও।

কয়েকটি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে আছে চতুষ্পীঠের উল্লেখ। এখন, এই 'পীঠ' পূজার 'বেদী' অর্থে পীঠ না অন্য কোন গুহ্য অর্থ আছে পেছনে, তা পরিষ্কার বোঝার নেই উপায়। বৌদ্ধ সহজয়ান ধারণাতে আছে চতুরানন্দের উল্লেখ—যে আনন্দ হল এক ধরনের যৌন সুখের অনুভূতি. যার উৎপত্তি আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দন ও নখপ্রহারের মধ্যে। বৌদ্ধ সহজয়ান মতে এই ধরনের যৌন সুখ (অধ্যাত্মযৌনতা?) শাশ্বত আনন্দের জগতে পারে নিয়ে যেতে। সহজয়ান গ্রন্থ চতুষ্পীঠতন্ত্রে আছে চার ধরনের পীঠের কথা, যেমন, আত্মপীঠ, পরপীঠ, যোগপীঠ এবং গুহ্যপীঠ। বজ্রসত্ত্ব নানাধরনের যোগিনীদের সঙ্গে, যেমন প্রজ্ঞাপারমিতা, করেছিলেন নানাধরনের সঙ্গম। এই সঙ্গম ছিল সম্ভবতঃ উন্নত কোন অধ্যাত্ম মিলন, কারণ, শিবের শক্তির মত এই প্রজ্ঞাপারমিতাও হলেন আদিবুদ্ধের এক ধরনের গুণের প্রকাশ অর্থাৎ, সৎরূপ শিবের গুণের প্রকাশ যেমন শক্তি, প্রজ্ঞাপারমিতাও তেমনই বুদ্ধের। সুতরাং যোগিনীরূপ এই গুণের সঙ্গে বুদ্ধের সঙ্গমের একটা আধ্যাত্মিক গুহ্যতত্ত্ব থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং বৌদ্ধদের এই রহস্যময় 'পীঠ' শব্দ থেকেই পরবর্তীকালে পীঠের হয়েছে কিনা উদ্ভব বলবে কে ; কিংবা এমনও হতে পারে যে, তীর্থস্থান হিসাবে পীঠের আবির্ভাব হয়েছিল আগেই, বৌদ্ধতন্ত্রে আত্মপীঠ ও পরপীঠের কল্পনা এসেছে তা থেকেই।

অষ্টম শতাব্দীতে, বৌদ্ধদের একটি তন্ত্রগ্রন্থ, হেবজ্রতন্ত্রে, ভারতের চারটি অঞ্চলকে, যেমন, (১) জালন্ধর (২) ওড্‌ডিয়ান (৩) পূর্ণগিরি এবং (৪) কামরূপ, বর্ণনা করা হয়েছে পীঠস্থান বলে। কালিকাপুরাণও বলেছে প্রায় একই ধরনের চতুষ্পাঠের কথা, যেমন (১) ওড্রা (২) জালশৈল (৩) পূর্ণ বা পূর্ণ শৈল এবং (৪) কামরূপ।

কালিকাপুরাণের বর্ণনামতে পশ্চিমে ওড্রা হল দেবী ক্যাতায়নী ও ভগবান জগন্নাথের পীঠস্থান, অর্থাৎ হেবজ্রের ওড্‌ডিয়ান অর্থাৎ উড়িষ্যাতে। উত্তরে জালশৈলে অর্থাৎ জালন্ধরে দেবী চণ্ডী ও

ভগবান মহাদেবের পীঠস্থান। দক্ষিণে, পূর্ণ বা পূর্ণশৈলে অর্থাৎ পূর্ণগিরিতে দেবী পূর্ণেশ্বরী এবং ভগবান মহানাথের পীঠস্থান। এবং কামরূপে দেবী কামেশ্বরী ও ভগবান কামেশ্বরের পীঠস্থান। বৌদ্ধগ্রন্থ সাধনমালাতেও আছে চতুষ্পীঠের উল্লেখ। তবে আগের চারটি পীঠের মধ্যে একটিকে বাদ দিয়ে নতুন একটি পীঠকে করা হয়েছে যুক্ত। যেমন, সাধনমালাতে পীঠস্থানগুলি এই নামের : (১) ওড্ডিয়ান (২) পূর্ণগিরি (৩) কামরূপ এবং (৪) শ্রীহট্ট বা শিরিহট্ট। শ্রীহট্ট হল জালন্ধরের পরিবর্তে নতুন সংযোজন। কিন্তু জালন্ধরকে বাদ দেওয়া হলেও মধ্যযুগের শেষপর্ব পর্যন্ত জালন্ধরের নাম থেকেছে চতুষ্পীঠের মধ্যেই। যেমন, সময়চারতন্ত্রে আছে এই ধরনের পীঠবর্ণনা : অথেদানিং প্রবক্ষ্যামী জপার্থং পীঠমুত্তমম। পূর্ণগিরিশ্চপ্রথমুড্ডিয়ানংদ্বিতীয়কম ॥ জালন্ধরং তৃতীয়শ্চ কামরূপং চতুর্থকম।

মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজলের নাম, আমরা যারা ইতিহাসের ছাত্র নই, জানি তারাও। সম্রাট আকবরের দরবারের অন্যতম এক রত্ন তিনি। বিখ্যাত আইন-ই-আকবরীর লেখক। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে সম্ভবত: এ পুস্তক লিখেছিলেন তিনি। তাঁর কাহিনীতে আছে নগরকোটের কাছে এক পীঠের উল্লেখ, সেই সঙ্গে চতুষ্পীঠের উৎপত্তি সম্পর্কে আশ্চর্য এক গল্প। গল্পটা এইরকম : আবুল ফজল বলেছেন : নগরকোট শহরটা হল পাহাড়ের উপর। এই শহরে দুর্গের নাম কাঙড়া। শহরের কাছে আছে মহামায়ার পীঠ। লোকের বিশ্বাস, এ দেবী হলেন ঐশ্বরিক প্রকাশ। দূর দূর প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা এসে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এখানে। আশ্চর্য কথা এই যে, তাঁদের প্রার্থনা যাতে দেবী শোনেন, সে-জন্য নিজেদের জিব্ কেটে দেবীকে করেন দান। কারো কারো নাকি জিব্ গজিয়ে উঠে কেটে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই। কারো গজায় দু-একদিনের মধ্যেই। চিকিৎসকদের ধারণা, কাটা জিবের জায়গায় নতুন জিব্ পারে গজাতে, কিন্তু এত অল্প সময়ে গজানোটা সত্যি সত্যিই চমকপ্রদ। হিন্দুদের মতে মহামায়া নাকি মহাদেবের পত্নী। এ ধর্মের পণ্ডিতেরা বলেন, মহামায়া হলেন

মহাদেবের শক্তির প্রতীক। গল্প আছে যে, অপমানে আহত হয়ে দেবী নিজেকে নিজেই কেটেছিলেন টুক্‌রো টুক্‌রো করে। তাঁর এই কাটাদেহ পড়েছিল দেশের চারটি স্থানে। মাথা আর কিছু অঙ্গ পড়েছিল কাশ্মীরে, কামরাজের কাছে। দেবীর যে-সব দেহাংশ পড়েছিল এখানে তারই নাম শারদা। কিছু অংশ পড়েছিল দক্ষিণ-ভারতে, বিজাপুরের কাছে। এই অংশগুলি পরিচিত তুলজা বা তুরজা ভবানী নামে। যে সকল অংশ পড়েছিল পূর্বাঞ্চলে, কামরূপের কাছে, তার নাম কামাখ্যা। বাকী যে অংশ পড়ে ছিল, তার নাম জালন্ধরী। এবং সেটাই হল এই জায়গা অর্থাৎ কাঙড়া। জালন্ধরীর কাছাকাছি মাটি থেকে কিছু কিছু জায়গায় উঠে আগুন। তীর্থযাত্রীরা এখানে ভিড় করে, মনের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য নানা জিনিষ দেয় ছুঁড়ে। আগুনের উপর তৈরী করা হয়েছে একটা গম্বুজাকৃতি মন্দির। বিস্ময়াবিভূত দর্শকেরা সেখানে এসে দেখে। অর্বাচীনেরা মনে করে, এটা অলৌকিক কিছু নয়, আসলে নিচে আছে গন্ধকের খনি, তা থেকেই বেরয় আগুন।

আবুল ফজলের গল্পে কিন্তু আছে একটা জিনিষ খুব আশ্চর্য হয়ে ভাববার মত। তিনি বলেছেন—"এ ধর্মের পণ্ডিতেরা বলেন যে, মহামায়া হলেন মহাদের শক্তির প্রতীক।' একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবেন, এটা নয় একটা সাধারণভাবে বলা কথা। যে মাতৃ-রূপা শক্তি অধ্যাত্ম আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আজ আমাদের শক্তি-পূজাকে করে তুলেছে পৌত্তলিকতার ঊর্ধে মহামহিম, সেই অধ্যাত্মতার ইঙ্গিত আছে এখানে। অর্থাৎ ৺মায়ের রূপ যে ব্রহ্মস্বরূপের সগুণ লীলা ছাড়া আর কিছুই নয়, ৺মা যে প্রকৃতিস্বরূপা, সেটাই বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে এক কথায়। অর্থাৎ ৺মায়ের রূপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল সেকালেও। অর্থাৎ লৌকিক বিশ্বাসে ৺মায়ের দেহখণ্ডপাত সম্পর্কে যে ধারণাই থাক না লোকের মনে, মূল সত্য যে একট দর্শনের মধ্যে নিহিত, এ-কথারই ইঙ্গিত আছে এখানে।

আবুল ফজলের গল্প থেকে স্পষ্ট করে যায় বোঝা যে, ষোড়শ

শতাব্দীর শেষকাল পর্যন্ত শাক্ত তীর্থক্ষেত্রে চতুষ্পীঠই ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আর, এই চারটি পীঠের বর্তমান ভৌগলিক অবস্থান হল এই রকম. যেমন—(১) শারদা, উত্তর কাশ্মীরের বর্তমান শারদি, (২) তুলজা ভবানী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ ভাগে (৩) কামাখ্যা কামরূপ এবং (৪) জালন্ধরী, পাঞ্জাবে নগরকোটের কাছে।

বৌদ্ধগ্রন্থ হেবজ্রতন্ত্রে এবং শাক্ত কালিকাপুরাণে চতুষ্পীঠের বর্ণনা ছিল একরকম, যদিও নামের উচ্চারণ ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থ সাধনমালাতেই পীঠের সংখ্যা চারটি থাকলেও পুরনো পীঠের একটিকে বাদ দিয়ে নতুন আর একটি পীঠ গেছে ঢুকে। জালন্ধরের পরিবর্তে এসেছে শ্রীহট্ট বা শিরিহট্ট। আবুল ফজলের বর্ণনাতে দেখছি উড্‌ডিয়ান বা ওড্‌ডিয়ানের পরিবর্তে এসেছে কাশ্মীর। এবং কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও জালন্ধরের পরিবর্তে তিনি যা বোঝাতে চাইছেন তা হল জ্বালামুখী।

আবুল ফজলের লেখা ষোড়শ শতাব্দীর। কিন্তু পীঠস্থান হিসাবে, বা তীর্থস্থান হিসাবে জ্বালামুখী গুরুত্ব অর্জন করেছে অনেক আগেই। যেমন, চতুর্দশ-শতাব্দীর তৃতীয় পাদেই মুসলমান লেখক সামস-ই-সিরাজ আফিফ-এর লেখায় পাই জ্বালামুখীর উল্লেখ। তাঁর মতে, কাফেররা ভিড় ক'রে পূজা করত জ্বালামুখীর। নগরকোটে যাবার পথে ছিল জ্বালামুখী। সুলতান ফিরুজ তুঘলক, যিনি হিন্দুবিদ্বেষের জন্য বিখ্যাত বিশেষ ভাবে, তিনিও নাকি জ্বালামুখী দেখতে গিয়েছিলেন নিজে, এবং স্বহস্তে বিগ্রহের মাথায় ধরেছিলেন সোনার ছাতা। কাফেরদের প্রচারিত এ-গল্পের উল্লেখও করেছেন আফিফ। কারো কারো মতে, ফিরুজ নন, সুলতান মহম্মদ তুঘলকই নাকি ছত্র ধরেছিলেন জ্বালামুখীর পীঠের উপর। কিন্তু আফিফ এ সব গল্পকথাকেই উড়িয়ে দিয়েছেন মিথ্যে বলে।

পরিবর্তিত নাম ও নতুন পীঠের উল্লেখ যেমন রীতিমত একটা বিভ্রান্তিকর ব্যাপার, তেমনই সহায়ক কয়েকটি সমস্যার সমাধানেও। যেমন, আবুল ফজল তাঁর চতুষ্পীঠ বর্ণনায় আগের চতুষ্পীঠের পূর্ণগিরির

উল্লেখ না করে করেছেন বিজাপুরের। পূর্ণগিরি সম্ভবতঃ বিজাপুর অঞ্চলেই কোথাও। হায়দরাবাদ, বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের ওসমানবাদের দক্ষিণে, তুলজপুরে আছে ভবানী মন্দির। দেবী ভবানীর প্রভাব ছিল এত যে, হাজার হাজার লোক, নানা জাতি নানা বর্ণের, পূজা করত দেবীকে। শিবাজী পর্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ভবানীকে এত যে, তুলজপুরের ভবানী মন্দিরে যেহেতু যাওয়া সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে, সেইজন্য জবলির কাছে যখন তিনি করেছিলেন দুর্গ তৈরী, তখন দেবী ভবানীরও এক মন্দির তৈরী করে নিয়েছিলেন সেখানে।

প্রথমদিকের চতুষ্পাঠ বর্ণনায় কাশ্মীরে শারদাপীঠের ছিল না বটে উল্লেখ, তবে আবুল ফজলের আগেই যে পীঠ হিসাবে শারদাদেবীর মূল্য ছিল যথেষ্ট, তার প্রমাণ আছে একাদশ শতাব্দীতে লেখা অলবিরূণীর রচনাতে। অলবিরূণী বলেছেন—"কাশ্মীরের রাজধানী থেকে দু তিন দিন, বোলোর পর্বতের দিকে হেঁটে গেলে সেখানে আছে কাঠের এক মূর্তি, যাকে বলে শারদা। অসংখ্য লোকে ভক্তি করে এই দেবীকে, বহু তীর্থযাত্রী ভিড় করে তাঁকে দেখার জন্য।" কল্‌হণের রাজতরঙ্গিনীতেও আছে শারদার উল্লেখ। কিষেণগঙ্গা ও কঁক্‌তোরি নদীর সঙ্গমের কাছে, যেখানে আছে শারদির ধ্বংসাবশেষ, সেখানেই ছিল শারদামন্দির। পুরনো শারদামন্দিরের জায়গায় নতুন মন্দির উঠেছে এখন গুষ-এ বা ঘোষ-এ।

কয়েকটা জিনিষ পরিষ্কার হচ্ছে এ-থেকে, যেমন, প্রথমতঃ, তীর্থস্থান হিসেবে পীঠের উৎপত্তি হয়েছে ধীরে ধীরে। দীর্ঘদিন ছিল চতুষ্পীঠ। তবে চতুষ্পীঠের পেছনে ছিলনা এমন গল্প, যা সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারে নির্দিষ্টসংখ্যক পীঠকে। সুতরাং সময়ের ফেরে এক পীঠের জায়গায় এসে গেছে আর এক পীঠ। মনে হয়, এই নাম পরিবর্তনের কারণ হল বিশেষ সময়ে বিশেষ তীর্থের মান বৃদ্ধি। সেটা যে কিভাবে বৃদ্ধি পায়, কেমন করে, বলা শক্ত। যেমন, বাংলাদেশে সন্তোষী ৺মায়ের পূজার প্রচলন হয়েছে এখন, ছিল না আগে। বাবা তারকনাথের ছবির পর তাঁর ভক্ত সংখ্যা বেড়ে হয়েছে অনেক। এই

ধরনের কোন এক সূত্র ধরেই সম্ভবতঃ কোন কোন সময় বিশেষ বিশেষ তীর্থক্ষেত্রের মহিমা পেয়েছে বৃদ্ধি। এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যে এক তীর্থের পরিবর্তে আর এক তীর্থের গুরুত্ব বেড়েছে বেশী। ধরুন, যে-লেখক ওড্ডিয়ানের পরিবর্তে লিখলেন শ্রীহট্টের কথা, তিনি হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে ঐ অঞ্চলের কোন দেবীর সুযোগ পেয়েছিলেন এমন মাহাত্ম্য দেখার যে, তার কাছে ওড্ডিয়ানের কথা জানা থাকলেও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে ওড্ডিয়ানের স্থানে তুলে দিয়েছেন শ্রীহট্টের কথা। আবার কাশ্মীর এবং দক্ষিণভারতের তুলজাতে গিয়ে শারদাদেবী আর ভবানীর প্রভাবে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন কোন লেখক যে, তিনি ওডডিয়ান বা শ্রীহট্ট দুয়েরই কথা ভুলে গিয়ে তার বদলে লিখে দিয়েছেন কাশ্মীরের শারদা আর দক্ষিণ-ভাবতের তুলজা ভবানীর কথা।

তবে, প্রশ্ন হল, চারটি পীঠের সংখ্যা কেন পাল্টালেন না লেখক? এর অর্থ হয়তো এই যে, যে-কোন কারণেই হোক, চারপীঠ সম্পর্কিত কাহিনী জনচিত্তে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল এমন যে, পীঠের সংখ্যা বাড়িয়ে অর্বাচীন হতে চাননি কেউই। তবে এ-থেকে একটি জিনিষ স্পষ্ট যে, পীঠসংক্রান্ত ছিলনা কোন universal law।

দ্বিতীয় যে জিনিষটি উপরে উল্লেখ করা চতুষ্পীঠসংক্রান্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সেটা হচ্ছে এই যে, একাদশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে, এমন কি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত, সতীর দেহাংশকে কেন্দ্র করে পীঠস্থান গড়ে ওঠাব কাহিনী করেনি রূপলাভ। তা যদি করত, তাহলে অলবিরূনীর লেখা (একাদশ শতাব্দী, প্রায় ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ) বা সামস-ই-সিরাজ আফিফের লেখাতেই (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত) এ-সম্পর্কে ইঙ্গিত পেতে পারতাম একটুও। কিন্তু তা নেই। আবার ষোড়শ শতাব্দীতে, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে এর উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, অন্ততঃ তাঁর লেখার আগেই সতীর দেহকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়ে গেছে পীঠস্থান গড়ে ওঠার কাহিনী। তবে, সে পীঠস্থান নয় একান্ন, কেবল মাত্র চারটি। এবং

তাহলে, আরও একটি জিনিষ স্পষ্ট হতে চায় এই যে, সপ্তদশ শতাব্দীর আগে একান্নপীঠ সংখ্যায় পীঠের হয়নি উদ্ভব।

তৃতীয়তঃ, এ-থেকে এই রকম করা যায় একটা ধারণা, সতীর দেহাংশকে কেন্দ্র করে পীঠস্থান বৃদ্ধি পাবার কারণ হল এই যে, ক্রমশঃ লোকে দেশের বিভিন্ন অংশে নানা জাতির নানা মাতৃ-আরাধনার বিষয় পেরেছে জানতে, এবং সেই নানা দেবীকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে আনার জন্য সতীর দেহপাত সম্পর্কিত গল্পের সঙ্গে দিয়েছে জুড়ে। কারণ, অঙ্গাংশকে কেন্দ্র করে পীঠসংখ্যা বাড়িয়ে যাবার সুযোগও মিলেছে এতে। যেমন, দেহকে একটু ছোটছোট করে বিচ্ছিন্ন করলেই হয়ে গেল। দেহকে আরও ছোট করে, একটা জীববিজ্ঞানসম্মত নাম দিয়ে যখন বিচ্ছিন্ন করা যায়নি আর, তখন আরো নতুন আবিষ্কৃত আঞ্চলিক দেবীকে কেন্দ্রীয় কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অঙ্গ বাদ দিয়ে করা হয়েছে অঙ্গভূষণপাতরূপ কাহিনী। চেষ্টা হয়েছে গড়ে তোলার উপপীঠ। এবং এই ভাবেই পীঠসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে একে একে।

চতুর্থতঃ, চতুষ্পীঠসংক্রান্ত কাহিনী থেকে আর একটা জিনিষ স্পষ্ট যে, চারটি পীঠের মধ্যেও সময়ান্তরে নামের হেরফের ঘটুক না যতই কেন, একটি পীঠ কিন্তু সকল লিষ্টেই প্রায় সমান, তার নাম কামরূপ-কামাখ্যা। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, মাতৃ-আরাধনায় যে-কোন কারণেই হোক না কেন, কামরূপের একটা বিরাট মূল্য আছে চিরকালই। এর কারণ কি তাহলে এই যে, মাতৃ-আরাধনার উৎপত্তি—শক্তি সম্পর্কে, অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে রহস্যময় বোধ থেকে হলেও, এর মূলাধার হল তন্ত্র? যে তন্ত্র, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির বিশ্বাস, এসেছে চীনদেশ, অর্থাৎ হিমালয় পাদদেশসংলগ্ন দেশ থেকে? এবং হিমালয়ের একটা উৎক্ষেপই যে আসামের এই পার্বত্য অঞ্চল, সে বিষয়ে নেই সন্দেহ বিন্দুমাত্র।

দেখা যাচ্ছে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই আসামের এই অঞ্চলে ছিল মাতৃ-আরাধনার বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিই তন্ত্রসাধনায় গুহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা কে জানে—এবং সেই পুরানো পদ্ধতি

থেকেই কামরূপ নামেরও হয়েছে কিনা উৎপত্তি তাই বা বলবে কে। একটু যদি খবর নেন, তাহলেই দেখবেন যে, আসাম অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ৺মায়ের পূজার ছিল ব্যাপক একটা প্রচলন।

চুটিয়াদের কথাই ধরুন না কেন, ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়ে 'দেওরি' নামে নিজেদের পূজারী দিয়ে ৺মায়ের বিভিন্নরূপের পূজা করত তারা। ৺মায়ের যে রূপটা ছিল তাদের কাছে বেশী প্রিয়—সেটা হল 'কেশাইখাতি', অর্থাৎ কাচামাংসভোজী। চুটিয়া বা ছুতিয়াদের মতে বিশ্বস্রষ্টা পরমপুরুষের নাম হল কুন্দী। এই কুন্দীর প্রকৃতি বা শক্তি হলেন মা-মা, অর্থাৎ মহামায়া। এই মহামায়াই হলেন কেশাই-খাতি বা ক-ছাই খাতি। এঁকে তাম্রেশ্বরীও বলে অনেকে। বড় কাছারী জাতের লোকেরা বলে মহামায়া রণচণ্ডী বা কা-ছাইখান্তি। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ক্রীট দ্বীপের ছাইফ্রাস দেবীও পরিচিত ছিলেন তাম্রেশ্বরী নামে। আদিমকালে আদি মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে যে কি ধরনের ছিল যোগাযোগ, বলা কষ্ট বর্তমানে। সে-যাই হোক—নরবলি দিয়ে পূজা করা হত এই ৺মাকে। অহমেরা যখন আসাম জয় করে, যাদের নাম থেকেই 'আসাম' শব্দ, তখনও ছিল এই নরবলি, যদিও সামান্য একটু পরিবর্তন এনেছিলেন রাজারা। যেমন, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষদেরই বলি দিতে দেওয়া হত শুধু, অন্য কাউকে নয়। কিন্তু সব-সময় সেই ধরনের দণ্ডিত মানুষ না মিল্‌লে? সে কারণে বিশেষ একটা উপজাতি ছিল চুটিয়াদের মধ্যেই, যাদের থেকেই লোক নেওয়া হত এ জন্য। বিনিময়ে বিশেষ কতকগুলি সুবিধা দেওয়া হত এদের। যেমন, যে লোকটা নির্বাচিত হত বলির জন্য, তাকে প্রতিপালন করা হোত বিশেষ রকম যত্নে। রাজকীয় ভোজ দেওয়া হত, যাতে তার স্বাস্থ্যের হয় উন্নতি, মা সন্তুষ্ট হন নধর নরমাংস দেখে।

শুধুমাত্র চুটিয়া নয়, ত্রিপুরী, কোচ, কাছারী আর জয়ন্তী, সব উপজাতিই ৺মায়ের পূজায় নরবলি দিত একদিন। এই নরবলি কি নিছকই একটা বর্বর মানসিকতার প্রকাশ, না এতে ছিল গুহ্য কোন অর্থ? কারণ, বিশেষ এক ধরনের শৈব আর শাক্তরাও দেখি বিশ্বাস করতেন

এই ধরনের বলিতে। ভবভূতির মালতিমাধবে আছে কাপালিকদের কথা। এঁরা ছিলেন ভগবান শিবমল্লিকার্জুনের ভক্ত। থাকতেন শ্রীপর্বতে অর্থাৎ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কারনুল জেলার শ্রীশৈলে। শিবের ভক্ত হয়েও করতেন মা চামুণ্ডার পূজা। শ্রীপর্বতে কাপালিকব্রত উদ্‌যাপনরতা এক যোগিনীর কথা বলেছেন ভবভূতি। আবার অঘোরঘণ্ট নামে এক কাপালিক, যিনি তাঁর শিষ্যা কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে করতেন ভয়াবহ কাপালিকব্রত উদ্‌যাপন—সে কথাও আছে তাঁর কাহিনীতে। এঁরা শ্রীপর্বত থেকে এসে থাকতেন গোয়ালিয়রের পদ্মাবতীর কাছে, মহাশ্মশানে, চামুণ্ডা মন্দিরে। বলি দেওয়ার জন্য সেখানেই তাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন মালতীকে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ভয়াবহ কার্যের উদ্ভাবক হওয়া সত্ত্বেও জনচিত্তে কিন্তু এঁদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ থেকেই জানা যায়, এই জাতীয় শিবশক্তির উপাসকদের প্রভাব ছড়িয়ে ছিল সারা ভারতবর্ষে। যেমন জালন্ধরে, অহিচ্ছত্রে, সুদূর দক্ষিণের মলকূটে মালবে, বারাণসীতে, নর্মদা অঞ্চলের মহেশ্বরপুরে, বালুচিস্থানের পূর্ব মাক্রানে, আফগানিস্থানের বন্নুতে, এমন কি মধ্য এশিয়ার খোটানেও।

কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই আদিম অধিবাসীদেরই কোন দেবী কিনা, কে জানে, কারণ, কামরূপের মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে আছে যে গল্প, তাতেও দেখা যায় যে, নরবলি দিয়েই হয়েছিল এর প্রতিষ্ঠা। কমপক্ষে ১৪০ জন মানুষের মাথা তাম্রপাত্রে উপহার দেওয়া হয়েছিল দেবীকে। কামরূপ অঞ্চলে এধরনের পদ্ধতি অনেকদিন আগেই ছিল বলে বিশ্বাস। শোনা যায়, ভোগী নামে একদল লোক বাস করত কামরূপে। 'অই' নামে এক দেবীর কাছে স্বেচ্ছায় তারা করত প্রাণ বিসর্জন। 'অই' বাস করতেন গুহায়। ভোগীরা নাকি শুনতে পেত অই-এর ডাক। অই-এর ডাক শুনলেই সেই ব্যক্তি চিহ্নিত হয়ে যেত বিশেষ ভাবে। তখন তার বিশেষ সম্মান সমাজে। যা খুশি তাই করতে পারে। যে-কোন রমণীকেই ভোগ করতে পারে ইচ্ছামত। কিন্তু অই-এর বাৎসরিক পূজা এলেই তার দিন শেষ। তখন বলি।

এইসব দেখে শুনে মনে হয়, কামরূপের যে দেবী, তিনি বস্তুতঃ এই আদিম অধিবাসীদেরই কোন আরাধ্যা। এবং তাঁর নামের উৎপত্তিও সেই আদিম অধিবাসীদের নামেই। যেমন, পণ্ডিতদের ধারণা, অষ্ট্রীক শব্দ 'কামোই' যার অর্থ দৈত্য; 'কামোইত' যার অর্থ শয়তান; 'কোমিন' যার অর্থ সমাধি; 'কুমেত' যার অর্থ খাসিয়া ভাষায় মৃতদেহ; 'কমরু' সাঁওতালদের কোন দেবতা, প্রভৃতি শব্দ থেকেই এসেছে কামাখ্যা। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, দেবীর অঙ্গপাত থেকে কামাখ্যার নয় উদ্ভব। এবং, যেহেতু কোন কারণে এখানকার কোন আঞ্চলিক দেবী, তাঁর ভয়াবহ মহিমায় আচ্ছন্ন করেছিলেন এ অঞ্চল, সেই কাহিনী বাইরে প্রচারিত হওয়ার ফলেই এঁকে দেওয়া হয়েছে পীঠস্থানের গুরুত্ব, এবং যেহেতু পীঠস্থানজাতীয় কল্পনার উৎস স্থল মাতৃশক্তির প্রতীক যোনি প্রথম, পরে স্তন ইত্যাদি, সেইজন্য দেবীর যোনিদেশ এখানে পাতিত করে, মাতৃশক্তির পীঠস্থান হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশীগুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ স্থানকেই। এবং তারই ফলে চতুষ্পীঠ-সূচীর প্রত্যেকটিতেই কামরূপ কামাখ্যার নাম থেকেছে প্রত্যেকবার।

তবে একটা জিনিষ কিন্তু এই প্রসঙ্গে অবাক হবার মতই। সেটা এই, প্রভাবশালী এই যে মাতৃপীঠ, এর নাম কিন্তু মহাভারতে (যদি এর রচনাকাল চতুর্থ শতাব্দীও হয়) নেই মোটেও। মহাভারতের বনপর্বে, তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে আছে কামরূপের কাছাকাছি গৌরীশেখর পর্বতে স্তনকুণ্ডের উল্লেখ, কিন্তু কামাখ্যার নেই নাম। অথচ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে, এলাহবাদে, সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভগাত্রে আছে কামরূপের বর্ণনা। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে কিছুদিনের জন্য ছিলেন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের (৬০০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ) দরবারে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে তাঁর রচনায় যদিও আছে ভীমাদেবীর উল্লেখ, পূর্ব সীমান্তের কামরূপ কামাখ্যা বিষয়ে তিনি একেবারে নীরব। কেন? ব্যাপারটা কি এই যে, তিনি ছিলেন অহিংসাপূজারী বৌদ্ধ? কামরূপে আদিম পদ্ধতিতে নরবলি প্রথা, সেইজন্য কি এ-সম্পর্কে উল্লেখ করেননি

কোন? কিংবা হর্ষবর্ধনের মিত্র হিসেবে রাজা ভাস্করবর্মণ কামরূপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নিয়েছিলেন এমন ব্যবস্থা যে, সাময়িকভাবে কামরূপের মাহাত্ম্য চাপা পড়ে গিয়েছিল বৌদ্ধধর্মের অন্তরালে? ভাস্করবর্মণের প্রভাবে যদি কামরূপের প্রভাব হয় নষ্ট, সেটা ভিন্ন কথা, নতুবা হিংসার প্রাধান্য থাকার ফলে কামাখ্যার উল্লেখ করবেন না হিউয়েন-সাঙ, এরকম আশা করা অন্যায়, কারণ তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে পেশোয়ারের ভীমাস্থানে, ভীমাদেবীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, যদিও নেই তাতে হিংসা সংক্রান্ত কোন উল্লেখ, তবুও এর সঙ্গে শৈব যোগীনদের সম্পর্ক দেখে মনে হয়, কাপালিক প্রাধান্য থেকে মুক্ত ছিল না এ অঞ্চলও, এবং স্বভাবতই নরবলিদান প্রথা থেকেও। সুতরাং, কামাখ্যা সম্পর্কে হিউয়েন সাঙের নীরবতা সত্যি সত্যি বিস্ময়ের।

সে যাই হোক না কেন, চতুষ্পাঠের যে ইতিহাস, এবং বিভিন্ন লেখকের চতুষ্পীঠের যে বর্ণনা, তা থেকে (যা আরম্ভ হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে) অন্ততঃ এইটুকু যায় বোঝা যে, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কামরূপ-কামাখ্যার জয়যাত্রা ছিল অব্যাহত।

সর্বশেষে, চতুষ্পীঠের ইতিহাস আমাদের কাছে আর যে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিচ্ছে অত্যন্ত, তা হল এই যে, এ থেকেই আমরা জানতে পারছি গন্ধার, জালন্ধর, কাশ্মীর, প্রভৃতি উত্তরপশ্চিম ভারতে এবং উড্ডিয়ান বা উড়িষ্যাতে তন্ত্রসাধনার ব্যাপকতার কথা। হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতেও গন্ধারে দেখতে পেয়েছিলেন শক্তিসাধনার প্রাবল্য। উড্ডিয়ানের মানুষের মধ্যেও তিনি দেখেছিলেন তন্ত্রের প্রতি প্রচণ্ড এক অনুরাগ। উড্ডিয়ান সম্পর্কে তাঁর নিজের কথা এই যে—'যদিও ভীরু স্বভাবের এখানকার লোকগুলো, প্রতারক ধরনের, তবু জাদুবিদ্যা শিক্ষায় বড় আগ্রহী, জাদু-ক্ষমতা যেন পেশাগত।'

উড্ডিয়ান, অর্থাৎ উড়িষ্যাতে যে পড়েছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের প্রভাব, একথা জানেন আজকের প্রায় সব পণ্ডিতই। এবং উড়িষ্যার জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা হল বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতীক। এবং এই কারণেই বৌদ্ধ দেবদেবী—মারিচী, কুরুকুল্লা (তন্ত্রসার পুস্তকের কালীর

অনুরূপ) লোকেশ্বর ইত্যাদি, লোকের পূজা পেত শাক্তদেবীর মতই। উড্ডিয়ানের শাসক ইন্দ্রভূতি, স্বয়ং ছিলেন বিখ্যাত তন্ত্রগুরু। 'জ্ঞানসিদ্ধি' নামে তন্ত্র-গ্রন্থের লেখক তিনি, এই ধরনের বিশ্বাস। বৌদ্ধ প্রচারক পদ্মসম্ভব, যিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন বাঙ্গালী বৌদ্ধপণ্ডিত শান্তরক্ষিতকে নিয়ে, রাজা ইন্দ্রভূতি ছিলেন যোগাচার-পদ্ধতির প্রচারক সেই পদ্মসম্ভবের পিতা। রাজার সহোদরা ভগ্নিও ছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্র পারঙ্গমা।

বৌদ্ধশাস্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্র, উড্ডিয়ানে ছিল কি ভাবে, কতদিন, আমার কাছে অজ্ঞাত সবটাই, তবে প্রচ্ছন্নভাবে যে এখনও আছে (যেমন, সাধারণ বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের নানা আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আজও রয়েছে বৌদ্ধ-তন্ত্রাচারের প্রভাব) সেবিষয়ে নিজে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু উত্তরপশ্চিম ভারতে এই তন্ত্র মার খেতে থাকে একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই। যদি ধরে নেই গন্ধার অবধি, তাহলে বোধহয় দশম শতাব্দী থেকেই, কারণ, তখন থেকেই মুসলমানদের ক্ষমতা বেড়ে উঠতে থাকে এখানে।

বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন নাকি খুব ভাবসাব দেখে? শেষপর্যন্ত মূল কাহিনীতেই ঢুকব কিনা সে বিষয়েই হয়তো সন্দেহ দেখা দিচ্ছে আপনার। কিন্তু, না, চট করে যেন অধৈর্য হয়ে পড়বেন না এত বেশী। গালগপ্প লেখা তো সহজ, সত্যকে উদ্ধার করাই হল কঠিন। অলৌকিক গালগপ্পে নিপীড়িত দুবল মানুষের ভাবাবেগ একটা সাময়িক সান্ত্বনা পায় বটে, কিন্তু সেটা হল এক ধরনের অপরাধ। যাঁরা মানুষের দুর্বলতার সুযোগে এ-ধরনের গালগল্প দেন ছুঁড়ে—অপরাধ তাঁদের এবং যাঁরা তা গ্রহণ করেন, তাঁদেরও। সত্য একটু নির্মম বটে, কিন্তু কবির কথামত—'সে কাহারে করেনা বঞ্চনা।' একান্নপীঠ যদি একটা গালগপ্পের ব্যাপার হয়, এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা যদি তাকে দেয় প্রকাশ করেও, তবু আপনার তাতে ক্ষতি নেই। ক্ষতি হবে তীর্থে তীর্থে কিছু পাণ্ডার, আর ক্ষতি হবে ধর্মের নামে অলৌকিক গুল-গপ্প লিখিয়ে লেখকদের। আমি আগেও বলেছি, বলছি এখনও,

আমি নিজে নই সে দলের। তাই বলে যে অতীন্দ্রিয় জগতে আমার নেই আস্থা, তাও নয়। বরং আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি বস্তুর অতীত এক জগতেই। অদ্ভুত এক বাক্যের অতীত জগৎ সেটা। সেখানে অনন্ত ইচ্ছাশক্তি কুলকুণ্ডলিতে থাকে ঘুমিয়ে। যদি তাঁকে জাগরিত করা যায় তাহলে করা যেতে পারে অসাধ্য সাধন। সেইজন্যই, তন্ত্রের অধ্যাত্মতায় ও ধর্মের সারে আমি যত করি বিশ্বাস, ততই অবিশ্বাস করি বহিরঙ্গ প্রসাধনে। এ-এক আশ্চর্য আন্তর সাধনা— যাতে প্রয়োজন হয় অন্তরের গভীর ঘন জগতে একাগ্রচিত্তে দৃষ্টিপাত, অন্তরের অসীমতায় বিশ্বাস। যদি দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখেন, তাহলে এ পৃথিবীতে মিথ্যে নয় কিছুই। মানসে যদি সৃষ্টি হয়, বাস্তবেও তা সত্য। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র জগতই একটা মানসলীলা। সত্য হিসেবে যা দেখছেন, আপনি দেখছেন বলেই তা সত্য। যদি না দেখেন? তাহলেই অসত্য। আপনি চোখ বুজলে পৃথিবীর থাকে না অস্তিত্বই। দৃষ্টির ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করলে যেমন থাকেনা দৃশ্য, তেমনি রসনা, নাসিকা, কর্ণ, ত্বক বন্ধ করলে থাকেনা স্বাদ গন্ধ শ্রুতি অনুভূতি। তাহলে থাকে না কিছুই। সবই ইচ্ছা, মানসলীলা। আপনি যদি গভীরভাবে ডুবে থাকেন পঠনপাঠনে, তাহলে দেখবেন, পারিপার্শ্বিক নেই আপনার কাছে। যদি তাকিয়ে থাকেন সমস্ত অনুভূতি মেলে, তা'হলে দেখবেন আছে সবই। এ-সবই জানবেন অদ্ভুত এক মানসক্রিয়া। সুতরাং মানস-জাত গল্পই সত্য, সেই যে রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাতে বলেছিলেন, 'যা রচিবে তাই সত্য তুমি, কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' কিন্তু এই সত্য অনুভব করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা মানস-ক্রিয়ার গোপন তথ্য ভেদ করেছেন হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুরে ডুব দিয়ে। কিন্তু নিজের অন্তর্লোকে সত্যের খনি থাকা সত্বেও যাঁরা ব্যবহারিক জগতের সত্যের সঙ্গে লজিক্যাল সম্পর্কে যুক্ত, তাঁদের পক্ষে ব্যবহারিক সত্যাসত্যই বড় জিনিষ, অধ্যাত্ম সত্য নয়। এবং সেইক্ষেত্রে যদি ব্যবহারিক লজিকে থাকে ত্রুটি, তাকে সত্য বলে আকড়ে ধরলে ব্যর্থতা হবে অনিবার্য। এবং

যেহেতু আমি জানি, আপনি, আমি, রাম, শ্যাম, যদু এবং মধু, সব ব্যবহারিক জগতেরই লোক, সুতরাং পার্থিব বিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্য ঘটনাকে বিচার বিশ্লেষণ করেই চলতে হবে আমাদের। সুতরাং সামান্য আর একটু ধৈর্য ধরতেই হবে আপনাকে। আর সামান্য দু-একটা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, তার পরই আসব মূল কাহিনীতে, সতীর কথায়, যা থেকে উৎপত্তি একান্নটি মহাপীঠের। সুতরাং আর সামান্য একটু সময়, অত্যন্তই অল্প, বোধহয় আধঘণ্টার বেশী হবেনা কোনমতে।

সেই যে পীঠ সম্পর্কে বলছিলাম। সেই পীঠ সম্পর্কেই আরো দু-একটি কথার পর আমরা যাব মূলে, কাহিনীতে। হ্যাঁ, শুনুন তবে : চারটি পীঠের কথা বলেছি আমরা। পীঠগুলো ছিল ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পুব এবং পশ্চিম সর্বত্রই ছড়িয়ে। কিন্তু যাঁরাই লিখুন না কেন এ-সব অঞ্চলে চতুষ্পীঠের কথা, তাঁরা যে৺মায়ের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র সম্পর্কে নির্ভুল ছিলেন না একেবারে, তা বোঝা যায় তাঁদের বর্ণনার পার্থক্যেই। শুধু নয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র, ক্ষেত্রের সংখ্যা, অর্থাৎ পীঠসংখ্যা সম্পর্কেও তাঁদের ছিল না কোন সঠিক ধারণা। যেমন ধরুন না, কালিকাপুরাণের কথাই যদি ধরি, কালিকাপুরাণ দিয়েছে চতুষ্পীঠের বর্ণনা, যাতে আছে (১) কাত্যায়নীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হিসেবে ওড্রা, (২) চণ্ডীর ক্ষেত্র হিসেবে জালশৈল, (৩) পূর্ণেশ্বরীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হিসেবে পূর্ণশৈল এবং (৪) কামেশ্বরীর ক্ষেত্র হিসেবে কামরূপ। অথচ এ পুরাণেরই অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে ভিন্ন ধরনের বর্ণনা। এতে পীঠসংখ্যা বেড়ে হয়েছে সাত। অবশ্য আগের চতুষ্পাঠ বর্ণনার চারটি পীঠের পরিবর্তন হয়নি কোন, শুধুমাত্র নামের ক্ষেত্রে ঘটেছে সামান্য একটু হেরফের, এই যা।

আমাদের দেশে লেখকদের আছে অদ্ভুত একটা মানসিকতা, বিশেষ করে ধর্ম-কাহিনীর লেখকদের। নিজের নাম সম্পর্কে এক অদ্ভুত অনীহা। উৎকৃষ্ট কোন শিল্পরচনা করেও তাঁরা তা আগের কোন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে নির্বিকার ভাবে দিয়েছেন ঢুকিয়ে। নিজের স্বরূপ প্রকাশের সম্ভাবনাকেও সম্পূর্ণভাবে দিয়েছেন বিলুপ্ত করে। পণ্ডিতদের ধারণা, মহাভারতের

মধ্যে ঢুকে গেছে এমন অনেক রচনা, যে-রচনা স্বীয় নামে থাকলে লেখক শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেঁচে থাকতেন অক্ষয় কীর্তিতে। কিন্তু অবলীলাক্রমে সে সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিতে কালিকা-পুরাণের ক্ষেত্রেও ঘটেছে কিনা সেরকম কিছু—বলবে কে ?

সময়ের সঙ্গেসঙ্গে হয়তো আরও নানা আঞ্চলিক দেবদেবীর কথা শুনেছেন লেখকেরা, এবং তাঁদের একটা কেন্দ্রীয় ধর্ম-ভাবনার মধ্যে আনার জন্য পূর্বের প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মধ্যে দিয়েছেন ঢুকিয়ে। কালিকাপুরাণে পীঠের সংখ্যা বেড়ে যাবার এটাই হয়তো ভাববার মত কারণ।

তা, কারণ হোকনা যা-ই কেন, কালিকাপুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা যে বর্ণনা পাই পীঠের, তা হল এই রকম : যেমন (১) দেবীকূট (বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বর্তমান বানগড়)। এখানে পড়েছিল দেবীর পদযুগল। দেবীর নাম মহাভাগা। (২) উড্ডিয়ান (উড়িষ্যা)। এখানে পড়েছিল দেবীর দুই জঙ্ঘা। দেবীর নাম কাত্যায়নী। (৩) কামগিরি (কামরূপ)। এখানে পড়েছিল দেবীর যোনিদেশ। দেবীর নাম কামাখ্যা। (৪) কামরূপ সীমান্তের কোন স্থান। এখানে পড়েছিল দেবীর নাভি। দেবীর নাম ডিক্করবাসিনী। (ডিক্করবাসিনীর মন্দির আছে শাদিয়ার কাছে দিক্রঙে) (৫) জালন্ধর। এখানে পড়েছিল দেবীর স্তনযুগল। দেবীর নাম চণ্ডী। (৬) পূর্ণগিরি। এখানে পড়েছিল দেবীর গর্দান এবং দুই স্কন্ধ। দেবীর নাম পুর্ণেশ্বরী। (৭) কামরূপের অন্য এক সীমান্ত। এখানে পড়েছিল দেবীর মস্তক। দেবীর নাম ললিতকান্তা। (আসামে আছে তিনটি পাহাড়ী নদী—সন্ধ্যা, ললিতা এবং কান্তা। গৌহাটির কাছ থেকে খুব দূরে নয়। সম্ভবতঃ স্থানটি কোথাও এখানেই।)

কালিকাপুরাণের এক অংশে, ৬৪ অধ্যায়ে আছে চতুষ্পীঠের কথা। কিন্তু দেবীর অঙ্গপতনহেতু যে উৎপত্তি এই সব পীঠের, এমন কোন কথা নেই সেখানে। ষোড়শ শতাব্দীতে আইন-ই-আকবরী থেকেই জানা যাচ্ছে প্রথম যে, দেবীর দেহাংশ থেকে চতুষ্পীঠের উৎপত্তি। অথচ

কালিকাপুরাণের ভিন্নঅংশে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি, দেবীর দেহাংশপাত থেকে সপ্তপীঠের উদ্ভব।

ব্যাপারটা যে রীতিমত গোলমেলে, সন্দেহ নেই তাতে। সম্ভবতঃ দেহাংশপাত থেকে পীঠস্থানের বর্ণনা পরবর্তীকালের যোজনা। অথচ রচনা হিসাবে কালিকাপুরাণ অনেকদিন আগের। পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিঃসংশয়, দশম শতাব্দীর পরে এ পুরাণ (যথার্থ অর্থে উপপুরাণ) রচিত হয় নি কখনও।

একটা বিষয় সম্পর্কে যদি শাস্ত্রগ্রন্থই করে এমন ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি, তাহলে? সে বিষয় সম্পর্কে মনের মধ্যে শ্রদ্ধা জন্মায় কি করে, বলুন দেখি? অথচ দেখুন, একান্নপীঠ সম্পর্কিত কাহিনীর উপর আমাদের বিশ্বাস কি অগাধ! সাধারণ একটা ঘটনা, যদি নিজেরাই করেন বিচার, তাহলেই বুঝবেন গুরুত্বটা পরিষ্কার হচ্ছে কেমন। ধরুন, দক্ষিণেশ্বরও কালীবাড়ী, কালীঘাটও। শনি মঙ্গলে দুই মন্দিরে ভিড়ের বিচার করুন? পাণ্ডার উৎপীড়ন, তবু ভিড়ে ভেঙে পড়ছে কালীঘাট। ৺মায়ের একটু স্পর্শ পেতে প্রাণান্তকর ভিড়ের মধ্যেও মানুষ ছুটছে গর্ভগৃহে। কেন? ৺মায়ের সঙ্গে যুক্ত আছে একান্নপীঠের কাহিনী, সেইজন্য। সতীর দক্ষিণপদের চার আঙ্গুল পড়েছিল এখানে, সেটাই কারণ।

দক্ষিণেশ্বরেও ভিড় নেই তা নয়। তবে কালীঘাটের মত তেমন নেই। দক্ষিণেশ্বরে কিছু লোক যায় বেড়াতে, গঙ্গা দেখতে, আবার সেই সঙ্গে পূজা দিতে, অর্থাৎ এক সঙ্গে রথ দেখতে ও কলা বেচতে। কালীঘাটে নিসর্গ নেই এমন কিছু, যে, রথ দেখা ও কলা বেচা দুই-ই করা যায় এক সঙ্গে। তবুও সেখানে ভিড় হয় একটা অলৌকিক কাহিনী যুক্ত আছে সেইজন্য। যতটুকু ভিড় হয় দক্ষিণেশ্বরে ততটুকুও হত না, যদি না রামকৃষ্ণের মত কোন মহাপুরুষ করে যেতেন একে সিদ্ধ পীঠ। কালীমন্দির আছে এ দেশে অজস্র। লোকের অবশ্য কালী-মন্দির সম্পর্কে শ্রদ্ধারও নেই কোন অভাব। সামনে পড়লে মাথা নোয়ায়, একটা দুটো পয়সা দেয়, কিন্তু ভিড় করে না সর্বত্র। কারণ,

সর্বত্রই নেই কোন আলৌকিক কাহিনী জড়িত। অথচ যে অলৌকিক কাহিনীর জন্য কালীঘাটে এত ভিড়, সেই অলৌকিক কাহিনীরই যদি না থাকে কোন ভিত্………!

সত্যি কথা বলতে কি, আমার মত অত্যাধুনিক দুরুহ ধরনের উপন্যাসের লেখক যে এই ধরনের একটা অতিপ্রাকৃত বিষয়ে এসেছি কলম ধরতে, তার একমাত্র কারণই হল অতি-লৌকিকতা। এবং সেই সঙ্গে একটা অজ্ঞতার বেদনা থেকেও, যে, জাগ্রত একান্নপীঠের নাম শুনলেও এর জানিনা ঠিকানা, বিবরণ বা বর্ণনা। একটা প্রবল কৌতূহল ছিল এই যে, এ বিষয়ে জানব, জানাব, এবং পুণ্য সঞ্চয় করব সামান্য কিছু। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারেরাই একান্ন পীঠ নিয়ে করে গেছেন এমনতর ব্যবহার যে, সমস্ত ব্যাপারটাই যাচ্ছে একটা গভীরতর জটীলতার মধ্যে হারিয়ে। আদপে সতী এবং দক্ষযজ্ঞনাশ গল্পের নিচে কোন ভিত্ আছে কিনা সেটাই বুঝতে পারছি না এখন।

না, না, সেজন্য ঘাবড়ে যাবেন না আপনারা একটুও। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল কি হয়নি, এ-নিয়ে রিসার্চ করতে বসে ঐতিহাসিকেরা যদি বাস্তব বিচারে ঘটনাকে নস্যাৎ করে দেন সম্পূর্ণও, তাতেও কিন্তু গীতার তাৎপর্য কমে না একতিল। কোন্ কৃষ্ণ, কবেকার কৃষ্ণ, কখন ব্যাখ্যা করেছিলেন গীতা, মতপার্থক্য থাকতে পারে সহস্র, কিন্তু গীতার বক্তব্যের তাতে হয় না কোন মূল্যহানী। ইতিহাস হতে পারে অসত্য, কিন্তু দর্শন অর্থাৎ অধ্যাত্মদর্শন, যা সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা অন্তরে করেছেন অনুভব, তা ব্যর্থ নয় কখনও। একান্নপীঠের কাহিনীর কোন না থাকতে পারে বাস্তব ভিত্, কিন্তু শাক্তদর্শনের মূল্য তবু অপরিসীম। সেখানে যে মূর্তি সংক্রান্ত শিল্প, তাতে আছে দূরাবগহ প্রতীকতা, সেখানে যে তন্ত্র, তাতে আছে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বিজ্ঞান, সেখানে যে ভক্তি, তা হল অতীন্দ্রিয়। সুতরাং অতীন্দ্রিয়ের সন্ধানে আমার সঙ্গে যাঁরা একান্নপীঠের অভিযাত্রী, তাঁদের কাছে অনুরোধ, আঘাত পাবেন না যেন একটুও। ইতিহাস যদিও মিথ্যে হয়, দর্শন হয় না অসত্য। সুতরাং আসুন, শেষপর্যন্ত দেখা যাক কোথায় যাই।

'রুদ্রযামল' বলে তন্ত্রের উপর আছে একটা গ্রন্থ। পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের অনেক আগেই এটা হয়েছিল রচিত। এই 'রুদ্রযামলে'ও আছে পীঠস্থানের বর্ণনা। তবে এতে কিন্তু 'কালিকাপুরাণে'র সাত থেকে পীঠসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে দশে। অথচ প্রথমদিকের উল্লেখযোগ্য পীঠও আছে চারটি। যেমন, (১) কামরূপ (২) জালন্ধর (৩) পূর্ণগিরি ও (৪) ওড্‌ডিয়ান। নতুন যা যোগ হয়েছে, তা হল এইগুলি—(৫) বারাণসী (৬) জ্বলন্তী (সম্ভবতঃ জ্বালামুখী) (৭) মায়াবতী (হরিদ্বারের কাছে) (৮) মধুপুরী (মথুরা) (৯) অযোধ্যা, এবং (১০) কাঞ্চী (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির চিংলিপুট জেলার কঞ্জিভরম্?)

'রুদ্রযামলে' এসে পীঠসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এগুলো কিন্তু সবই যুক্ত সতীর দেহাংশের সঙ্গেই। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে 'রুদ্রযামলে'র পীঠবর্ণনা পড়লেই। যেমন—

মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালন্ধরং তথা।
ললাটে পূর্ণগির্যাখ্যম ওড্‌ডিয়ানং তদূর্দ্ধকে॥
বারাণসীং ভ্রূবোর্মধ্যে জ্বলন্তীং লোচনত্রয়ে।
মায়াবতীং মুখবৃত্তে কণ্ঠে মধুপুরীং ততঃ॥
অযোধ্যাং নাভিদেশে চ কট্যাং কাঞ্চীং বিনির্দেশেত্॥
দশৈতানি প্রধানানি পীঠানি ক্রমতো বিদুঃ।
হ্রস্বদীর্ঘস্বরৈর্বর্গৈর্ণভ্যোন্তৈঃ ক্রমতো ন্যসেৎ॥

'দশৈতানি প্রধানানি' পীঠ বলতে মনে হয়, 'রুদ্রযামলে'র লেখক জানতেন আরো অপ্রধান কিছু পীঠের নাম। ফলে 'রুদ্রযামল' থেকেই 'কুলার্ণবতন্ত্র' নামে একটি পুস্তকে যখন দেওয়া হয়েছে পীঠ-সম্পর্কিত উদ্ধৃতি, তখন কিন্তু পীঠের সংখ্যা দশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে অষ্টাদশে। এই উদ্ধৃতিতে আছে যে ১৮টি পীঠস্থান, সেগুলি হল এই রকম: (১) উড্‌ডিয়ান (২) দেবীদহকোথ (দেবীকোট) (৩) হিঙ্গুলা (৪) কোটিমুদ্রা (৫) জালন্ধর (৬) বারাণসী (৭) অন্তরবেদী (৮) প্রয়াগ (৯) মিথিলা (১০) মগধ (১১) মেখলা (১২) অঙ্গ

৬

(১৩) বঙ্গ (১৪) কলিঙ্গ (১৫) সিংহল (১৬) স্ত্রীরাজ্য (১৭) রাঢ়া এবং (১৮) গৌড়।

'রুদ্রযামলে'র বিভিন্ন অংশে পীঠস্থানের বর্ণনায় নিশ্চয়ই ছিল অসঙ্গতি, নইলে 'রুদ্রযামল' অনুসরণ করে 'কুলার্ণবতন্ত্রে' দেওয়া পীঠ বর্ণনায় এমন কেন থাকবে গড়মিল? স্পষ্টই বোঝা যায়, লেখকরা খুশিমত নাম বর্ণনা করতেন পীঠস্থানের। শঙ্কারাচার্যের 'অষ্টাদশ-পাঠ' বর্ণনায় এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, 'যোগিনাং ধ্যাননির্মিতং।' অর্থাৎ যোগিরা ধ্যানে জেনে পীঠ বর্ণনা করেছেন। বোধহয় ধ্যানেই তাঁরা জানতে পেরেছিলেন বিভিন্ন স্থানে সতীর অঙ্গপতনের কথা। ধীরে ধীরে ধ্যানে ধ্যানে জেনেছেন বলেই হয়তো ক্রমশঃ পীঠের সংখ্যা পেয়েছে বৃদ্ধি, নামের ঘটেছে পরিবর্তন; নইলে বর্ণনার এমন অসঙ্গতি সত্যি সত্যি হাস্যকর।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেখা 'রুদ্রযামলে'র কোন অংশেই যখন পাওয়া যাচ্ছে ১৮টি পীঠের নাম, তখন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা 'জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে' আবার পাওয়া যাচ্ছে আটটি মাত্র প্রধান-পীঠের পরিচয়। যেমন, (১) কামরূপ (২) মলয় (৩) কৌলগিরি (৪) কুলান্তক (৫) চৌহার (৬) জালন্ধর (৭) উড্ডিয়ান এবং (৮) দেবকূট।

কামরূপং চ মলয়ং ততঃ কৌলগিরিং তথা ॥
কুলান্তকং চ চৌহারং জালন্ধরমতঃপরম্ ॥
উড্ডিয়ানং দেবকূটং পীঠাষ্টকমিদং ক্রমাত্ ॥'

'জ্ঞানার্ণব'-বর্ণিত পীঠের সঙ্গে 'রুদ্রযামলে'-বর্ণিত পীঠের মিল খুব সামান্য। আসলে, আলোচনা করলে দেখতে পাবেন, বিভিন্ন— গ্রন্থে পীঠের যে বর্ণনা, তাতে একের সঙ্গে অপরের মিল নিতান্তই যেন দৈবাতের একটা ব্যাপার। স্পষ্ট বোঝা যায় জলের মত, মৌল কোন নীতির ভিত্তিতেই রচিত হয়নি এগুলি। এবং আরও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, একই গ্রন্থের ভিন্ন অংশে যখন পীঠস্থানের দেওয়া হচ্ছে বর্ণনা আলাদা করে, তাতেও নেই একের সঙ্গে অপরের কোন মিল। অর্থাৎ

এ-ব্যাপারে একটা স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা ছিল লেখকদের, এ-কথাটাই স্পষ্ট। কেন যে তবু দু-একটা নাম থেকে যাচ্ছে সর্বত্রই, সেটাই হল ভাববার। তাহলে সেগুলোই কি আসল পীঠ? তাদের অনুকরণে লেখকেরা মনগড়া সব নতুন পীঠস্থান গড়ে তুলেছেন ইচ্ছে মত?

আরও একটু যদি এগিয়ে যাই, তাহলে সম্ভবতঃ আমাকে আর বোঝাতে হবেনা নিজেকেও। আপনারা নিজেরাই পারবেন এ-ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে।

ছোট একটা পুস্তিকা আছে—'অষ্টাদশপীঠ'; লোকে বলে, শঙ্করাচার্যের লেখা। হয়তো একজন বাঙ্গালী লেখক—শঙ্করাচার্য আগমাচার্যের লেখা, মধ্যযুগের শেষ পর্বের। এতে আছে পীঠদেবীর নামের সঙ্গে আঠারটি—পীঠের নাম। কয়েকটি বেশ ভাববার মত। যেমন, (১) লঙ্কায় দেবী শঙ্করী (২) আলাপুরে আছে যুগলা। (৩) শ্রীশৈলে ভ্রমরাম্বিকা। (৪) কোল্হাপুরে মহালক্ষ্মী। (৫) বারাণসীতে বিশালাক্ষি, (৬) কাশ্মীরে সরস্বতী (সারদা)।

সব চাইতে চিন্তা করবার মত ভ্রমরাম্বিকার কথা। এখনও ভ্রমরাম্বিকার পূজা হয় শ্রীশৈলে। অথচ ভ্রমরাম্বিকার কথা নেই অন্য কোন গ্রন্থে। অনেকের ধারণা ভ্রামরীই হলেন ভ্রমরম্বা (দক্ষিণ ভারতের)। বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনীকেও কহ্লন তাঁর 'রাজতরঙ্গিনী'তে বর্ণনা করেছেন ভ্রমরবাসিনী বলে। প্রচুর ভ্রমরের উৎপাত ছিল এ অঞ্চলে, এজন্যই বোধহয় এখানকার মাতৃদেবীকে বলা হয়েছে ভ্রমর-বাসিনী। কিন্তু ভাববার কথা এই যে, শুধুমাত্র বিন্ধ্যাচলের মাতৃদেবীই যে ভ্রমরপ্রতীকী তা নয়, শ্রীশৈলের দেবীও তাই। 'পীঠনির্ণয়ে'র মতে উত্তরবঙ্গের শালবাড়ির দেবীও হলেন ভ্রমরপ্রতীকী,—ভ্রামরী। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ভারতবর্ষের বাইরেও ভ্রমরকে প্রতীক করে আছেন মাতৃদেবী। যেমন, পশ্চিম এশিয়ার মাতৃদেবী নণইয়া ও আর্টেমিস, এঁদেরও প্রতীক হল ভ্রমর। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' আছে, দেবী দুর্গা ষটপদ ভ্রমরের রূপ ধারণ করেছিলেন অরুণ নামে অসুরের হাত থেকে রক্ষা করতে ত্রিভুবনকে। যেমন—

"যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসঙ্খ্যেয়ষট্‌পদম্‌॥" ইত্যাদি।

ভ্রমরম্বা থেকে যেমন মনে পড়ে গেল এত কথা, তেমনই কোল্‌হাপুর থেকে মনে পড়ে যায় কোলবগিরি, মহালক্ষ্মী থেকে মহালক্ষ্মীপুরের কথা।

১৮৬৩ সম্বত্‌ অর্থাৎ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে, কলকাতার কোন এক শম্ভুনাথ কর লিখেছিলেন—১৮টি পীঠের নাম। একজন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের কাছে শুনেই নাকি তিনি লিখে রেখেছিলেন নামগুলো। বৈতরণী নদীর ধারে জাহাজপুর, অর্থাৎ যাজপুরের অধিবাসী এই ব্রাহ্মণ। যে স্তোত্রটি তিনি বলেছিলেন, তা হল এই রকম—

মহাকাল্যৈ নমঃ। অষ্টাদশপীঠানি লিখ্যন্তে।
লঙ্কায়াং শঙ্করীদেবী, কামাখ্যা কাঞ্চিকাপুরী।
প্রত্যম্নে সিংহলদ্বীপে চামুণ্ডা কুঞ্চপট্টতে।
আলাপুরে যুগলাদেবী, শ্রীশৈলে ভ্রমরাম্বিকা।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালী মাহুরে একবীরকা॥
উৎকলে বিরজাদেবী মানিক্যাং চক্রকোটিলী।
হয়ক্ষেত্রে কামরূপী প্রয়াগে মাধবেশ্বরী॥
জ্বালায়াং বৈষ্ণবীদেবী গয়া মাঙ্গল্যকোটিকা।
বারাণস্যাং বিশালাক্ষি কাশ্মীরে তু সরস্বতী॥
অষ্টাদশানি পাঠানি যোগিনাং ধ্যান নির্মিতম্‌।
তেষ্যাং পঠনমাত্রেন জ্বরদারিদ্র্যনাশনম্‌॥

ইতি শঙ্করাচার্য বিরচিত অষ্টাদশপাঠম্‌ সম্পুর্ণম্‌।

'ইতি শ্রীশম্ভুনাথ কর উৎকলদেশস্থ ব্রাহ্মণ বেলংপুরীকর জহাজপুরীয় বৈতরণীয় ব্রাহ্মণা চ শ্রুত্বা লিখিতম্‌। সংবত··· ইত্যাদি।

এ-দুটো উদাহরণ তুলে দেবার অর্থ হল এই যে, একই লেখকের নামে যে চলেছে পাঠ-বর্ণনা, তাতেও দেখা যাচ্ছে—পরস্পর নেই কোন মিল। বিভিন্ন অঞ্চলে স্তোত্রগুলি নিচ্ছে বিভিন্নরূপ। অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে এ-থেকে সত্য উদ্ধার করা যাবে কি করে, কে জানে।

অনেক সময় আবার দেখা যায় যে—স্থানের নাম, দেবীর নাম সব হয়ে যাচ্ছে একাকার। এই ধরুন না, 'কুব্জিকাতন্ত্র' বলে একটি তন্ত্র গ্রন্থেই ঘটেছে এমনতর ঘটনা। পণ্ডিতদের ধারণা 'কুব্জিকাতন্ত্র' বেশ পুরানো একটি রচনা। এতে আছে ৪২টি সিদ্ধপীঠের উল্লেখ। এ ছাড়া আছে আরও পবিত্র কিছু তীর্থস্থানের কথা। যে ৪২টি সিদ্ধপীঠের কথা আছে এতে, 'কুব্জিকাতন্ত্রে'র মতে সে-সব স্থানে দেবতারা, মহর্ষিরা, পূর্বপুরুষেরা ও সিদ্ধপুরুষেরা সর্বদা করেন বিহার। শ্রদ্ধা আর ভক্তি নিয়ে এসব স্থানে গমন করলে ধর্মকর্ম সাধনায় হয় সিদ্ধি লাভ অবশ্যই। যে ৪২টি সিদ্ধপীঠের নাম রয়েছে 'কুব্জিকাতন্ত্রে', তা হল—(১) মায়াবতী (২) মধুপুরী (৩) কাশী (৪) গোরক্ষকারিণী (গোরক্ষ-চারিণী) (৫) হিঙ্গুলা (৬) জালন্ধর (৭) জ্বালামুখী (৮) নাগরসম্ভব (৯) রামগিরি (১০) গোদাবরী (১১) নেপাল (১২) কর্ণসূত্র (১৩) মহাকর্ণ (১৪) অযোধ্যা (১৫) কুরুক্ষেত্র (১৬) সিংহনাদ বা সিংহল (১৭) মণিপুর (১৮) হৃষিকেশ (১৯) প্রয়াগ (২০) বদরী (২১) অম্বিকা (২২) বর্দ্ধমান বা অর্দ্ধনালক (২৩) ত্রিবেণী (২৪) গঙ্গাসাগর সঙ্গম (২৫) নারিকেল (২৬) বিরজা (২৭) উড্‌ডিয়ান (২৮) কমলা (২৯) বিমলা (৩০) মাহিষ্মতী (৩১) বারাহী (৩২) ত্রিপুরা (৩৩) বাগমতী (৩৪) নীলবাহিনী (৩৫) গোবর্দ্ধন (৩৬) বিন্ধ্যগিরি (৩৭) কামরূপ (৩৮) ঘণ্টাকর্ণ (৩৯) হয়গ্রীব অথবা অক্ষয়বট (৪০) মাধব (৪১) ক্ষীবগ্রাম এবং (৪২) বৈদ্যনাথ।

'প্রাণতোষণীতন্ত্র' ও 'বাচস্পত্য-পীঠে' এই একই ধরনের আছে সিদ্ধপীঠের বর্ণনা। যেমন—

মায়াবতী মধুপুরী কাশী গোরক্ষকারিণী।
হিঙ্গুলা চ মহাপীঠং তথা জালন্ধর পুনঃ॥
জ্বালামুখী মহাপীঠং পীঠং নাগরসম্ভব।
রামগিরির্মহাপীঠং তথা গোদাবরী প্রিয়ে॥
নেপালং কর্ণসূত্রশ্চ মহাকর্ণং তথা প্রিয়ে।
অযোধ্যা চ কুরুক্ষেত্রং সিংহলাখ্যং (সিংহনামং) মনোরমম্॥

মণিপুরং হৃষীকেশং প্রয়াগশ্চ তপোবনম্।
বদরী চ মহাপীঠমম্বিকা অর্ধনালকম্॥
ত্রিবেণী চ মহাপীঠং গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্।
নারিকেলশ্চ বিরজা উড্ডীয়ান মহেশ্বরি॥
কমলাবিমলা চৈব তথা মাহিষ্মতীপুরী।
বারাহী ত্রিপুর চৈব বাগ্মতী নীলবাহিনী॥
গোবর্দ্ধনং বিন্ধ্যগিরিঃ কামরূপ কলৌযুগে।
ঘণ্টাকর্ণো হয়গ্রীবো মাধবশ্চ সুরেশ্বরি॥
ক্ষীরগ্রামং বৈদ্যনাথং জানিয়াদমালোচতে॥

ভাবসাব দেখে মনে হয়, পূর্বভারতের কোন ব্যক্তিই করেছিলেন এই সকল স্তোত্র রচনা, অন্ততঃ পণ্ডিতেরা মনে করেন তেমনই। এতে বিন্ধ্যঅঞ্চলেরও আছে উল্লেখ। বিন্ধ্যঅঞ্চলে সিদ্ধপীঠের কথা ঘোষণা করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এ অঞ্চলে প্রাচীন অনার্য দেবী বিন্ধ্যবাসিনী ছিলেন সমহিমা প্রকাশ করে। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির আছে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের কাছে। অনার্য হলেও এ দেবী খ্যাত অলৌকিক সব ক্ষমতার জন্য। এবং সেই কারণেই সম্ভবতঃ আর্য শাক্তদের মধ্যেও স্থান করে নিয়েছেন অনায়াসে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাধকদেরও। বহু ক্ষত্রিয় রাজাও যে পুরানো দিনে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা দিতেন, তার প্রমাণ আছে বাক্‌পতিরাজের 'গউড়বহো'তে। 'গউড়বহো'র মতে, রাজা যশোবর্মণ বিজয় অভিযান-কালে করেছিলেন এই বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পূজা। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'ও বিন্ধ্যবাসিনীর আছে বিশেষ উল্লেখ। কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিনী'তেও দেখি ভিন্ননামে (ভ্রমরবাসিনী) বলা হয়েছে বিন্ধ্যবাসিনীর কথাই। তবে, দেবীর এত বিপুল প্রভাব থাকা সত্বেও সকল পীঠবর্ণনায় যে তাঁর নেই উল্লেখ, এর কারণ হয়তো এই যে,—পীঠ নির্ণয়ের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিলনা কখনও। এবং পীঠ বর্ণনার যে বিভিন্নতা নজরে পড়ে তাতে ধারণা, লেখক নিজের পছন্দ মত যে-কোন স্থানকেই পীঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন নির্বিবাদে। শাক্ত ঢোকাতেন

শৈব আর বৈষ্ণবতীর্থকে নিজের বৃত্তে, বৈষ্ণব নিজেকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করতেন শাক্ত এবং শৈব অঞ্চলে, আর শৈব এগিয়ে যেতেন নিজের মাহাত্ম্য বিস্তার করতে করতে যত দূরে সম্ভব। সুতরাং এই ধরনের অবস্থা থেকে কোন কিছুরই সত্যতা উদ্ধার করা সম্ভব কিনা, বিশেষ করে যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করবার চেষ্টা করা হয়, তা বলা অন্ততঃ আমার পক্ষে অসম্ভব। এসব ক্ষেত্রে বাস্তব জগতের লজিক নিয়ে কোনকিছু খোঁজাই হল অর্থহীন। বিশ্বাসের দৃষ্টিতে এসব কিছুই নেয় নতুন রূপ। কিন্তু বিশ্বাসটাই বা হবে কী ধরনের, সেটাই ভাবি। চতুষ্পীঠের কাহিনী, অষ্টপীঠের কাহিনী, আবার ৪২-টি সিদ্ধপীঠ এবং ৫০।৫১।৫২ পীঠের কথা যদি পড়েন একই ব্যক্তি, তবে কোথায় যাবেন শাস্ত্রপাঠক? বিশ্বাস কি হবে এমনই বিচারহীন অন্ধ যে, তার মধ্যে খুঁজে পাবেনা logical কোন কিছু? এবং সেইজন্যই এখন মনে হয়—আমার পিসিমা, যিনি কালীপূজা করতেন, জীবনের মোক্ষ খুঁজেছিলেন একান্নপীঠের মৃত্তিকা স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষায় এবং যিনি এজন্য কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং ইম্ফল থেকে সিন্ধু,—পাণ্ডাঠাকুরদের সঙ্গে পরিভ্রমণ করতে করেন নি ভুল, তিনি কি এতে লাভ করেছিলেন পরিতৃপ্তি?

বিশ্বাস হারাতে বলছিনা আমি কাউকে, এবং এ ব্যাপারে কারো বিশ্বাসে আঘাতও হানছিনা কোনরকম। জগতে লৌকিক বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঊর্ধেও আছে অনেক জিনিষ—যা নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার নিজেরই হয়েছে বহুবার। ভবিষ্যতের ঘটনা গণনা করে নির্ভুল বলেছেন—এমন জ্যোতিষী নিজের চোখে দেখেছি ভূরি ভূরি। বিজ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা হয়? এমন কোন কমপিউটার বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি আজপর্যন্ত যা নির্ভুলভাবে পারে বলে দিতে যে—অমুক দিন, অমুক সময়, আপনি চাকুরী পাবেন, বিবাহ হবে, বা মৃত্যু হবে আপনার। অথচ আমি নিজে দেখেছি এমন ঘটনা ঘটতে; জ্যোতিষীরাই করেছেন।

তন্ত্রের এবং মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি আছে কে জানে! অথচ

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'বাণ' মেরে মানুষকে মারার কথা শুনেছি অনেক। 'বহার-ই-স্তান গয়েবী'র লেখক মোগল সেনাপতি মির্জানাথন স্বয়ং এ ঘটনা দেখে লিখে-রেখে-গেছেন তাঁর পুস্তকে। তিন মাথার মোড়ে অশ্বত্থতলায় পূজার ঘটের উপর থেকে পয়সা তুলে সেই রাত্রেই সুস্থ ছেলেকে ডাক্তার বৈদ্যের নির্ণয়াতীত রোগে ভুগে আমি নিজের চোখে দেখেছি প্রাণ হারাতে। পুত্রের ফাঁড়া কাটাবার জন্য সুদূর কামাখ্যাতে গিয়ে মন্দিরে হত্যা দিয়ে ঠিক যে-মুহূর্তে শেষপুষ্প প্রদান করেছেন মা—সেই মুহূর্তেই সর্পাঘাতে একটি গাভীন গরুকে মরে যেতে দেখেছি আপন চোখে। যার ব্যাখ্যা ক্যামাখ্যা-বিশ্বাসী ভক্তদের মতে এক প্রাণের বিনিময়ে আর এক প্রাণরক্ষা তন্ত্রের গুণে। আমার নিজেরই কাশী যাবার ইচ্ছে ছিল না কখনও, অকস্মাৎ অপরে জোর করে টেনে নিয়ে গেছে সেখানে। কাশীর অন্নপূর্ণাকে স্বচক্ষে মন্দিরে দেখবার আগেই স্বপ্নে দেখে নিয়েছি রাস্তায়, দেখেছি সিদ্ধিদাতা গণেশকে মন্দিরের মুখে, যেমনটি তিনি আছেন তেমনি ভাবে। আমার নিজের এ অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা নেই। এবং সব চাইতে বড় আশ্চর্য কথা এই যে, কারো কাছে শিখিনি অথচ ক্লে-মডেলিং-এ আমি ওস্তাদ। একবার তৈরী করছিলাম দুর্গামূর্তি।—মুখের ছাঁচ ছিলনা কাছে। নির্জন ঘরে বসে গভীর রাত অবধি মুখ তৈরীর অভ্যাস করছিলাম একা একা। কিন্তু কি আশ্চর্য! দুর্গার বদলে যে-মুখ আমার হাত থেকে এল বেরিয়ে, তা হল শ্মশান কালীর। এবং আরও আশ্চর্য বিষয় এই যে, পরদিন খুব ভোর বেলাতেই বাবা আমাকে ডেকে তুললেন কয়েকজন লোকের অনুরোধে। গ্রামেরই লোক, দূরে দিয়েছিলেন কুমারটুলীতে তৈরি করতে কালী প্রতিমা। কিন্তু হয়েছে কোন কারণে বিবাদ; লক্ষ টাকার বিনিময়েও মূর্তি দেবেনা কুমাররা। মানসিক কালীপূজা বন্ধ হলে সর্বনাশ। কাঁদ কাঁদ হয়ে ধরে—পড়েছেন বাবাকে, যদি আমি—। এবং আমিই তৈরি করে দিয়েছিলাম সে প্রতিমা। এ-সবের কোন ব্যাখ্যা নেই। সুতরাং যা শোনায় অলৌকিক, লজিকে যার ব্যাখ্যা চলেনা, তাকেই বিশ্বাস করব না,

এমন মানুষ আমি নই। কিন্তু অলৌকিক ঘটনাকে আরো একটু অলৌকিক করতে যদি কিছু সংখ্যক মানুষ অতি-প্রাকৃতকে করে তুলেন হাস্যকর—তাহলে সেইসব অর্বাচীনকে ক্ষমা নেই। আমারইতো অন্ধবিশ্বাস ছিল ছোটবেলাতে একান্নপীঠের কাহিনীতে—, যদি না অতি-সন্ন্যাসীতে হত গাজন নষ্ট, সে-বিশ্বাসে হয়তো আজও আমার আঘাত পড়ত না এতটুকু। সেই বিশ্বাসটাকে নিশ্চিত করে নেবার জন্যইতো শুরু করে ছিলাম অভিযাত্রা শাস্ত্র জগতের বন্ধুর পথে। কিন্তু……

কিন্তু—কি, সে সিদ্ধান্ত এখনই আমি নিচ্ছিনা, এবং আপনাদেরও পূর্বাহ্নেই বলছিনা কোন সিদ্ধান্ত নিতে। আরও একটু এগিয়ে দেখা যাক, আরও একটু বিচার করে, তারপরে……

হ্যাঁ আসুন, আরও একটু বেশীকরে চেষ্টা করে দেখি-, সত্যি সত্যি হয় কিনা পীঠ-রহস্যের কোন সমাধান, কিংবা যথার্থই মহামায়ার মত ধৈর্য পরীক্ষার পর, অকস্মাৎ অভয় বাক্যে স্মিতহাসি হাসে কিনা একান্নপীঠ!

'জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে'র কথা বলেছি আমরা। তাতে যে আছে আটটি পীঠের কথা, তাও দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য কথা এই যে, ঐ একই গ্রন্থের ভিন্ন অংশে আছে পঞ্চাশটি পীঠের নাম—পঞ্চাশৎ-পীঠ-সঞ্চয়, পঞ্চাশৎ স্থান কিংবা পঞ্চাশৎ পীঠবিন্যাস প্রভৃতি। এই পঞ্চাশটি পীঠ হল—(১) কামরূপ (২) বারাণসী (৩) নেপাল (৪) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বগুড়া জেলার মহাস্থান, বাংলাদেশ) (৫) কাশ্মীর (৬) কান্যকুব্জ (৭) পুরস্থিত (৮) চরস্থিত (৯) পূর্ণ-শৈল (১০) অর্বুদ (১১) আম্রাতকেশ্বর (১২) একাম্র (ভূবনেশ্বর) (১৩) ত্রিস্রোতা (১৪) কামকোট্ট (১৫) কৈলাশ (১৬) ভৃগু (১৭) কেদার (১৮) চন্দ্রপুর (১৯) শ্রীপীঠ (শ্রীহট্ট?) (২০) ওঙ্কার (২১) জালন্ধর (২২) মালব (২৩ কুলান্ত (২৪) দেবকোট (২৫) গোকর্ণ (২৬) মারুতেশ্বর (২৭) অট্টহাস (২৮) বিরজা (২৯) রাজগৃহ (৩০) কেবলগিরি (কৌলগিরি?) (৩১) এলাপুর (ইল্লোরা) (৩২) কালেশ্বর (কামেশ্বর) (৩৩) জয়ন্তিকা

(জয়ন্তী) (৩৪) উজ্জয়িনী (৩৫) ক্ষীরিকা (ক্ষীরগ্রাম) (৩৬) হস্তিনাপুর (৩৭) উড়িষ্যা (৩৮) প্রয়াগ (৩৯) বিন্ধ্য (৪০) মায়াপুর (৪১) জলেশ্বর (উড়িষ্যা) (৪২) মলয় (৪২) শ্রীশৈল (৪৪) মেরুগিরি (৪৫) মহেন্দ্র (৪৬) বামন (৪৭) হিরণ্যপুর (৪৮) মহালক্ষ্মী (৪৯) উড্ডিয়ান এবং (৫০) ছায়াছত্রপুর। 'তন্ত্রচূড়ামণি'র পাণ্ডুলিপিতে এবং 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী'র পঞ্চদশ অধ্যায়েও আছে ঠিক উপরোক্ত তীর্থগুলির যথাযথ উল্লেখ। যেমন—

কামরূপং মহাপীঠং পীঠং বারাণসীং তথা।
নেপালশ্চ তথা পীঠং তথা বৈ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্॥
কাশ্মীরশ্চ মহাপীঠং কান্যকুব্জমতঃপরম্।
পুরস্থিতং (স্থিবং) তথা পীঠং চরস্থিতমথাপরম্॥
সর্বশৈলং মহাপীঠমর্বুদশ্চ ততঃপরম্।
আম্রাতকেশ্বরং পীঠমেকাম্রশ্চ ততঃপরম্॥
ত্রিস্রোতঃ পীঠমনঘং কামকোট্টমতঃপরম্॥
কৈলাশং ভৃগুপীঠশ্চ কেদারং চন্দ্রপুরকম্॥
শ্রীপীঠশ্চ (শ্রীহট্টস্থ ?) তথোঙ্কারং জালন্ধরমতঃপরম্।
মালবশ্চ তথা পীঠং কুলান্তং দেবকোট্টকম্॥
গোকর্ণশ্চ মহাপীঠং মারুতেশ্বরমেব চ।
অট্টহাসশ্চ বিরজং রাজগৃহমথাপরম্ (রাজগৃহমহাপথম ?)॥
পীঠ কোল্যগিরিং প্রোক্তমেলাপুরমথাপরম্।
কালেশ্বরং মহাপীঠং মহাপীঠং জয়ন্তিকাম্।
পীঠমুজ্জয়িনীশ্চৈব বিচিত্রং ক্ষীরিকাভিধম—
হস্তিনাপুর পীঠশ্চ উড্ডিয়ানশ্চ প্রয়াগম্॥
বিন্ধ্যশ্চৈব মহাপীঠং মায়াপুর জলেশ্বরৌ।
মলয়শ্চ মহাপীঠং শ্রীশৈলং মেরুকং গিরিম্॥
মহেন্দ্রং বামনশ্চৈব হিরণ্যপুরমেব চ।
মহালক্ষ্মীময়ং পীঠমুড্ডিয়ানমতঃপরম্॥
ছায়াছত্রপুরং পীঠং তথৈব পরমেশ্বরি।

পঞ্চাশত্ পীঠবিন্যাসং মাতৃকাবন্নসেত্ (বর্ণসহ) সদা ।।

তবে এই যে পঞ্চাশটি পীঠ, এর সবগুলিই মনে হয়না শাক্তপীঠ। কোথাও কোথাও শৈব এবং বৈষ্ণব তীর্থেরও আছে উল্লেখ। অর্থাৎ শাক্তপীঠ নিজেকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে সর্বত্র। পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা, পূর্বভারত থেকেই চালানো হয়েছিল এ চেষ্টা। বাঙ্গালী তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, সপ্তদশ শতাব্দীতে করেছেন পীঠ বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই ৫০-টি পীঠের উল্লেখ।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নবদ্বীপের লোক। শ্রীচৈতন্য ও রঘুনাথ শিরোমণির সহপাঠী ছিলেন নাকি টোলে। অন্তরঙ্গতা ছিল শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে। তবে ধর্মমত নিয়ে হয় পার্থক্য। শ্রীচৈতন্য শাক্তধর্ম ছেড়ে ঝুঁকলেন বৈষ্ণব ধর্মের দিকে। আগমবাগীশের সঙ্গে হল তাঁর মতভেদ। এরপরেই কৃষ্ণানন্দ নিজেকে নিয়োগ করলেন শক্তি সাধনায়। শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধ কৃষ্ণানন্দ—বাংলাদেশে করলেন কালীপূজার প্রচলন। কৃষ্ণানন্দের আগে এই শক্তির ছিলনা কোন মূর্তি। শক্তির আরাধনা হত ঘটে। কৃষ্ণানন্দ দক্ষিণাকালীরূপে শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন পূজার বেদীতে। গল্পও আছে এ সম্পর্কে :

স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন কৃষ্ণানন্দ। ৺মা বললেন, আমাকে মূর্তিরূপে কর্ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কোন্ রূপ ৺মায়ের, কৃষ্ণানন্দ তা জানেন না। তাই জিজ্ঞাসা করলেন,—কি করে জানবো তোমার মূর্তি? ৺মা বললেন—কাল সকাল বেলাতেই পাবি আমার রূপ দেখতে। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণানন্দ হলেন ঘরের বার। রাস্তায় দেখলেন, ঘুঁটে কুড়ুনীর এক কালোমেয়ে ঘুঁটে দিচ্ছে দেয়ালে! আলীঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়ে—অর্থাৎ বাম পদ বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে ঢালু ভঙ্গীতে, দৃঢ়ভাবে ডান পায়ের উপর ভর করে। বাঁ হাতে রয়েছে একতাল গোবর, ডান হাতে ঘুঁটে তৈরী করার মত সামান্য একটু। কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিব্ কাট্‌লো ঘুঁটে কুড়ুনীর সেই মেয়ে। অর্থাৎ লাল টকটকে জিব্ বের করে তার উপর রাখল ঊর্দ্ধদন্তপাটি। কৃষ্ণানন্দের অন্তরে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগলো—এইই

হল ৺মায়ের মূর্তি। এই মূর্তিই দেখালেন ৺মা তাঁকে। কৃষ্ণানন্দ নিজের হাতে মাটি দিয়ে তৈরী করলেন এই মূর্তি। তারপর দিলেন যথারীতি পূজা। নিত্য পূজা দিতেন তিনি নতুন মূর্তি তৈরী করে। পরদিন সকালেই আবার বিসর্জন দিতেন গঙ্গাতে। পরে নবদ্বীপের রাজা নিজ ভবনে কার্তিক মাসের নবচন্দ্রোদয়ে বিশাল মূর্তি তৈরী করে আরম্ভ করেন ৺মায়ের পূজো। বাংলাদেশে 'শক্তিরূপে' ৺মা আসেন এই ভাবেই।

গল্প মিষ্টি। কিন্তু ঘটনা সত্য কিনা সেটাই ব্যাপার। কারণ, ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছে, চৈতন্যদেব, রঘুনাথ শিরোমণি আর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ একসময়ের নন কখনই। কারো মতে রঘুনাথ শিরোমণির জীবন এবং কর্মকাল হল ১৪৭৭-১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। আবার কারো মতে তাঁর জন্ম হল ১৪৬০ থেকে' ১৪৬৫ সালের ভিতরে। চৈতন্যের জন্ম সাল নিশ্চিতরূপে —১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। রঘুনাথ শিরোমণি কমপক্ষে দশ থেকে ১৬ বছরের বড চৈতন্যদেব থেকে। এ-বয়সের পার্থক্যে সহপাঠী বা বন্ধু হওয়া প্রায় অসম্ভব। অপরপক্ষে কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' ঐতিহাসিকদের মতে রচিত হয় ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দেরও বেশ কিছু পরে। চৈতন্যদেবের জীবনকালে. আগমবাগীশের জন্ম হলেও শ্রীচৈতন্য আর রঘুনাথ শিরোমণি তখন মৃত্যুর কাছে। সুতরাং এঁদের পক্ষে সহপাঠী হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অথচ আগমবাগীশকে নিয়ে যে গল্প, তাতে শ্রীচৈতন্য এবং রঘুনাথকে সমবয়সী করে দেখানো হয়েছে কৃষ্ণানন্দের। গল্পের যদি এক-অংশ হয় মিথ্যা আর এক-অংশ সত্য হবে একথা বলা যায় না জোর করে।

যা করতে চাই বিশ্বাস, ইতিহাসের নির্মম বিচার যদি করে তা অস্বীকার—তবে দুঃখ পেলেও বাস্তব জগতে, অর্থাৎ ইতিহাসের নির্মম বিচারকে নিতেই হবে আমাদের মেনে। সুতরাং......

আগমবাগীশ যাক। আমার অনুসন্ধান নয় আগমবাগীশকে নিয়ে, বা নয় তাঁর দক্ষিণাকালীকে নিয়েও, আমার অনুসন্ধান সতীর দেহপাত-

সৃষ্ট একান্নপীঠ নিয়ে। সুতরাং আগমবাগীশ নয়, আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার'—যাতে আছে পঞ্চাশৎপাঠের কথা, তাই লক্ষ্য এখন আমার। 'জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে'র পীঠবর্ণনা স্বীকার করে নিয়েছেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তথাপি তিনি যখন লিখলেন, তখন কে জানে কেন, পঞ্চাশতের জায়গায় একান্ন হয়ে গেল পীঠসংখ্যা। পঞ্চাশৎপীঠের ৪৪তম পীঠ মেরুগিরি, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের হাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে হয়েছে মেরুপীঠ আর গিরিপীঠ। যার ফলে হয়েছে এই সংখ্যা বৃদ্ধি। অবশ্য কারো কারো ধারণা, এ ভুল কৃষ্ণানন্দের নিজের নয়, পরবর্তীকালে যাঁরা 'তন্ত্রসার'কে ঢেলে সাজিয়েছিলেন তাঁদের।

বিশেষ কৌতূহলের বিষয় এই যে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশেরই সপ্তমপুরুষ—রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার, তিনি যখন তাঁর 'প্রাণতোষণীতন্ত্রে' পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠনিরূপণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন পীঠসংখ্যা, তখন অন্যান্য পীঠবর্ণনা থেকে পৃথক হলেও এতে তিনি পীঠসংখ্যা রেখেছেন তাঁর সপ্তম পিতৃপুরুষ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বর্ণিত একান্ন পীঠেই। অর্থাৎ তিনিও পীঠসংখ্যা দেখিয়েছেন একান্নটি।

পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠনিরূপণ—এর উল্লেখ নেই বঙ্গদেশের প্রথম দিকের পীঠসংক্রান্ত কোন তন্ত্রগ্রন্থে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার' সংকলনের পরই—'পাঠনির্ণয়' ভারতের পূর্বপ্রান্তে ক্রমশঃ পরিচিত হতে থাকে লোকের কাছে। এর কারণ হয়তো এইযে, কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' সংকলনের পরই হয়েছে 'পীঠনির্ণয়' লেখা। 'পীঠনির্ণয়' থেকে উদ্ধৃতি আছে রামতোষণের 'প্রাণতোষণীতন্ত্রে', যার রচনাকাল—১৮২০ খ্রীঃ। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পীঠনির্ণয় রচিত হয়েছিল—১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই।

'অন্নদামঙ্গল' রচনার সময় ভারতচন্দ্র (১৭৫২ খ্রীঃ) পীঠনির্ণয়ের নিয়েছিলেন সাহায্য। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগেই কোন এক সময়ে 'পাঠনির্ণয়' হয়েছিল লেখা। 'পাঠনির্ণয়ে' আছে কালীঘাটের উল্লেখ, অথচ এর আগে যে রচিত হয়েছে পাঠসংক্রান্ত গ্রন্থ—তাতে নেই কালীঘাটের তেমন কথা।

বাঙ্গালীর লেখা গ্রন্থেই 'কালীঘাটের' নাম নেই পীঠ হিসাবে, যেমন ধরুন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'। তাই বলে যে তীর্থ হিসেবে 'কালী-ঘাটের' কোন মূল্যই ছিলনা, তা নয়। পঞ্চদশ শতকে (১৪৯৫ খ্রীঃ) বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' আছে কালীঘাটের কালিকা, চিৎপুরের সর্ব-মঙ্গলা এবং হাওড়া জেলার শিবপুরের কাছে বেতাইচণ্ডীর নাম। তবে সতীর দেহাংশের সংগে যুক্ত হয়ে পরে কালীঘাট যে বিরাট মূল্য পেয়েছে শাক্ত জগতে, সে মূল্য হয়তো তখন ছিলনা কালীঘাটের। ষোড়শ শতাব্দীর লেখক ময়মনসিংহের বংশীদাস—কালীঘাটকে গণ্য করেননি তীর্থ হিসেবে। কলকাতার গুরুত্ব বেড়েছে ১৬৯০ খ্রীঃ কলকাতানগরীর প্রতিষ্ঠা করে যখন ইংরেজরা তখন. লোক আসতে থাকে চারদিক থেকে। তখনই হয়তো লক্ষ্য পড়তে থাকে কালীঘাটের কালীর দিকে।

পীঠসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি দেখে ধারণা, লোকপূজ্যা মাতৃ-দেবীরাই একের পর এক এসে স্থান নিয়েছেন একটা অলৌকিক গল্পের মধ্যে—, যে-গল্পের একটা ক্ষীণ ইঙ্গিত ছিল ঋগ্বেদের রুদ্র-প্রজাপতির কাহিনীতে—যে-কথা বলেছি প্রথম দিকেই। অনার্যদের মাতৃঅঙ্গ-পূজার প্রচলন একটা. নতুন ইঙ্গিত তৈরী করেছে হয়তো। আর্য-অনার্যের সংঘাত, মিলনের পথেই এগিয়েছে শেষপর্যন্ত ভারতে। ফলে, কিছু আর্য, কিছু অনার্য-গল্প মিশে গিয়ে নতুন এক গল্প তৈরী হয়েছে—দক্ষ-যজ্ঞনাশ কাহিনী ও সতীর মৃত্যু। সেই কাহিনীই শেষপর্যন্ত মাতৃ-পূজারীদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে মিলনের এক প্রতীক। লোকপূজ্যা প্রভাবশালিনী মাতৃদেবীরা একে একে ঢুকে পড়েছেন সেই গল্পের মধ্যে—যেমন করে অনার্যদেবী বিন্ধ্যবাসিনী এসেছেন আর্য-মন্দিরে। কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি কালীঘাটকে এনেছে লোকের দৃষ্টিতে। মুখে মুখে প্রচার হয়েছে এর অলৌকিকতা। তারপর একদা সতীসংক্রান্ত কাহিনীতে স্থানলাভ ক'রে মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে কালীঘাট। শাক্ত মহাপীঠের সঙ্গে যুক্ত হতে কালীঘাটের বিলম্ব হবার এটাই বোধহয়, ধারণাযোগ্য সহজতম কারণ।

আর্যজগতে অনার্য দেবদেবীর প্রবেশ হিসেবেই যে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর কাহিনীর অবতারণা, এতে নেই কোন সন্দেহ এই কারণে যে, যজ্ঞনাশ কথাটাই প্রমাণ করে অনার্যদের জয়, মানে অনার্য সংস্কৃতির জয়। লক্ষ্য করে দেখুন, আর্যরা পূজা করতেন না, করতেন যজ্ঞ; আর অনার্যরা যজ্ঞ নয়, করতেন পূজা। শিব যে অনার্যদেবতা, সেকথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা,—মহেন-জো-দড়োর পশুপতির চিত্র এবং শিবলিঙ্গের ছবি দেখার পরে। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, আর্যদের যজ্ঞভাগ পেতেন না শিব, আবার যজ্ঞভাগ না পেলে তিনি উঠতেও পারবেন না আর্য জগতে! তাই কাহিনী রচিত হল দক্ষ-যজ্ঞের। যজ্ঞনাশ করে যজ্ঞভাগের অধিকার আদায় করে নিলেন শিব প্রজাপতির দুয়ার থেকে। কিন্তু ভারতের অন্তরাত্মায় বিরোধের স্থান নেই কোনদিন। তাই শেষপর্যন্ত মিলন হল আশ্চর্য রকমে। শিব ধ্বংস করলেন যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ-ব্যবস্থা হল না নাশ। পূজা এসে স্থান করে নিল যজ্ঞের পাশে, এই যা। একটু যদি লক্ষ্য করেন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পূজাগুলি, যেমন, দুর্গা, কালী ইত্যাদি পূজা, তাহলে দেখবেন, পূজার কোন মূল্য থাকে না, যদি না যজ্ঞ হয় পূজার পরে। যজ্ঞ দিয়ে পূজার হয় সমাপ্তি। আশ্চর্য এক সহাবস্থান আর্য-অনার্য সংস্কৃতির। ভারতের এই সমন্বয়ের সাধনাই আঞ্চলিক অনার্যদেবীদের আর্য-প্রাঙ্গণে ধীরে ধীরে করে দিয়েছে স্থান। সেই সমন্বয়ের মানসিকতাই কালীঘাটের কালিকা দেবীকেও দিয়েছে পীঠদেবীর মর্যাদা। কিন্তু সেকথা এখন থাক। পীঠসমস্যা নিয়ে যে আলোচনা, তাতেই আবার যাক ফিরে যাওয়া।

'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠনিরূপণে'র কথাতেই যাক আসা। সতীদেহ থেকে যে একান্ন মহাপীঠ, বাঙ্গালীর কাছে 'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠ নিরূপণে'র সেই একান্নপীঠের বর্ণনাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়। এর কারণ হয়তো এই যে, এতে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেরও বহু গ্রাম লাভ করেছে পীঠস্থানের মর্যাদা। আর এতেই আছে প্রতিটি পীঠে দেবী এবং সেইসঙ্গে ভৈরবের নাম। বর্ণনার ভাষাতেও বাংলাভাষার প্রভাব আছে প্রচুর। দেখে শুনে ভুল হবে না বোধহয় ধারণা করা—মধ্যযুগে

বাংলাদেশে তন্ত্র আর তন্ত্রসাহিত্যের ঘটেছিল আশ্চর্য বিকাশ। তন্ত্রের উদ্ভব—অন্ততঃ পীঠের ইতিহাস অনুসন্ধান শেষে যে রকমের ধারণা, তাতে উত্তর-পশ্চিম ভারতেই বোধহয় প্রথম। কিন্তু মধ্যযুগের প্রথম ভাগেই উত্তর-পূর্ব ভারতেও তন্ত্রসাধনা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকে চন্দ্রকলার মত এবং মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে আপন মহিমায় উত্তর-পূর্ব ভারতকে করে তোলে অনুকূল। হয়তো মুসলমানদের আক্রমণই মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তন্ত্রসাধনার বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল পৌত্তলিকতাবিরোধী মানসিকতায়, আর সেই সুযোগেই পূর্বভারতে তন্ত্র বেড়ে উঠেছে আপন মহিমায়। কামাখ্যাতেই বোধহয় শেষপর্যন্ত আশ্রয় লাভ করেছিল তন্ত্রসাধনা—কারণ, মুসলিম প্রভাব আসামে গিয়েছে অনেক পরে। সেখানে প্রবেশ করলেও তেমন বিপদ সৃষ্টি করতে পারেনি প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূলতায়। সেইজন্যই কামাখ্যার এত দোর্দণ্ডপ্রতাপ তন্ত্রে। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে অবশ্যই যে, কামাখ্যা অতি প্রাচীন। গূঢ় রহস্য কী, কে জানে! তবে উদ্ভব থেকে অন্ত অবধি—কামাখ্যা ছিল এবং আছে। এ রহস্যভেদ বোধহয় একমাত্র দেবী কামাখ্যাই পারেন করতে। তবে কামাখ্যা যে বাঙ্গালী মানসিকতার বাইরে, নয় তাও। বৃন্দাবন যেমন বৈষ্ণব-বঙ্গের, তেমনি কামাখ্যা হল শাক্ত-বঙ্গের কাছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক। এবার আরম্ভ করি আমাদের মূল কাহিনী—'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠনিরূপণ'কে কেন্দ্র করে। তার আগে আরও কয়েকটা কথা আছে পীঠ প্রসঙ্গে, সে কথাটাই বলে নিই।

'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠনিরূপণ' শেষপর্যন্ত বাঙ্গালীদের কাছে পীঠসংখ্যা হিসাবে গ্রাহ্য হলেও, এ কথা আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, পীঠের ইতিহাস বিশৃঙ্খল এবং অস্পষ্ট। ইতিহাসের এই বিশৃঙ্খলাই বিশ্বাসের উপর আঘাত হেনেছে প্রচণ্ড। শক্তিপূজার মর্মে যদি না থাকতো একটা বিজ্ঞানসম্মত আধ্যাত্মিকতা, তাহলে বোধহয় পীঠের কথ বেঁচে থাকতো কিছু সংখ্যক অর্বাচীন-মনের অভিব্যক্তিতে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের মতই। এই অধ্যাত্ম দর্শনই তাকে জীবিত রেখেছে ইতিহাসের

উর্ধে স্থান দিয়ে। সেই দর্শনের কথাতেও আসছি একটু পরে। তবে তার আগে,—এই পীঠ সম্পর্কেই আরো দু' একটি কথা না বললে বোধহয় একান্ন-পীঠের অনুসন্ধানের সার্থকতা থাকবে না কোনই। সুতরাং......

কত পীঠ আছে, এবং কোথায়,—এ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার আরও একটা বড় ঘটনা তুলে ধরছি আপনাদের কাছে। অষ্টোত্তরশত অর্থাৎ ১০৮টি সংখ্যার বিরাট একটা গুরুত্ব আছে আমাদের কাছে! বহু শ্রেণীর ধর্মসাধকই ১০৮টি ভিন্ন ভিন্ন নামে উচ্চারণ করেন নিজের নিজের দেবদেবীর নাম। এই প্রসঙ্গে ভারতের ধর্মভীরু লোকেদের মানসিকতার কথাও মনে পড়ে। এককালে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবে কি হতো জানিনা, অন্ততঃ আজ যে মানসিকতাটা সামান্য পুণ্যসঞ্চয়কারী ভারতীয়দের মনেই বেঁচে আছে, তা হল এই যে,—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, মর্মে মর্মে একাকার হয়ে আছে আমাদের। সেইজন্য যে-তীর্থযাত্রী শিব প্রণামের জন্য কাশী যায়, অবধারিত রূপে সে অন্নপূর্ণাকেও পূজা দেয়। কোন রাধাকৃষ্ণের মূর্তি থাকলে ভক্তিভরে সেখানেও ফেলে পয়সা। শিবের ছায়াতেই শক্তি থাকে, শক্তির আঁচলের নিচে বৈষ্ণব। সে দিক থেকে আমাদের দেবদেবী কিংবা পুণ্যসঞ্চয়কারীরা সকলেই অধিবাসী ভারতরূপী এক আশ্চর্য যাদুঘরের। এবং সেই জন্যই কালীপূজা করা পিসিমাকেও প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে একশ আটবার আবৃত্তি করতে শুনতাম 'শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম': 'ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিণী', ইত্যাদি! শাস্ত্র-গ্রন্থে দেখছি, —শুধু পিসিমা নয়, ইষ্ট দেবদেবীকে ১০৮ নামে বহু শাস্ত্রগ্রন্থকারেরাই করেছেন ভূষিতা! শিবের নানা নাম আছে—'শিবপুরাণ'-এর সনৎ-কুমারসংহিতা অংশে। 'স্কন্দপুরাণ'-এর মহেশ্বরখণ্ড অংশের কেদারখণ্ড অনুচ্ছেদেও আছে শিবের বহু নাম বর্ণনা। এই ধরনে ব্রহ্মের নানা নাম আছে 'পদ্মপুরাণ'-এর 'সৃষ্টি খণ্ড', 'স্কন্দপুরাণ', 'প্রভাসখণ্ড' প্রভৃতিতে। 'যজুর্বেদের' শতরুদ্রীয় অংশ থেকেই বোধহয় এ-ধরনের ইষ্ট-দেবতার বহু নামকরণের এসেছে মানসিকতা। 'শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম' তো

এখনও গ্রাম বাংলার প্রাচীন লোকদের মুখে মুখে হয় উচ্চারিত। একই দেবতার হাজার নতুন নাম আছে, এমন ঘটনাও নয় অপরিচিত। ভগবান বিষ্ণুই পরিচিত নতুন নতুন হাজার নামে। বিষ্ণু ও শিবের সহস্র-নামের জন্য 'মহাভারত'-এর ত্রয়োদশ অধ্যায় পারেন দেখতে। ১০৮ এবং ১০০৮টি' নতুন নতুন নামের গুরুত্ব কি, তা নিয়ে 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের বহু পৃষ্ঠাতে আলোচনাও পাবেন দেখতে। এবং এই সব সংখ্যা যে কি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল জনমানসে তার একটা প্রমাণ পাবেন বহু ধর্মগুরুর নামের আগে ১০৮ বার শ্রী শব্দের যোজনাতে। ১০৮ বার শ্রী শব্দ লিখতে গেলে দীর্ঘ হয়ে পড়ে বলে সংক্ষেপে এমন লেখা দেখবেন অনেক—শ্রী ১০৮।

কোন ইষ্টদেবতার ১০৮ বার ভিন্ন ভিন্ন নাম উচ্চারণকালে দেখবেন এমন সব এসেছে নাম যেগুলি অন্য-দেবতার। সেই সব নামের উপর অনধিকার প্রবেশ করানো হয়েছে যার যার ইষ্ট দেবতাকে। এটা যে একটা খেয়াল-খুশির ব্যাপার, তাও নয় ঠিক। এর পেছনে আছে একটা গূঢ়ার্থ, যার বক্তব্য এই যে,—অন্যান্য দেবতারা আর কিছুই নন, নামকীর্তনকারীর ইষ্টদেবতারই একটা ভিন্নরূপে প্রকাশ।

এই চিন্তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে একীকরণের ইচ্ছা,—ভারতীয় মানসিকতায় সমন্বয়ের যা বৈশিষ্ট্য। এবং এই মানসিকতা থেকেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এক হয়ে সৃষ্টি করেছে 'ত্রিমূর্তি'। হরি এবং হর হয়েছে এক (যাকে বলে হরিহর আত্মা)। শিব এবং শক্তি অবিচ্ছেদ্য ভাবে গেছে মিলে। 'দশমহাবিদ্যার' পেছনে আজ যে গল্প, মূলতঃ সেই ধরনের গল্পকথা অনুসারেই 'দশাবতার' কিনা, সে কথা নিশ্চিত হয়ে বলা যায়না এখনও। এমনও হতে পারে যে, দশটি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ভিন্ন শ্রেণী বা জাতি দ্বারা পূজিত, বিষ্ণুর যুগে যুগে আবির্ভাব সংক্রান্ত গল্পের মধ্য দিয়ে হয়ে গেছেন এক। যদিও অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা, বোধিসত্ত্ব ও জৈন তীর্থঙ্করদের অনুকরণে অর্থাৎ যুগে যুগে বোধিসত্ত্ব ও তীর্থঙ্করদের গল্পের অনুকরণে পরবর্তীকালে করা হয়েছে দশাবতার

কল্পনা। (A.L.Basham-এর 'The Wonder that India'-এর ৩০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এ-কথার প্রমাণ মিলবে 'বুদ্ধ'কে অবতার হিসাবে গণ্য করার মধ্যেই। 'বুদ্ধ' যে-ধর্ম প্রচার করেছিলেন,—তা যদিও উপনিষদেরই পরিণতি, যদিও ভারতীয়-চিন্তার মধ্যেই নিহিত তার মূল, তবুও ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী এক আন্দোলনরূপেই যে গড়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। অথচ সেই বুদ্ধকেই অনুপ্রবিষ্ট করানো হল বিষ্ণুর অবতারশীর্ষক গল্পে। ভারতের এটা সমন্বয়ী মনোভাবেরই একটা প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সেই সূত্র ধরেই বলা বোধহয় হবেনা দুঃস্পর্ধা যে, দেবীর দশমহাবিদ্যারূপ-ও—সেই একীকরণ মানসিকতারই প্রতিফলন। আগে হয়তো দেবীর এই দশমূর্তি দশটি বিভিন্ন উপজাতি বা অঞ্চল দ্বারা হতেন পূজিতা। তাঁদের বিভেদ ঘুচে গেল 'দশমহাবিদ্যা'-রূপে একই দেবীর প্রতিফলন হিসাবে দেখা দিয়ে।

ভারত এই মানসিকতার দ্বারাই শক-হূণকে করে নিয়েছে আত্মস্থ। শুধু পারেনি পাঠান, মোগল আর ইংরেজকে। কিন্তু সে-জন্য যে ভারতীয়-মানসিকতা নিশ্চেষ্ট ছিল তাও নয়। সবটা না হলেও কিছুটা সমন্বয় হয়েছিল হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতির। বাংলার বাউলেরা রাম, রহিম এবং খ্রীষ্টকে এক করে করেছে গান রচনা। হিন্দুমুসলিম মরমীয়াদের চেষ্টায় হিন্দুদের 'নারায়ণ' এবং মুসলমানদের 'পীর' মিলে সৃষ্টি করেছে 'সত্যপীর'। শিব এবং আলি, দুর্গা এবং ফতিমাকে এক করে হয়েছে গান সৃষ্টি। শক্তি ৺মায়ের এক শ্রেণীর উপাসক, এই জন্যই ৺মাকে একশ-আটটি নামে ক'রে বিভূষিতা বিভিন্ন ৺মায়ের রূপকে একবৃত্তে আনবার করেছেন চেষ্টা। পুরুষদেবতার মাতৃরূপকেও এই জন্যই এই নামের মধ্যে করিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রবিষ্ট। একীকরণের এই প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ 'মহাভারতে' হয়েছিল প্রথম। কিন্তু ৺মাকে ১০৮টি নামে বিভূষিতা করে ১০৮টি তীর্থস্থানের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে, এই প্রচেষ্টাকে চূড়ান্ত-সিদ্ধি দেওয়া হয় পুরাণে ; 'মৎস্যপুরাণ'-এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রয়েছে এই প্রচেষ্টা। সম্ভবতঃ এ অধ্যায়টুকু রচিত হয়েছে মধ্যযুগের

প্রথমার্ধে কখনও। যদিও 'মৎস্যপুরাণ' মূলতঃ বেশ প্রাচীন; তবে মৎস্যপুরাণের একীকরণ অংশটুকু যে পরের,—একরকম ধারণার কারণ, এতে রয়েছে এমন কিছু দেবতা ও স্থানের নাম, যেগুলোর গুরুত্ব ইতিহাসে এসেছে নির্দিষ্ট একটা সময়ে। যেমন, 'মৎস্যপুরাণে' শ্রীরাধার স্থান হিসাবে আছে বৃন্দাবনের উল্লেখ, এবং পুরুষোত্তমের স্থান হিসেবে পুরীর। কিন্তু মধ্যযুগের আগে এটা অসম্ভব। গুপ্তযুগের পরে ছাড়া আগে এসেছেন শ্রীরাধা ভক্তজনের সামনে, একথার প্রমাণ ইতিহাসে অন্ততঃ নেই কোথাও। আর পুরীর-পুরুষোত্তমও একাদশ-শতাব্দীর আগে আসেননি মুখ্য দেবতার স্থান নিয়ে। রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ (১০৭৪—১১৪৭খ্রীঃ) জগন্নাথ মন্দিরের ভিত করতেই ধীরে ধীরে পুরুষোত্তম উজ্জ্বল হতে থাকেন আপন মহিমায়।

কিন্তু 'দেবীকে' ১০৮টি নামে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা, যে সময়েই হোক না কেন—সেটা যে 'মৎস্যপুরাণেই' হয়েছিল চূড়ান্তরূপে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এতটুকু। 'স্কন্দপুরাণ'-এর অবন্ত্যখণ্ডের রেবাখণ্ড অংশে আছে ভদ্রকর্ণিকার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা। অনুরূপ ভাবে 'পদ্মপুরাণ'-এর সৃষ্টিখণ্ডেও আছে সাবিত্রীর নানা নাম। 'দেবী-ভাগবত' 'মৎস্যপুরাণ'-এর অনুকরণেই করেছে দেবীর ১০৮টি নাম চিত্রন। তবে 'দেবী-ভাগবত'-এর ক্ষেত্রে বিশেষত্ব এই যে, এতে দেবীর বিভিন্ন নামের সঙ্গে যুক্ত আছে বিভিন্ন পীঠ, অবশ্য সতীর বিভিন্ন দেহাংশ থেকেই যে এই পীঠের উদ্ভব, তার কোন উল্লেখ নেই এখানে। অথচ সতীর দেহাংশ থেকে তৈরী পীঠ সম্পর্কে 'দেবীভাগবত'-এর যে ছিল না কোন ধারণা, নয় তাও। কারণ, এতেই আছে এমন ইঙ্গিত, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় এ-কথা যে, 'দেবী-ভাগবত'-কার জানতেন, যেমন আছে 'সতীপীঠ' তেমনই আছে সতীপীঠের বাইরেও কিছু 'পীঠ'-এর নাম।

পীঠস্থানের সংখ্যাবৃদ্ধির ক্রম-ইতিহাস দেখেছি আমরা। ভাবসাব দেখে মনে হয়, লেখকদের স্বকপোলকল্পিতই অধিকাংশ,—সতীর নামে একীকরণের প্রচেষ্টা থেকেই সৃষ্টি। সম্ভবতঃ সতীর দেহ কিংবা দেহাংশের নামে নাম রেখে, আর কোন 'নতুন পীঠ' করা নয় সম্ভব—সেই

জন্যই 'দেবীভাগবত' সে প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছিল শেষপর্যন্ত। প্রচলিত 'নামষ্টোত্তরশতমে'র ভঙ্গীতে 'নতুন পীঠ' তৈরী করেছে সেই জন্য। 'দেবী ভাগবতে' আছে যে ১০৮টি পীঠের নাম, সে-জন্যই সেটা জানা প্রয়োজন প্রথম। ভবিষ্যতে হয়তো এই একশ-আটটি কখনও দাঁড়াবে হাজার-আটটিতে। 'দেবী ভাগবত' পারেনি যে সাহস দেখাতে 'ভাবী ভাগবত' হয়তো সেটাই দেখাবে। কারণ, লেখকের মর্জিতে পীঠসংখ্যা বাড়ে—'দেবীভাগবতে' আছে তার অকাট্য প্রমাণ। 'দেবী-ভাগবত' যে করেছে 'দেবী' এবং 'পীঠের'-এর নাম, তা হল :

(১) বিশালাক্ষি—বারানসী (২) লিঙ্গধারিণী—নৈমিষ (৩) ললিতা—প্রয়াগ (৪) কামাক্ষী, কামুকা বা কামুকী—গন্ধমাদন (৫) কুমুদা—মানস (৬) বিশ্বকায়া অথবা বিশ্বকামা—অম্বর (৭) গোমতী—গোমন্ত (৮)কামচারিণী—মন্দর (৯)মদোৎকটা—চৈত্ররথ (১০)জয়ন্তী—হস্তিনাপুর (১১) গৌরী—কান্যকুব্জ (১২)রম্ভা—মলয় বা অমলগিরি (১৩) কীর্তিমতী—একাম্র (ভূবনেশ্বর) (১৪) বিশ্বা বা বিল্বা—বিশ্বেশ্বর (১৫) পূরুহূতা—পুষ্কর (১৬) মার্গদায়িনী—কেদার (১৭) নন্দা অথবা মন্দা—হিমালয় (১৮) ভদ্রকর্ণিকা অথবা ভদ্রকণিকা—গোকর্ণ (১৯) ভবানী—স্থান্বিশ্বর বা থানেশ্বর (২০) বিল্ব পত্রিকা—বিল্বক অথবা বিল্বল (২১) মাধবী—শ্রীশৈল (২২) ভদ্রা বা ভদ্রেশ্বরী—ভদ্র, (ভদ্রেশ্বর অথবা মদ্রেশ্বর) (২৩) জয়া—বরাহশৈল (২৪) কমলা—কমলালয় (২৫) রুদ্রাণী অথবা কল্যাণী—রুদ্রকোটি (২৬) কালী—কালঞ্জর (২৭) কপিলা—মহালিঙ্গ (২৮) মুকুটেশ্বরী অথবা মঙ্গলেশ্বরী—কোট, মকোট বা কর্কোট (২৯) মহাদেবী—শালগ্রাম অথবা শালিগ্রাম (৩০) জলপ্রিয়া—শিবলিঙ্গ (৩১) কুমারী—মায়াপুরি (৩২) ললিতা—সন্তান (৩৩) উৎপলা অথবা উৎপলাক্ষি—সহস্রাক্ষ (৩৪)মহোৎপলা—সহস্রাক্ষ অথবা-হিরণ্যাক্ষ (৩৫)মঙ্গলা—গঙ্গা অথবা গয়া (৩৬) বিমলা—পুরুষোত্তম (৩৭) অমোঘাক্ষি—বিপাশা (৩৮) পাটলা—পুণ্ড্রবর্দ্ধন অথবা পুণ্যবর্দ্ধন (৩৯) নারায়ণী—সুপার্শ্ব (৪০) ভদ্রসুন্দরী অথবা রুদ্রসুন্দরী—ত্রিকূট (৪১) বিপুলা—বিপুল (৪২) কল্যাণী—মানসাচল অথবা মলয়াচল (৪৩) কোটভী—কোটিতীর্থ

(৪৪) সুগন্ধা—মাধববন বা মাধবীবন (৪৫) ত্রিসন্ধ্যা—গোরাশ্রম, গোদাবরী বা কুব্জাম্রক (৪৬) রতিপ্রিয়া অথবা হরিপ্রিয়া—গঙ্গাদ্বার (৪৭) শিবানন্দা, সুনন্দা অথবা সভানন্দা—শিবকুণ্ড, শিবকুঞ্জ অথবা শিবচণ্ড (৪৮) নন্দিনী—দেবীকাতীর (৪৯) রুক্মিণী—দ্বারাবতী (৫০) রাধা—বৃন্দাবন (৫১) দেবকী—মথুরা (৫২) পরমেশ্বরী—পাতাল (৫৩) সীতা—চিত্রকূট (৫৪) বিন্ধ্যবাসিনী—বিন্ধ্য (৫৫) একবীরা—সহ্যাদ্রি (পশ্চিমঘাট পর্বত) (৫৬) চন্দ্রিকা—হরিশ্চন্দ্র অথবা হর্মচন্দ্র (৫৭) রমনা—রামতীর্থ (৫৮) মৃগাবতী—যমুনা (৫৯) মহালক্ষ্মী—করবীর (৬০) উমা অথবা রূপা—বিনায়ক (৬১) অরোগা বা আরোগ্যা—বৈদ্যনাথ (৬২) মহেশ্বরী—মহাকাল (৬৩) অভয়া—উষ্ণতীর্থ বা পুষ্পতীর্থ (৬৪) অমৃতা, নিতম্বা বা মৃগী—বিন্ধ্যগুহা (৬৫) মাণ্ডবী বা মাণ্ডুকী—মাণ্ডব্য অথবা মাণ্ডব (৬৬) স্বাহা—মহেশ্বরপুর বা মাহেশ্বরীপুর (৬৭) প্রচণ্ডা—ছাগলাণ্ড, ছগলণ্ড বা ছাগলিঙ্গ বা বেগল (৬৮) চণ্ডিকা—অমরকণ্টক, মকরণ্ডক বা মরকঙ্কট (৬৯) বরারোহা—সোমেশ্বর (৭০) পুষ্করাবতী—প্রভাস (৭১) দেবমাতা—সরস্বতী (৭২) মাতা, পারা বা পাবা—পারাবতী বা সাগরতীর (৭৩) মহাভাগা বা মহাপদ্মা—মহালয় (৭৪) পিঙ্গলেশ্বরী—পয়োষ্ণী (৭৫) সিংহিকা—কৃতশৌচ (৭৬) যশস্করী, শঙ্করী বা অতিশঙ্করী—কার্তিকেয় (৭৭) লোলা—উৎপলাবর্তক (৭৮) সুভদ্রা—শোনসঙ্গম বা সিন্ধুসঙ্গম (৭৯) মাতালক্ষ্মী বা উমালক্ষ্মী—সিদ্ধপুর, সিদ্ধবন বা সিদ্ধবট (৮০) অঙ্গনা, অনঙ্গা বা তরঙ্গা—ভরতাশ্রম (৮১) বিশ্বমুখী—জালন্ধর (৮২) তারা—কিষ্কিন্ধ্যা পর্বত (৮৩) পুষ্টি—দেবদারুবন (৮৪) মেধা—কাশ্মীর (৮৫) ভীমা—হিমালয় (৮৬) পুষ্টি বা তুষ্টি—বস্ত্রেশ্বর বা বিশ্বেশ্বর (৮৭) শুদ্ধি, অথবা শুদ্ধা—কপালমোচন (৮৮) মাতা—কায়াবরোহণ (৮৯) ধ্বনি বা ধন্না—শঙ্খোধার (৯০) ধৃতি—পিণ্ডারক (৯১) কালা বা কলা—চন্দ্রভাগা (৯২) শিবকারিণী, শিবধারিণী, সিদ্ধিদায়িণী বা শক্তিধারিণী—অচ্ছোদ (৯৩) অমৃতা—বেনা (৯৪) উর্বশী—বদরী (৯৫) ওষধি বা ঔষধি—উত্তর কুরু (৯৬) কুশোদক—কুশদ্বীপ (৯৭) মন্মথা—হেমকুট (৯৮)

সত্যবাদিনী—মুকুট বা কুমুদ (৯৯) বন্দনীয়া বা বন্দিনীকা—অশ্বত্থ (১০০) নিধি—বৈশ্রবনগৃহ (১০১) গায়ত্রী—বেদবদনে (১০২) পার্বতী—শিবসান্নিধ্যে (১০৩) ইন্দ্রানী—দেবলোকে (১০৪) সরস্বতী—ব্রহ্মাস্যে (১০৫) প্রভা—সূর্যবিম্বে (১০৬) বৈষ্ণবী—মাতৃমধ্যে (১০৭) অরুন্ধতী—সতীমধ্যে (১০৮) তিলোত্তমা—রামামধ্যে (১০৯) ব্রহ্মকলা—চিত্তে (১১০) শক্তি—সর্বশরীরে।

যদিও আরম্ভ 'নামষ্টোত্তরশতম্' দিয়ে কার্যতঃ লেখকের অতি উৎসাহে ১০৮-এর বদলে এসে গেছে একশ-দশটি নাম। এ থেকেই স্পষ্ট, যত না ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত পীঠনির্ণয়কারীরা, তার-চাইতেও বেশী আবেগের দ্বারা। উপরে পীঠস্থানের নাম পড়লেই বুঝবেন, বহু নামই হল কপোলকল্পিত। খেয়াল-খুশি এবং স্বাধীন-মর্জি যে পীঠনির্ণয়ের ক্ষেত্রে কেমন স্বেচ্ছাচারী, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাবেন একটু লক্ষ্য করলেই। যেমন 'দেবী ভাগবত'-এর নামষ্টোত্তরশতমেই অতি প্রাচীন দুটি তন্ত্রপীঠ—কামরূপ-এর নাম নেই, উড্ডীয়ান-এরও নয়। কারণ হয়তো এই, তন্ত্রের আধিক্য লেখকের নিজের নয় মনের মত। সুতরাং, যদি মর্জিতে ডুবে ইতিহাস খেয়ালখুশির তখন একাধিপত্য। তাহলে সত্যকে জানব কি করে ?

প্রায় সর্বজন-পরিচিত একটি স্তোত্র তুলে দিচ্ছি, সাধারণতঃ বিপদে পড়লে যে-স্তোত্র পাঠের জন্য জ্যোতিষীরা দেন নির্দেশ, দেন পণ্ডিতেরাও, অর্থাৎ 'আদ্যাস্তোত্রম্'। এতেও পাবেন বিভিন্ন স্থানে শক্তি কি নামে বিরাজ করছেন অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে,—তার পরিচয়। যেমন,—

ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মালোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা
ইন্দ্রাণী চামরাবত্যাম্বিকা বরুণালয়ে॥
যমালয়ে কালরূপা কুবের ভবনে শুভা।
মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী॥
নৈঋ‍র্ত্যাং রক্তদন্তাচ ঐশান্যাং শূলধারিণী।
পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেব মোহিনী॥

সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা।
রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে ॥
বিরজা ঔড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্বতে।
কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী ॥
বারাণস্যামন্নপুর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী।
কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়ণী পরা ॥
দ্বারাকায়াং মহামায়া মথুরায়াং সুরেশ্বরী।
ক্ষুধাত্বং সর্বভূতানাং বেলাত্বং সাগরস্য চ ॥
নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী পরা।
দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী ॥
রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিণী।
চণ্ডমুণ্ডবধে দেবী রক্তবীজ বিনাশিনী ॥
নিশুম্ভশুম্ভমথিনী মধু-কৈটভ ঘাতিনী।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা ॥
ইদমাদ্যাস্তবং পুণ্যং যঃ পঠেৎ ভক্তি সংযুতঃ।
ইহ সর্ব্বমুখং ভুক্ত্বা ততো যাতি পরম্ পদম্ ॥

এই স্তোত্র পড়বার পর নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ থাকবেনা মনে যে, দেবীকে মাতৃরূপে বিরাজমানা দেখাতে লেখক হয়েছেন প্রচণ্ড রকমে আবেগের বশ। যে-যেভাবে পেরেছেন করেছেন গুণগান, সম্ভব অসম্ভবের বিচারও করেন নি অনেক সময়। যেমন 'আদ্যাস্তোত্রে'ই এক জায়গায় আছে এই শ্লোক দুটি :

পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী।
সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা।

স্পষ্ট বোঝা যায়, সিংহল এবং লঙ্কা যে এক, এ-ধারণাও ছিলনা লেখকের। (কিংবা সিংহল হল কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণামত গুজরাটের উপকূলে ?) ভূগোলের জ্ঞানের অভাবে যেমন পীঠস্থান বর্ণনায় দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করেছেন লেখকেরা, তেমনি করেছেন মূল-কাহিনী সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণার অভাবে স্বকপোলকল্পিত গল্পে। সমস্ত

ব্যাপারটাকেই অপার রহস্যে আবৃত করে দিয়েছেন শাস্ত্রকারেরা।

আরো সামান্য দুটো যদি দেই উদাহরণ, তাহলেই বোধহয় সন্দেহের উর্ধে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনাদের কাছে। এবং নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে তখন নতুন করে আপনারাও আবার ভাবতে বসবেন আমার মত। ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এ-ধরনের স্বাধীনতা, পৃথিবীর অন্যকোন দেশ দেখিয়েছে কিনা, জানিনা, একমাত্র 'বাইবেলে'ই আছে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের বৃত্তান্তকথন, যার ফলে কাহিনীতে সামান্য বর্ণনা ভেদ আছে সেখানে। কিন্তু 'শাক্তপীঠ' বর্ণনায় যে-ধরনের স্বাধীনতা দেখিয়েছেন হিন্দুশাস্ত্রকারেরা, অমন স্বাধীনতা বোধহয় চরসখোরেরও কল্পনার বাইরে। আসলে ভাবসাব দেখে মনে হয়, এই শাস্ত্রকারেরা এক একজন ছিলেন এক একজন ক্রিয়েটিভ্ জিনিয়াস্। তৎকালীন সাহিত্যের এমন স্বাধীনতা ছিলনা আজকের মত, ফলে ধর্মের আবরণে কাজ করত সৃজনশীল মন। এবং তারই ফলে, লেখকের স্রষ্টামনের স্বকীয়তায় হয়তো বা কোন কালের আশ্চর্য এক সত্য, শুধু একটা গল্প হয়েই দাঁড়িয়ে আছে আজ, আর কিছু নয়। 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর ইন্দ্রজিতের সঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদের যে সম্পর্ক, সেই রকম আর কি! মধুসূদনের রচনার উপর যদি স্কুল-কলেজে পাঠন-পঠনের প্রয়োজনে ভাষ্য রচিত না হত আজকের মত, এবং ইতিহাস লেখার বিদ্যা যদি এ-দেশে এখনও থাকতো মধ্যযুগের মতই, তাহলে হলফ করে কেউ বলতে পারেন না যে, 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র অনেক চরিত্রই সত্য বলে মনে হত কিনা অনেকের কাছে। এবং 'মেঘনাদ বধ কাব্য' পড়ে অনেকেই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতেন কিনা ঘটনাস্থানের সন্ধানে,—বর্তমান লেখক যেমন নিজে ঘুরছেন 'একান্নপীঠের' খোঁজে।

পীঠবিষয়ক রচনাকারেরা ক্রিয়েটিভ্ জিনিয়াসের তাড়নাতে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছেন এমন যে, স্থানকালের মূল্যটুকু পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারেন নি সুস্থভাবে। অনেক ক্ষেত্রে একটা বিরাট দেশ জুড়েই স্থাপন করেছেন একটি পীঠস্থান। ফলে, দেবীর প্রত্যঙ্গ খুঁজে সঠিক পীঠের হদিস পাওয়াই অসম্ভব।

কতদূর স্বাধীনতা নিয়েছিলেন লেখকেরা—ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর দক্ষযজ্ঞভঙ্গ অংশটুকু পড়লেই তা বুঝবেন। মুকুন্দরাম (কিংবা পরবর্তীকালে আর কেউ মুকুন্দরামের নামে ?) বলেছেন নয়টি ক্ষেত্রে দেবীর (সতীর) ঘটেছিল অঙ্গপতন যেমন ;—(১) ঘাটশিলা,—এখানে পড়েছিল সতীর বামপদ। দেবীর নাম রুক্মিণী। (এ-অঞ্চলের উপজাতিরা 'রঙ্কিণী' নামে এক দেবীর পূজা করত, কবি-কল্পিত রুক্মিণী কি তাঁরই নাম ?) (২) যাজপুর (উড়িষ্যা)—এখানে পড়েছিল সতীর দক্ষিণ পদ। দেবীর নাম বিরজা। (৩) রাজবোলহাট (হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের কাছে),—এখানে পড়েছিল সতীর বাম হস্ত। দেবীর নাম বিশাললোচনী। (৪) বালিডাঙ্গা (হুগলী জেলার ধনিয়াখালির কাছে),—এখানে পড়েছিল দেবীর দক্ষিণ হস্ত। দেবীর নাম রাজেশ্বরী। (৫) ক্ষীরগ্রাম (বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে),—এখানে পড়েছিল পৃষ্ঠদেশ। দেবীর নাম যোগাদ্যা। (৬) নগরকোট। এখানে পড়েছিল সতীর মস্তক, দেবীর নাম জ্বালামুখী। (৭) হিঙ্গ্‌লাজ,—এখানে পড়েছিল সতীর নাভি। দেবীর নাম হিঙ্গুলা। (৮) কামাখ্যা,—দেবীর মধ্য অঙ্গ পড়েছিল এখানে। দেবীর নাম কামরূপ-কামাখ্যা এবং (৯) বারাণসী,—সতীর বক্ষদেশ পড়েছিল এখানে। দেবীর নাম বিশালাক্ষি।

মুকুন্দরামের এ পীঠ-বর্ণনাকে কবিকল্পনার দৌরাত্ম্য ছাড়া আর নেই কিছু বলার। কন্‌খল থেকে সতীকে কাঁধে নিয়ে যাত্রা করে শিব যে বাংলাদেশের মাটিতেই করলেন কেন এত নর্তনকুর্দন তার ব্যাখ্যা লজিকের ভাষায় অসম্ভব। ভাঙ্‌খোর ধুত্‌রাখোর শিবের পক্ষেই বোধহয় এমনতর উল্লম্ফন-নৃত্য সম্ভব,—যিনি নাকি এক লাফে কন্‌খল থেকে বাংলায় এসে আবার তৎক্ষনাৎ চলে যেতে পারেন পাঞ্জাবে, সেখান থেকে বেলুচিস্থান এবং বেলুচিস্থান থেকে মুহূর্তের মধ্যে আসামে, অর্থাৎ ভারতের পশ্চিম-সীমান্ত থেকে এক লাফে পূর্ব-সীমান্তে। ভূগোলের জ্ঞান সামান্য থাকলেও এধরনের হাস্যকর চিন্তা করেনা কেউ। এ-ধরনের বর্ণনা পড়ে স্বভাবতই যা মনে হয়

তা হল এই: সত্যের যথার্থ কোন কেন্দ্র ছিল না পীঠস্থানের ব্যাপারে। স্বীয়-অঞ্চলের পীঠমহিমা বাড়িয়ে তুলতে (মুকুন্দরামের মূল বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলায় দামুন্যা গ্রামে) কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিতেন কবিরা এবং শাস্ত্রকারেরা সকলেই। পীঠনির্ণয়, যে গ্রন্থ বাঙ্গালীদের ভাবলোকের কাছে বিশেষ করে গ্রাহ্য, এবং সত্যিই যে গ্রন্থকে ধ্রুবসত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছে বাঙ্গালীরা, এবং যা থেকে এই একান্নপীঠের উৎপত্তি, সেখানেও (অন্ততঃ পীঠের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পড়বার পর মনে হয়) লেখক হয়েছেন স্বেচ্ছাচারী। অখ্যাত দেবস্থানও যেন পীঠের মর্যাদা পেয়ে জ্বলছে জ্বল জ্বল করে। 'পীঠনির্ণয়ে'র তালিকাভুক্ত চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নলহাটী বক্রেশ্বর কিংবা কিরীটকোণা, যশোর এবং কালীঘাটের কোন মূল্যই ছিলনা প্রাচীনকালে। অথচ 'পীঠনির্ণয়ে' সতীর অঙ্গপাতে এগুলি সবই মহাপীঠ। যদিও 'উড্ডিয়ান' এবং 'পূর্ণগিরির' মত কুলীন-তীর্থক্ষেত্রেরও স্থান নেই এতে। 'বিন্ধ্যাবাসিনীর' মত দেবীর নামও নেই, অথচ অস্পষ্ট মণিবেদ আর রত্নাবলী, এ-সবের নাম আছে মহাতীর্থ হয়ে। শুধু অঙ্গের অংশ নয়, হার, কিরীট, মন, প্রভৃতি বাস্তব ও অবাস্তবের পতন দেখিয়েও 'পীঠনির্ণয়ে' গড়ে তোলা হয়েছে নতুন নতুন পীঠ। বিচার করে দেখলে সন্দেহই যায় বেড়ে—বিশ্বাস হতে চায় না কাহিনী। তবু একান্নপীঠ আজ একান্নপীঠই। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সবার মনেই যেন ফুটে উঠে একটা উপাখ্যান—যে উপাখ্যানের নাম দক্ষযজ্ঞনাশ, যে উপাখ্যানের শেষ সতীর মৃত্যু, শিবের ক্রোধ, সতীস্কন্ধে শিবের নৃত্য, বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ কর্তন, দিকে দিকে দেহখণ্ডপাত এবং একান্নপীঠরূপে মহাপীঠের উদয়। এবং এ-সব শাক্ত পীঠের বর্ণনাদাতা 'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠনিরূপণ' গ্রন্থ। কখনও কখনও বা পাণ্ডুলিপিভেদে, কিংবা পাণ্ডুলিপি কপিকারকদের ত্রুটিতে, পীঠসংখ্যা বেড়েছে আরো একটি। একান্ন দাঁড়িয়েছে বাহান্নতে। কিন্তু সে সব কোন কিছু গ্রাহ্য না করে, যে তালিকা পেয়েছি 'পীঠনির্ণয়ে' চলুন তা নিয়েই এগুই বিনা দ্বিধায়।

মনের গভীরের সেই 'একাম্রপীঠ', যার উদ্দেশ্যে ছিল পিসিমার অভিযাত্রা বালবৈধব্য সময় থেকেই, নানা-তীর্থে পরিক্রমা, মণ্ডপ-ঘরে শুয়ে শুয়ে পিসিমার কাছে আমার গল্প শোনা, ছেলেবেলার বিশ্বাস আর কৌতূহল, সেই কৌতূহলের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি এবার। সুতরাং, আসুন, এবার যাত্রা শুরু করি সত্যি করেই।

॥ তিন ॥

'একাম্রপীঠ'এর উদ্ভবের পিছনে আছে একটা প্রাচীনগ্রন্থের কাহিনী; সে কাহিনীর যদি বর্ণনা না হয়, একাম্রপীঠ-এর গুরুত্ব থাকে অস্পষ্ট। কাহিনীর নামকরণ হতে পারে 'দক্ষযজ্ঞনাশ'। যদি 'শ্রীমদ্ভাগবতে' এ কাহিনী পড়েন কেউ, তাহলে আশ্চর্য এক নিশানা পাবেন আর্য অনার্যের সাংস্কৃতিক সংঘাতের। 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর কাহিনীতে এটা স্পষ্ট দিনের মত যে, শিব ছিলেন না আর্যদেবতা। তিনি নিজে স্বয়ং এবং তাঁর শিষ্যেরা বেদের কর্মকাণ্ডের দিতেন না কোন মূল্য। আবার দক্ষ, ভৃগু ও ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা করতেন বৈদিক কর্মকাণ্ড,—তাঁরাও পছন্দ করতেন না অনার্য সাধনা। নৈমিষারণ্যে বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞস্থানে শিবের পক্ষ ও দক্ষ প্রজাপতির পক্ষে এ নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক, তাতেই এটা প্রমাণিত স্পষ্ট ক'রে। তবে শেষপর্যন্ত জয় হয়েছিল শিবেরই, কর্ম-কাণ্ড-যজ্ঞের উর্ধে জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ জয়লাভ করেছিল অধ্যাত্ম-সাধনা। কিন্তু এখন আর আমাদের তত্ত্বকথা নয়,—গল্প কথা। সুতরাং তত্ত্ব বাদ দিয়ে আসা যাক উপাখ্যানেই,—যে উপাখ্যান থেকে উদ্ভব একাম্র শাক্ত-পীঠের।

অনেকদিন আগের কথা, যাকে বলে পুরাকাল, ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি, আদ্যাশক্তি মহামায়াকে আকাঙ্ক্ষা করলেন কন্যারূপে। সেজন্য আরম্ভ করলেন কঠোর তপস্যা। প্রজাপতির তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহামায়া প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কন্যারূপে তিনি আসবেন প্রজাপতির ঘরে। তবে, যেদিন দক্ষপ্রজাপতি তাঁকে করবেন অনাদর,

সেই দিনই করবেন দেহত্যাগ।

হলও তাই। কিছুদিন পরেই দক্ষপত্নী অসিক্নী প্রসব করলেন একটি কন্যা। দক্ষপ্রজাপতি বুঝলেন, এই কন্যাই মহামায়া। কন্যা সর্বগুণসম্পন্না হয়ে শশিকলার মত বাড়তে লাগলেন দিনের পর দিন। কন্যার সদ্‌বৃত্তি ও সৎকর্মের মানসিকতা দেখে দক্ষ তাঁর নাম রাখলেন —'সতী'।

সতী বড় হয়ে উঠতেই পতির জন্য আরাধনা করতে লাগলেন একাগ্রমনে। পতিরূপে শিব ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য নেই। সতীর তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে ব্রহ্মা ও নারদ একদিন দক্ষালয়ে এসে বললেন সতীকে, আশীর্বাদ করছি,—ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হোক। যে জগদীশ্বর মহাদেবকে তুমি পতিরূপে করছ প্রার্থনা, তিনিই হোন তোমার পতি।

শিব তোমাকে ছাড়া অন্য কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করেননি কোন দিন এবং করবেনও না কখনও।

সতীর প্রার্থনা পূরণ হল। তিনি হয়ে উঠলেন পূর্ণযৌবনা। দক্ষ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বিবাহ দিতে কন্যার। সতী, শিব ছাড়া আর কাউকে করবেন না বিবাহ। কিন্তু শিব কোথায় যে, তাঁর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন প্রজাপতি? শিব সমাধিপ্রাপ্ত দিন রাত্রি ব্রহ্মধ্যানে। এমন হলে হবে সৃষ্টি নাশ। সুতরাং সাবিত্রীকে নিয়ে ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীকে নিয়ে নারায়ণ একদিন এলেন শিবের কাছে। বললেন, ভগবন, পাণিগ্রহণ করতে হবে আপনাকে, নইলে যে সৃষ্টি যাবে ধ্বংস হয়ে। শিব বললেন, সেকি কথা! আমি থাকি ব্রহ্মধ্যানে, বিবাহে আমার ইচ্ছা নেই। কিন্তু সৃষ্টি রক্ষার কারণে যদি বিবাহ আমাকে করতেই হয় তবে এমন স্ত্রী আমার প্রয়োজন, যিনি যোগে হবেন আমার যোগিনী, কামে কামিনী, ব্রহ্মসমাধিতে নিষ্ক্রিয় শক্তি। তেমন কন্যা কোথায়?

ব্রহ্মা বললেন, এমন কন্যা আছে। তিনি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতী। কন্যা সর্বগুণসম্পন্না। যোগে পারবেন আপনার যোগিণী

হতে, কামে কামিনী, ব্রহ্মসমাধিতে নিষ্ক্রিয় শক্তি। আপনাকে পতিরূপে পাবার জন্যই তিনি মগ্ন তপস্যাতে।

শিব সম্মতি দিলেন কন্যার বর্ণনা শুনে। ব্রহ্মা এলেন দক্ষের কাছে—স্থির হল শুভ-পরিণয়ের দিন। শিব এবং সতীর বিবাহের আয়োজন হল মহা সমারোহে।

নির্দিষ্ট দিনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর দেবতাদের নিয়ে শিব এলেন দক্ষালয়ে। বিবাহ সম্পাদিত হল সমারোহে। শিব আত্মভুলে হলেন প্রকৃতিতে আকৃষ্ট। শিব-শক্তি মহানন্দে বিহার করতে লাগলেন দিনের পর দিন। পুরুষ এবং প্রকৃতির চঞ্চল সৃষ্টি লীলা।

কিন্তু অমঙ্গল এল অল্প দিনেই। শিব এবং দক্ষের মধ্যে গড়ে উঠল বিরোধ! বিরোধের কারণ দক্ষের অহংকার।

নৈমিষ্যারণ্যে বিশ্বস্রষ্টাগণ করছেন যজ্ঞ; এসেছেন প্রধান প্রধান দেবতা ও ঋষি, সবার সঙ্গেই অনুচরেরা। এলেন প্রজাপতি-দক্ষও। ব্রহ্মা আর বিষ্ণু বাদে আর সকল দেবতাই আসন ছেড়ে উঠে প্রজাপতিকে জানালেন শ্রদ্ধা। কিন্তু শিব আপন জামাতা হয়েও আসন ত্যাগ করে শ্রদ্ধা জানালেন না প্রজাপতি-দক্ষকে। দক্ষ-প্রজাপতি করলেন অপমানবোধ। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে দেবতাদের লক্ষ্য করে বললেন, —হে দেবগণ, এই নির্লজ্জ শিব থেকে লোকপালদের যশ নষ্ট হল এতদিনে! ব্রাহ্মণ আর অগ্নি সাক্ষী করে আমার বালহরিণনেত্রা কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছে শিব। সুতরাং সে আমার শিষ্য, জামাতা, আমি তার গুরুজন। তবু সে যজ্ঞস্থলে আসন পরিত্যাগ করে দাঁড়িয়ে আমাকে জানাল না সম্মান। আমার দুর্ভাগ্য, আমি এই দুষ্টচরিত্রের হাতে সমর্পণ করেছি আমার কন্যাকে। ক্রুদ্ধ দক্ষ অভিশাপ দিলেন শিবকে,—দেবতাদের তুমি অধম, সুতরাং দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে পারবেনা কোনদিন।

দক্ষের অভিশাপ শুনেও শিব চিত্তবিকলন দেখালেন না এতটুকু। তিনি যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন ধীর এবং স্থির। কিন্তু শিবের সঙ্গী নন্দী, প্রত্যুত্তরে দক্ষকে দিলেন অভিশাপ—যিনি শিব-নিন্দা

করলেন, তিনি আত্মতত্ত্ব ভুলে হবেন পশুর মত। ছাগলের মত হবে তাঁর মুখ।

দুই দলে বাধল বিরোধ। বিরোধকালে 'শ্রীমদ্ভাগবতে' উভয় পক্ষের যে বাদানুবাদ, তা থেকেই প্রমাণ হয়, এ-দ্বন্দ্ব দুটো সংস্কৃতির, দুটো মানসিকতার, অর্থাৎ আর্য এবং অনার্যের। কিন্তু এ-ইঙ্গিত আলোচনার মধ্যে বহুবার দিয়েছি আমি, সুতরাং সেসব তত্ত্বকথা থাক। আবার আসা যাক উপাখ্যানেই।

বিরোধ চলল বহুদিন। অহংকারী দক্ষের অহংকার বাড়তে লাগল দিনকে দিন। যজ্ঞ বন্ধ। কেউ সাহস করছে না যজ্ঞ করতে, কারণ যজ্ঞ করলে সে যজ্ঞ হবে শিবহীন। শিবকে জানানো চলবেনা আমন্ত্রণ, দক্ষ প্রজাপতির নির্দেশ। সুতরাং যজ্ঞ হচ্ছেনা, যজ্ঞ লোপ পাবার উপক্রম। অমঙ্গলের চিহ্ন চারদিকে। দেখেশুনে দক্ষ-প্রজাপতি নিজেও গুণলেন প্রমাদ। কিছু একটা করতেই হবে। সুতরাং যজ্ঞ-রক্ষার জন্য নিজেই এগিয়ে এলেন দক্ষ। গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বার এবং কনখল এই উভয় স্থানকেই বলা হয় গঙ্গাদ্বার) করলেন বিরাট যজ্ঞের আয়োজন। দিকে দিকে নিমন্ত্রণ গেল দেবতাদের কাছে, ঋষিদের কাছে,—শুধু নিমন্ত্রণ পেলেন না শিব। আপন কন্যা সতীকেও নিমন্ত্রণ জানালেন না দক্ষ।

নিমন্ত্রণ না জানালেও সতী কিন্তু শুনতে পেলেন পিতার যজ্ঞায়োজনের কথা। কিন্তু পিতার যজ্ঞে সকলদেবতা নিমন্ত্রণ পেলেও শিব পেলেন না কোন আমন্ত্রণ।

দক্ষ-প্রজাপতি 'বাজপেয়-যজ্ঞ' শেষে আরম্ভ করলেন 'বৃহস্পতিসব-যজ্ঞ।' আকাশচারী দেবতা ও দেবপত্নীদের মুখে, সেই যজ্ঞের কথা শুনে চিত্ত বড় বিচলিত হল সতীর। শিবের কাছে এসে বললেন—'পিতার যজ্ঞে যাচ্ছেন দেবগণ। আসবেন আমার ভগ্নি এবং আত্মীয়রাও। বড় ইচ্ছা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আমিও যাই সেই যজ্ঞে; গ্রহণ করি পিতৃদত্ত বসন ভূষণ। বহুদিন দেখিনি আত্মীয়স্বজনকে, চিত্তবড় ব্যাকুল। যজ্ঞস্থানে সকলেরই পাব দেখা। তাছাড়া বড় কৌতূহল

হচ্ছে এত বড় যজ্ঞ দেখার। আপনি দেবাদিদেব মহাদেব, সকল কিছুর উৎস, সুতরাং কোন কিছুর জন্যই আপনার নেই কৌতূহল। কিন্তু আমি স্ত্রীজাতি, রমণীস্বভাব, আমার কৌতুহল অপার।

শিব বললেন, হে দাক্ষায়ণী! দক্ষ তোমার পিতা হলেও তাঁকে দর্শনের ইচ্ছা অনুচিত। কারণ, বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞে, বিনা অপরাধে তিনি দুর্ব্যবহার করেছিলেন আমার প্রতি। আমার ভয়, যজ্ঞে গেলে তুমি হবে অপমানিতা, অমঙ্গল হবে তোমার।' মনক্ষুন্ন সতী, প্রত্যুত্তর করলেন না শিবের কথার। কিন্তু স্বজন-সন্দর্শনের ব্যাকুলতায় মনের মধ্যে দগ্ধ হতে লাগলেন অহরহ। ব্যাকুলচিত্তে করতে লাগলেন ঘর বার. কখনও করতে লাগলেন অশ্রুত্যাগ,—কখনও বা কম্পিত হতে লাগলেন ক্রোধের বশে।

দক্ষযজ্ঞনাশ এই উপাখ্যানে, বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে নেই মিল। 'শ্রীমদ্ভাগবতে' আছে, এর পরে অন্তর্দাহ সহ্য করতে না পেরে, স্বামীর কথা অবহেলা করে, সতী একাই যাত্রা করলেন পিতৃগৃহে। আবার 'মহাভারত'-এর শান্তিপর্বে আছে, মহাদেব সতীকে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি না দিলে ক্রোধে সতী ভীষণাকার ধারণ করে হলেন—মহাকালী। ভয়ঙ্কররূপা সতী তারপর কোটি যোগিণী আর বীরভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষযজ্ঞে গিয়ে করলেন যজ্ঞনাশ। কিন্তু দশমহাবিদ্যারূপ গল্পে আছে, সতী শিবের ভীতি উৎপাদনের জন্য দশটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরে ভয় দেখিয়েছিলেন তাঁকে, যেমন,—কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা। তন্ত্রে আছে, সারাদিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুহূর্তের গুণ অনুসারে এক একটি মূর্তি ধারণ করেছিলেন সতী।

মহাদেব সতীকে অনুমতি না দিলে,—সতী হলেন ক্রুদ্ধা। ক্রোধ বশতঃ সতীর দেহ হল রূপান্তরিত। শিব দেখলেন, তাঁর সামনে ভীষণা কালীমূর্তি। তিনি নিজে অচেতন হয়ে শায়িত। সেই মহাশক্তির দক্ষিণ-পদ তাঁর বুকের উপর। এলোকেশী সেই মহাশক্তি চতুর্ভুজা, গলায় মুণ্ডমালা, পরনে কঙ্কাল। উর্ধ বাম হস্তে ভীষণ খড়্গ, নিম্ন বামহস্তে

নরমুণ্ড। ঊর্ধ এবং অধঃ দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদের ভঙ্গী। কালের চিদ্‌-শক্তিরূপে সতী তখন ভীষণা মহাকালী। যে-কোন ব্যক্তি বা দেবতারই এই মহাকালী রূপ দেখে ভীত হবার কথা, কিন্তু শিব ভীত হলেন না এতটুকু। তিনি নীরবে নিলেন মুখ ঘুরিয়ে। কিন্তু যে দিকেই তিনি তাকান, দেখেন, সর্বদিক আছন্ন করে সতী দাঁড়িয়ে আছেন নানা মূর্তিতে। কালীমূর্তির পরই শিব দেখলেন তারামূর্তি। ব্যাঘ্রাম্বর পরিহিতা তারা নির্বিকার শিবের বুকের উপর ভীষণা শক্তিমূর্তিতে দাঁড়িয়ে। এলোকেশী লোলজিহ্বা দেবী, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। উন্মুক্ত স্তনযুগল এবং নাভি। চতুর্ভুজের চার বাহুতে নাগ-অনন্ত। এবার হাতে নেই আশীর্বাদের কোন ভঙ্গী। চতুর্ভুজে শুধু মহা ধ্বংসের ইশারা। সেই ভয়ানক মূর্তি দেখে শিব মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। কিন্তু কোথায় তাকাবেন তিনি, সর্বত্রই যে সেই মহাশক্তি দাঁড়িয়ে, মূর্তি ধরে। শিব এবার দেখলেন,—অর্ধশায়িত পুরুষের অর্থাৎ তাঁর নিজের নাভি থেকে উঠেছে পদ্মের মৃণাল। সেই মৃণালমুখে সহস্রদল পদ্মের উপর আসীনা মাতৃমূর্তি, চতুর্ভুজা। মায়ের প্রত্যেক করেই ধৃত কমল। শিব দেখলেন, দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়েও মুক্তি নেই। যেদিকে তাকান সেদিকেই দেখেন মাতৃমূর্তি। এবার শিব দেখলেন—ভুবনেশ্বরী। পদ্মাসনে উপবিষ্টা আশ্চর্য রূপশালিনী দেবী, রূপের ছটায় আলোকিত দশদিক। দুই হাতে তাঁর আশীর্বাদ। একহাতে শাসন দণ্ড, আর একহাতে পাশ। শিব আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থেকে আবার ফিরালেন দৃষ্টি। এবার সামনে দেখলেন ভৈরবী মূর্তিতে সতীকে। মহাসলিল থেকে উঠেছে মহাপদ্ম, পদ্মে আসীনা, পদ্মে পদস্থিতা চতুর্ভুজা মাতৃমূর্তি। তাঁর ঊর্ধবাম এবং অধঃ-দক্ষিণকরে আশীর্বাদ। ঊর্ধদক্ষিণে শঙ্খ, অধঃ-বামে বেদ। আলোতে জগৎ আচ্ছন্ন করে আছেন ভৈরবী। আচ্ছন্ন শিব তাকিয়ে দেখলেন, তারপর আবার নিলেন মুখ ঘুরিয়ে। কিন্তু এবার তিনি দেখলেন যে ভয়াবহ মূর্তি, তার নেই তুলনা। তিনি দেখলেন, যুগল-মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিন্নমস্তা, উলঙ্গ শক্তিমূর্তি। দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, তাই দিয়ে তিনি ছিন্ন করেছেন নিজের মস্তক। বামহস্তে সেই

আলুলায়িতাকেশসম্পন্না মস্তক আছেন ধারণ করে। দুই ধারে উলঙ্গা আলুলায়িতাকেশা দুই সখী। তিন ধারায় রক্ত ছুটে ফেনিল উচ্ছ্বাসে ঊর্ধ্বে উঠে ধনুকের মত বঙ্কিম ভঙ্গীতে পড়ছে নিচে। সেই তিন ধারার একধারা নিজের ছিন্নমস্তকে পান করছেন দেবী। বাকী দুই ধারা পান করছেন দুই সখী। হেন ভয়াবহ চিত্র অবিশ্বাস্য। চমকিত হয়ে শিব ফেরালেন দৃষ্টি। কিন্তু এবার দেখলেন তিনি আরও ভয়ের মূর্তি। মহাকালের নির্মমরূপিণী শক্তি ধূমাবতী সামনে দাঁড়িয়ে। নিষ্ঠুর নির্মম মরুভূমির মত সময়ের চলছে হাহাকার। তাতে নিরাভরণা বৃদ্ধা বিধবার বেশে কাকধ্বজ যমরথে বসে ধূমাবতী। মৃত্যুর বার্তাবহ কালো কাক আশেপাশে। নির্মম মহাকালের মত কর্কশ। কুলাহাতে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড এক অমঙ্গলের প্রতীক ধূমাবতী। শিব শিহরিত হলেন সেই মূর্তি দেখে, অন্তরে সন্তবতঃ কম্পন করলেন অনুভব। ভয়ে তিনি আবার ফেরালেন মুখ। কিন্তু এবার তিনি দেখলেন আরেক মূর্তি, —বগলা রূপে সতী। সিংহাসনের উপর এক পা, আর এক পা নামিয়েছেন অসুরের উপর। রক্তবর্ণা রজোরূপিণী দেবী, সশস্ত্র অসুরের জিহ্বা আকর্ষণ করে রয়েছেন বামহস্তে, দক্ষিণহস্তে তুলেছেন প্রহরণ তাকে আঘাত করতে। নারীর মধ্যে শক্তির এমন বলিষ্ঠ প্রকাশ অভূতপূর্ব। শিব বিভ্রান্ত হয়ে আবার ফেরালেন দৃষ্টি। কিন্তু চোখের সামনে আবার তাঁর নতুন মূর্তি। এবার মূর্তি মাতঙ্গীর। চতুর্ভূজা ৺মা, ঊর্ধদক্ষিণ ও ঊর্ধবাম করে তরবারি ও গদা। অধঃ দক্ষিণকরে আবদ্ধ মুষ্টি। অধঃবামে পদ্মকলি। রাজরাজেশ্বরীর মত বস্ত্রবিভূষিতা, ৺মা বসে আছেন সিংহাসনে। রূপে অতুলনীয়া অথচ শক্তিতে তিনি দৃঢ়। শিব খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখে আবার ফেরালেন দৃষ্টি। এবার তিনি দেখলেন কমলারূপ। আদি সলিলে ভাসমান সহস্রদল পদ্মের উপর ৺মা, উপবিষ্টা রাজেন্দ্রাণীর মত। তাঁর আসন ভঙ্গী যোগাসন। অষ্ট ঐশ্বর্যশালিনী। উদ্ভাসিত রূপের ছটায়। দুই বাম-করে পদ্ম, দুই দক্ষিণকরে আশীর্বাদ। শিব ভাবতে লাগলেন আবার।

সতী দশমহাবিদ্যারূপে এই বিভিন্ন রূপ শিবকে দেখালেন কেন?

সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাপারটা খুব অস্বচ্ছ, কিন্তু তান্ত্রিকদের কাছে এর আছে একটা গূঢ়ার্থ। গূঢ়ার্থ এই ধরনের, যেমন—'প্রধান অব্যক্ত ব্রহ্ম থেকে ত্রিগুণের বিকাশ। গুণসাম্য প্রকৃতিবীজ থেকে প্রথমে সৃষ্টি সত্ত্ব-প্রধান মহত্তত্ত্বের। মহত্তত্ত্ব নিহিত বীজ থেকে সত্ত্ব-প্রধান অহংকার-তত্ত্বের বিকাশ। অহংকার-তত্ত্বই হল অহংকৃত অবিদ্যা। অহংকার-পূর্ণ মায়া হল তমোগুণান্বিত তমসা। সৃষ্টিকালে প্রধানা প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট যে পুরুষ, তিনিই সর্বগুণান্বিত মহত্তত্ত্বে প্রতিভাত ঈশ্বর। সেই মহত্তত্ত্বের 'প্রকৃতি'-অংশ মহামায়া, রজোগুণান্বিতা, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্রীরূপে বিশ্ব-বীজ-স্বরূপা; অহংকৃতা অবিদ্যার উৎস, মহামায়া। মহত্তত্ত্বের পুরুষ হলেন সত্ত্ব গুণান্বিত শ্বেতবর্ণ মহাবিষ্ণু বা মহেশ্বর। তাঁরই অর্ধাঙ্গ রজোগুণান্বিতা রক্তবর্ণ ঈশ্বরী।

যখন কম-মতির সাধনকালে মহেশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় প্রকৃতির, তখন মহাকাল চান না প্রকৃতিকে ত্যাগ করতে। শক্তি তখন কর্ম-পথগামিনী,—তাই কালকে ভীত করতে স্বরূপ করেন প্রকাশ। দশদিকে তখন দেখা দেন 'দশমহাবিদ্যা'।

প্রথম মহাবিদ্যা—মহাকালের শক্তিদায়িনী মহাশক্তি কালী, এবং দ্বিতীয় মহাবিদ্যা—অনন্তদেশের (infinite space) প্রকৃতিরূপিণী, দেশ (space)-শক্তিদ্বারা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী। অনন্তশক্তি তাঁরা তাই অনন্তনাগ বেষ্টিতা হয়ে ঋষিদের ধ্যানদৃষ্টির প্রতিমা। প্রতিমা সবই ধ্যানরূপ। আকাশই হল দেশ এবং কাল। কালী এবং তারা সেই কাল ও দেশশক্তি। সর্বশক্তির আধার এই আকাশ, তারই প্রতিমা কালী এবং তারা। সেই আকাশ থেকে উৎপত্তি সর্বশক্তি-সম্পন্না চিরযৌবনা ষোড়শীর, কারণ, শক্তির বল চিরকালই অক্ষুণ্ণ। ষোড়শী চিরযৌবনা। ষোড়শী সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠা,—তাই রাজরাজেশ্বরী। শক্তিই ঈশ্বরের বলবীর্য। তাই সর্বশক্তিরূপিণী রাজরাজেশ্বরীকে ধ্যান করেন পঞ্চদেবতা। কারণ, এই আদ্যাশক্তিই তাঁদের উৎস। কালী-তারা-মহাবিদ্যা থেকেই এই ষোড়শীর উৎপত্তি। চতুর্থ শক্তি ভুবনেশ্বরী। শক্তির দুইরূপ—কোমল এবং প্রচণ্ড। ভুবনেশ্বরী শক্তির

মনোহারিণী রূপ। ভৈরবী চণ্ড-শক্তি। অষ্টবিধ প্রচণ্ডতায় বিভক্ত হয়ে তন্ত্রের অষ্টনায়িকা। ভৈরবীই আবার ছিন্নমস্তা, ষষ্ঠবিদ্যা। ভগবতী সকল মূর্তিতেই বিশ্বপালিকা। কারণ, তিনি যেমন সৃষ্টির কারণ, তেমনই স্থিতিরও মূল। ছিন্নমস্তারূপে পালিকাশক্তি প্রবল হলে, প্রকৃতি ভৈরবী থেকে ভিন্ন। ছিন্নমস্তার তিন রুধিরধারাতে আছে অন্নপূর্ণার ত্রিধাশক্তি। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগরূপে জগতের অন্নস্বরূপ হল অন্নপূর্ণা, তাই তাঁর রুধির হল ত্রি-ধারা। জগৎ-ভোক্তারূপে নিজ জগদ্দেহ থেকে ভোগ্য সংগ্রহ করছেন প্রকৃতি। আবার ভোগ্য অন্নকে আপনিই ভোগ করে পরিপুষ্ট ও পালিতা হচ্ছেন নিজেই। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ, এই তিনই পৃথক শক্তিরূপে বিরাজমানা, একই মহামায়া। ভোক্তা থাকতে পারে, ভোগ্যও থাকতে পারে, কিন্তু ভোগ না হলে নেই পুষ্টি। জগতের পালনের জন্যই ভোগ। তাই ত্রিরুধির-ধারার একটি ভোগধারা ছিন্নমস্তা পান করছেন স্বয়ং এবং অপর দুইধারা পান করছেন একাত্ম দুইসখী ভোক্তা এবং ভোগ্য, শক্তিরূপা। সেইজন্য স্বতন্ত্রদেহী। ছিন্নমস্তায় আছে অন্নপূর্ণার জগৎপালন রীতি। কিন্তু ভোগই-তো নয় শেষ কথা। ভোগ শেষ হলেই হয় প্রলয়। তাই ছিন্নমস্তার পর শক্তি হলেন প্রলয়রূপিণী ধূমাবতী। জগতের ভোগ শেষ হলে জরাজীর্ণা ভগবতী আসেন বৃদ্ধাবেশে, কাকধ্বজ যমের প্রলয় রথে চড়ে, ক্ষুধাতুরা ও বিস্তৃতবদনা হয়ে। সকল সৃষ্টিকে কুলায় সংগ্রহ করে নিজের উদর পূর্ণ করেন তিনি। ধূমাবতী তাই প্রলয়রূপিণী ভৈরবীর ভয়ঙ্করী মূর্তি। অষ্টম মূর্তি রক্তবর্ণা, রজোরূপিণী বগলা। এই মূর্তিতে দেবী ঘোর বেদবিরোধী অসুরকে করেন বিনাশ। সেই অসুর নাশে যে জ্ঞানের উদয়,—সেই নির্মল জ্ঞানরূপিণী ভগবৎশক্তিই মাতঙ্গী। মাতঙ্গী মূর্তিতে বিশ্বরূপিণী শক্তি অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা-নাশিনী, কৃষ্ণাঙ্গী, তমোরূপিণী শক্তি। এই সমস্ত শক্তিধারিণী হয়ে শক্তি অষ্ট-ঐশ্বর্যশালিনী কমলারূপে জগৎ-ব্যাপিণী। সর্বত্রই তাঁর ঐশ্বর্য-মূর্তি। যে ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার কমল আসনরূপে কারণবারি থেকে সঞ্জাত, সেই কমলেই কমলার ব্রাহ্মীশক্তি

এবং অপর বিদ্যারও আসন। কেবল কালী ও তারা মূর্তিতেই ভগবতী মহাকাল ও মহাদেবরূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বেশ্বরের বক্ষারূঢ়। তাই এই কালী ও তারা মূর্তিই আসলে মহাবিদ্যা। অন্য আটটি মূর্তি তাই এই দুই-থেকে উৎপন্ন 'পরাপরবিদ্যা' ও 'সিদ্ধবিদ্যা' নামে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভক্ত। সুতরাং যে বিশ্বকমল ত্রিগুণময় হয়ে ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত, অষ্টবিদ্যার আসন স্বরূপ হল তাই। ব্রহ্মস্বরূপ শিব, শক্তির এই আশ্চর্য লীলা যখন বুঝলেন, তখনই পথ ছেড়ে দিলেন সতীকে পিতৃগৃহে যাবার জন্যে। কালের দুই মূর্তিতে শক্তির প্রকাশ—কর্মশক্তি ও ব্রহ্মশক্তি। এই শক্তি যখন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকেন কালের সঙ্গে, এবং ব্রহ্ম-শক্তি ও কর্মশক্তির মধ্যে যতক্ষণ রক্ষা পায় সাম্য, ততক্ষণই শক্তি। কিন্তু কেউ যদি কর্মশক্তির মদগর্বে ব্রহ্মশক্তিজ্ঞানহীন হয়ে শক্তিকে করে কালের অঙ্কচ্যুত, ধ্বংস তখন অনিবার্য। আত্ম-অহংকারে অহংকৃত দক্ষ, কালের কর্মশক্তিকে আহ্বান করেছেন যজ্ঞে। শক্তি-রূপিণী শক্তিকে তাই যেতেই হবে। কিন্তু শিবব্রহ্মশক্তিচ্যুত কালীর কর্মশক্তি জড় মাত্র। তা দিয়ে হবে না কর্মসিদ্ধি। তাই শক্তির আবির্ভাবে যজ্ঞ হবে পণ্ড মাত্র। হৃদি-চঞ্চলা সতীর দিকে তাকিয়ে শিব বুঝলেন, প্রকৃতি আবার আবির্ভূতা হতে চান নতুন রূপে। কিন্তু তবু কি আশ্চর্য মমতা সেই শক্তির প্রতি ব্রহ্মপুরুষের। শিব করতে লাগলেন বেদনা বোধ। প্রকৃতি সতী গমন করলেন দক্ষযজ্ঞে।

দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গে দশমহাবিদ্যার ভিন্ন রকমের গল্পও আছে এ-দেশে। রামেশ্বর চক্রবর্তী অনুসরণে হরিচরণ আচার্য লিখেছেন 'শিবায়ণ' নামে একটি গ্রন্থ। প্রকাশ করেছেন 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' বঙ্গাব্দ ১৩১৩ সালে। এতে দশমহাবিদ্যার কহিনী আছে এইরকম: মহাবিষ্ণু করলেন পুরুষ-প্রকৃতি সৃষ্টি। কিন্তু তাদের মিলন হলনা: 'নহিল মিলন, ভিন্ন রহিল আকৃতি।' এঁদের মিলন না হলে হবে না জীব-বৃদ্ধি। এ জন্য তিনি আদ্যাশক্তিকে বললেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কারো একজনের সঙ্গে মিলিত হতে। শক্তি তখন নারীরূপ গলিত শব-দেহে জলের উপর চললেন ভেসে। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সেই

গলিত শব দেখে গেলেন দূরে সরে। শুধু মহেশ্বর সেই শবকে থামালেন বিনা দ্বিধায়। শক্তি তখন উঠে বসে তাঁকে বললেন মহাবিষ্ণুর নির্দেশ। বললেন, বিবাহ কর আমাকে। মহাবিষ্ণু থেকে মহেশ্বরেরও সৃষ্টি। সুতরাং শক্তি ধর্মত: তাঁর ভগ্নি। মহেশ্বর রাজি হলেন না মিলনে। তখন শক্তি নৃমুণ্ডমালিনী কালীরূপ ধরে ভয় দেখালেন শিবকে। জলের উপর ভাসমান শিবের বুকের উপর দাঁড়ালেন ভীষণাকৃতি রূপ ধরে। শিব যখন তাতেও পেলেন না ভয় তখন দেখালেন তিনি তারা মূর্তি। তারপর একে একে ধরলেন আরও সাত মূর্তি—মহাবিদ্যা, ষোড়শী, বগলা, ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী, কমলা এবং ধূমাবতী। এতেও যখন শিব পেলেন না ভয় তখন শক্তি ধরলেন ছিন্নমস্তা মূর্তি। তখন শিব হলেন মিলনে রাজি। তবে শর্ত এই, দক্ষপ্রজাপতির ঘরে কন্যারূপে জন্ম নেবেন আদ্যাশক্তি। তবেই তাঁকে বিবাহ করবেন শিব। 'দক্ষযজ্ঞের' সঙ্গে যোগ থাকলেও এ-গল্পের উৎপত্তি হল ভিন্ন সূত্রে। যা নতুন করে প্রমাণ করে যে, একটা অস্পষ্ট কাহিনী নানারূপে প্রকাশ লাভ করেছে সময়ে সময়ে এবং লেখকের খেয়াল-মর্জিতে অতীত সত্য গেছে নষ্ট হয়ে। কিন্তু সে-কথা এখন আপাতত থাক। বরং এগুলো থাক 'একান্নপীঠের' উৎপত্তির দিকে।

শিবপত্নী একাকিনী চলেছেন পিতৃগৃহে, দেখে শিবের অনুচরেরাও চলল তাঁর পিছু পিছু। সতী দক্ষালয়ে এলেন যজ্ঞের আঙিনায়। কিন্তু দক্ষ তাঁকে জানালেন না বিন্দুমাত্র সমাদর, বরং সকলের সামনেই নানাভাবে করতে লাগলেন শিবের নিন্দা। সতী যজ্ঞস্থলে দেখলেন সকল দেবতাই উপস্থিত। প্রত্যেকেই আসীন আপন আপন আসনে। শুধুমাত্র দেবতাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, নেই সেই দেবাদিদেব মহাদেব। বেদনা-বিধুর সতী, পিতাকে বললেন : সংসারে যাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নেই, যাঁর নেই প্রিয় বা অপ্রিয়, কারো সঙ্গে নেই যাঁর বিরোধ, যিনি প্রাণীমাত্রেরই প্রিয়তম ও আত্মস্বরূপ, সেই দেবাদিদেব মহাদেব কেন নেই এ যজ্ঞে?

কন্যার প্রশ্নে ক্রুদ্ধ হয়ে, দক্ষ বললেন, 'সে শিব (মঙ্গল) নয়, সে অশিব। সর্ব নিকৃষ্ট সে দেবতাদের মধ্যে। কাজেই যজ্ঞে নেই তার স্থান।

শিবের নিন্দা শুনে প্রচণ্ড মর্মবেদনা অনুভব করলেন সতী। পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন—

'দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্ণন্তি কোচিন্ন ভবদৃশা দ্বিজ।
গুণাশ্চ ফল্গুন বহুলী কবিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভাবানঘম।'

অর্থাৎ 'হে দ্বিজ! আপনার মত হিংসাপরশ ব্যক্তিরা অপরের গুণ থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ করে দোষ, গুণ করেনা গ্রহণ; আবার, কারও দোষ এবং গুণ দুটো থাকলেও দোষমাত্র গ্রহণ না করে যাঁরা গ্রহণ করেন দোষ ও গুণ যেমন থাকে ঠিক তেমনি তাঁদেরই বলা হয় মহৎ। আর যে-সকল সাধুব্যক্তি কেবল গুণই গ্রহণ করেন, কখনও দোষ করেন না গ্রহণ, তাঁরা মহত্তর। কিন্তু যেসকল ব্যক্তি অন্যের দোষ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, অত্যন্ত তুচ্ছ গুণ থাকলে তাকেই মনে করেন অনেক বলে তাঁরা মহত্তম। আপনি সেই মহত্তম পুরুষের প্রতি করলেন পাপ কল্পনা।

সতী আরও বললেন, আপনি অহংকারের বশে দেবাদিব মহাদেবের করেছেন নিন্দা। লোকে যেখানে করে ধর্মরক্ষক স্বামীর নিন্দা, যদি নিন্দিতের স্ত্রী সেই নিন্দাকারকদের বিনাশ করতে না হয় সমর্থ, তবে তাঁর উচিত কর্ণদ্বয় রুদ্ধ করে প্রস্থান করা সেখান থেকে। যদি তার শক্তি থাকে তবে উচিত সেই অকল্যাণবচন প্রয়োগকারী দুরাত্মাদের ছেদন করা জিহ্বা এবং তারপরে প্রাণত্যাগ। এতেই সাধ্বী স্ত্রীর পাতিব্রত্য পায় রক্ষা। আপনি ভগবান শিতিকণ্ঠের নিন্দাকারী, অথচ আপনার দ্বারাই আমার উদ্ভব, সুতরাং এ-দেহ আমার আর ধারণ করা উচিত নয় কোন মতেই। অশুদ্ধ অন্ন ভক্ষণ করা হলে তা

যেমন ফেলতে হয় বমন করে, তেমনি আপনার ঔরসজাত এই দেহ, আমার উচিত ত্যাগ করা।

দক্ষকে এই ভাবে তিরস্কার করে সতী বসলেন সমাধিতে। করতে লাগলেন শিবের স্মরণ এবং মনন। তারপর ত্যাগ করলেন প্রাণবায়ু। সতীর অনুগামী শিবের অনুচরেরা কৈলাসে ফিরে এল হয়ে লাঞ্ছিত।

শিব, সতীর মৃত্যু সংবাদ পেলেন নারদের কাছে। মহাকাল প্রকৃতি-চ্যুতা হয়ে হারিয়ে ফেললেন তাঁর ভারসাম্য। ক্রুদ্ধ মহাযোগী প্রচণ্ড ক্রোধে ছিঁড়ে ফেললেন নিজেরই এক জটাজাল। সেই জটাজাল থেকে উৎপন্ন হল এক বিরাট পুরুষ, বীরভদ্র। বীরভদ্র জন্মলাভ করেই শিবের কাছে এসে বললেন, আমাকে কি প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন, আজ্ঞা করুন।

শিব বললেন, যাও দক্ষযজ্ঞ কর ধ্বংস।

'শ্রীমদ্ভাগবতে' বীরভদ্রের আছে এক আশ্চর্য বর্ণনা। বীরভদ্র ছিলেন মহাকায়। তার শরীর ছিল এত দীর্ঘ যে, স্বর্গলোক করে-ছিলেন তিনি স্পর্শ। মেঘের মত বর্ণ ছিল ঘোর কৃষ্ণ। বাহু—সহস্র-তেজ সূর্যের মত। জ্যোতি প্রখর। নয়ন তিনটি। করালদংষ্ট্র বীর-ভদ্রের জটাজাল ছিল আগুণের মত উজ্জল। গলায় ছিল নরকঙ্কালের মালা এবং সহস্র হস্তে নানাবিধ প্রহরণ। শিবের আজ্ঞা পেয়ে বীরভদ্র গর্জন করতে করতে চললেন দক্ষযজ্ঞ নাশের জন্য। শিবের অনুচরেরাও ছুটে চলল তার পেছনে। তাদের চরণাঘাতে এত ধুলিজাল উড্ডীন হল আকাশে যে, ঘন মেঘের মত তা ঢেকে দিল সূর্যের আলো। চতুর্দিকে ফুটে উঠতে লাগল নানা অমঙ্গলের লক্ষণ। সকলেই হলেন ভীত। সেই অমঙ্গলের চিহ্ন ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শিবের অনুচরদের নিয়ে বীরভদ্র এসে প্রবেশ করলেন যজ্ঞস্থলে। শিবের অনুচরেরা শুরু করল বিশৃঙ্খলা। পুরোহিত ও মুনিরা হলেন লাঞ্ছিত।

কাহিনীর ঠিক এই মুহূর্তে প্রাচীন 'ঋগ্বেদ' ও ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে রুদ্র কর্তৃক প্রজাপতিকে স্বীয় কন্যার উপর বলাৎকারের জন্য যে আছে শাস্তি দানের গল্প সেই কাহিনীকে আশ্চর্য কৌশলে ব্যবহার করেছেন

'শ্রীমদ্ভাগবতকার' 'দক্ষযজ্ঞ'নাশ গল্পে। যেমন, প্রাচীন গল্পে আছে, প্রজাপতি স্বীয় কন্যা দ্যৌ বা উষাকে করলে বলাৎকার দেবতারা রুদ্রকে ধরলেন বিদ্ধ করতে প্রজাপতিকে। রুদ্র প্রজাপতির দিকে করলেন শর নিক্ষেপ, যার ফলে প্রজাপতির হল রেতঃপাত। প্রজাপতি মানেই যজ্ঞ, সুতরাং তাঁর দেহের কোন অংশ বিনা প্রয়োজনে হতে পারেনা নষ্ট। ভগ বসেছিলেন যজ্ঞকুণ্ডের দক্ষিণ ধারে, তিনি তাকালেন এই রেতঃ-এর দিকে। কিন্তু এত তেজসম্পন্ন এই রেতঃ যে, তার দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দেবতারা তখন এই রেতঃ নিয়ে গেলেন পূষনের কাছে। পূষন অর্থাৎ সূর্য এই রেতঃ-এর স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে হারালেন দন্ত,...ইত্যাদি। সেই প্রাচীন 'ঋগ্বেদ' ও 'ব্রাহ্মণে'র কাহিনী 'শ্রীমদ্ভাগবত' নিজের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে আশ্চর্যভাবে, যেমন :

বীরভদ্র শিবের অনুচরদের নিয়ে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করেই শুরু করে দিলেন তাণ্ডব। ভৃগুমনি, যিনি নন্দীর সঙ্গে তর্ক করেছিলেন নৈমিষারণ্যে, তাঁকে বন্ধন করলেন মণিমান নামে এক শিবানুচর। বীরভদ্র স্বয়ং বন্ধন করলেন প্রজাপতিকে। চণ্ডেশ করলেন সূর্য এবং নন্দীশ্বর ভগদেবকে। তা দেখে অন্যান্য দেবতা, ঋষি ও পুরোহিতেরা পালাতে লাগলেন চতুর্দিকে। কিন্তু কেউ পেলেন না নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা। বীরভদ্র ছিঁড়ে ফেললেন ভৃগুমনির দাড়ি। কারণ, এই দাড়ি দেখিয়ে ভগবান শঙ্করকে তিনি করেছিলেন উপহাস। ভগদেবকে মাটিতে ফেলে তাঁর চোখ দুটি নিলেন উপড়ে, কারণ, যজ্ঞ সভায় শিবনিন্দুক দক্ষকে উৎসাহিত করেছিলেন তার চোখ দিয়ে। তারপর বীরভদ্র সূর্যদেবের দন্তরাজি উৎপাটন করে ভেঙ্গে ফেললেন নির্মমভাবে। কারণ, দক্ষ যখন পরমপূজ্য শিবের করেছিলেন নিন্দা, তখন সূর্য (পূষন) হেসেছিলেন দন্তবিস্তার করে।

'শ্রীমদ্ভাগবত' বর্ণিত গল্পের এই অংশ এবং প্রাচীন 'ঋগ্বেদ'ও 'ব্রাহ্মণে' বর্ণিত প্রজাপতি-রুদ্রের এই গল্প পড়ে কি মনে হয় আপনার? মনে হয় নাকি যে, কোনও ক্ষীণ একটা সূত্র ছিল দক্ষযজ্ঞনাশ কাহিনীর ? সেটা

মূল থেকে না বিচ্ছিন্ন হলেও ডালপালা ছড়িয়ে হয়েছে এমন বিরাট এক বৃক্ষ যে, অতীত স্মৃতিতে চেনাই তাকে কষ্টকর। ফলে, গল্প যে রূপ পাল্টায় লেখকের মর্জিমত, বর্তমান গল্পে আছে তার প্রমাণ। 'দক্ষযজ্ঞ নাশ' কাহিনীর উপসংহার আছে 'মহাভারতে'র শান্তি-পর্বে এইভাবে: তিনিই (সতী) ভদ্রকালীরূপে কোটি যোগিনী সহ বীরভদ্রের সহযোগে দক্ষযজ্ঞ করেছিলেন বিনাশ। আবার 'শ্রীমদ্ভাগবত' যে উপসংহার টেনেছে তা হল এই ধরনের, যেমন, বীরভদ্র এই ভাবে ভগ ও পুষন-(সূর্য)-কে শাস্তি দিয়ে ধরলেন দক্ষকে। দক্ষের উপর চেপে বসে তীক্ষ্ণধার অসিদ্বারা চেষ্টা করলেন তাঁকে ছেদন করার। কিন্তু চর্ম ভেদ করতে পারলেন না দক্ষের। অগত্যা যূপকাষ্ঠে পশুর মতন ফেলে, দক্ষের মস্তক করলেন ছেদন। এর পর বিজয় উল্লাসে ফিরে চললেন কৈলাসে।

দেবতারা 'দক্ষযজ্ঞ' সমাপ্ত না হওয়াতে পড়লেন চিন্তাতে। অবশেষে ব্রহ্মা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে পুনর্জীবন প্রার্থনা করলেন দক্ষের। দক্ষ মহাদেবের বরে প্রাণ ফিরে পেলেন ছাগমুণ্ড হয়ে। বেঁচে উঠে দক্ষ যজ্ঞ করলেন সমাপ্ত।

কিন্তু 'দক্ষযজ্ঞের' কাহিনী যদি এইভাবে হয় শেষ এবং শিব যদি সতীকে কাঁধে নিয়ে ভারত না করেন পরিভ্রমণ, তাহলে পারেনা 'একান্নপীঠের' উদ্ভব হতে। সুতরাং যাঁরা শাক্তমহিমা প্রচারে উদ্যোগী, তাঁরা গল্পের সমাপ্তি টানলেন ভিন্ন ভাবে। যেমন, শিব বীরভদ্রকে দক্ষযজ্ঞ নাশের আদেশ দিয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা ও অন্যান্য সুরগণকে নিয়ে প্রজাপতির যজ্ঞস্থল কন্‌খল তীর্থে গমন করলেন নিজে। বীরভদ্র ইতিমধ্যে দক্ষের মস্তক স্কন্ধচ্যুত করে আহুতি প্রদান করেছেন যজ্ঞে। শিব ও ব্রহ্মাদি দেবতারা যখন এলেন, তখন দক্ষের নেই প্রাণ। কিন্তু শিবের কৃপায় ছাগমুণ্ড হয়ে দক্ষ আবার ফিরে পেলেন জীবন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে দক্ষ করতে লাগলেন শিবের স্তুতি। কন্‌খলে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে এখানে শিবের নাম তাই 'দক্ষেশ্বর'।

কিন্তু দক্ষের তত্ত্বজ্ঞান লাভেই যদি গল্প হত শেষ, তাহলে 'একান্ন-

পীঠে'র হতনা উদ্ভব। সেই জন্য গল্প এগিয়ে গেল আরও। মুহ্যমান শিব দক্ষকে পুনর্জীবন দান করে সতীকে স্কন্ধে নিয়ে বেরুলেন ত্রিভূবন পরিক্রমায়। শিবের স্কন্ধে মৃতদেহ থাকে অবিকৃত, সুতরাং সতীর দেহের ঘটলনা কোন পরিবর্তন। কিন্তু শিবকে এই মৃত পত্নীর মোহ থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন, সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি প্রবেশ করলেন সতীর দেহে, তারপর খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে লাগলেন চতুর্দিকে। মতান্তরে, বিষ্ণু স্বীয় চক্র দ্বারা সতীর দেহ কেটে দিলেন টুক্‌রো টুক্‌রো করে। ঐ সকল দেহাংশ পড়ল যে-সকল স্থানে, সেই সকল স্থানই হয়ে উঠলো এক একটি শাক্তপীঠ। এবং শিব প্রত্যেকটি স্থানে লিঙ্গরূপে বিরাজ করতে লাগলেন ভৈরব হয়ে।

'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠনিরূপণে'র মতে, সতীর দেহ একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল দেশের একান্নটি অংশে, সেই থেকেই গড়ে উঠেছে 'একান্নপীঠ'।

'একান্নপীঠে'র উদ্ভবের পেছনে প্রাচীন কাহিনী এই। তবে এ কাহিনী বর্তমান পাঠক বিশ্বাস করবেন কি করবেন না—সেটা নির্ভর করবে তাঁর নিজের উপর। কিন্তু সমস্ত কাহিনীর মধ্যে শিবশক্তি একাত্মতার আছে একটি বড় রকম অর্থ। সেটা হল পুরুষ এবং প্রকৃতির তত্ত্ব। পুরুষ কি এবং প্রকৃতির স্বরূপই বা কি, এবং এ-দুয়ের মধ্যে কী সম্পর্ক, তার একটা ইঙ্গিত আছে এখানে। শিব ছাড়া সতী বা শক্তির উপস্থিতি অসম্ভব, আবার সতী ছাড়া বা শক্তি ছাড়া শিব বা পুরুষও অর্থহীন। এ জন্য সতীর দেহ একান্নখণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে পড়লেও স্বয়ং লিঙ্গরূপে শিব বিরাজ করছেন সেখানে। কারণ, শক্তি কখনও একা থাকতে পারেন না কোথাও, তাঁর আধারই হল পুরুষ। আবার পুরুষও কখনও একা থাকতে পারে না কোনখানে, কারণ—তাঁর গুণই হল প্রকৃতি। এই যে দুরুহ একটা অধ্যাত্ম তত্ত্ব, সমস্ত গল্পের অন্তরালে সেটাই পরিস্ফুট অত্যন্ত স্পষ্ট করে। পুরুষ ও প্রকৃতির রহস্যময় এই স্বরূপ বুঝলে তবেই শিবসতী কাহিনীর সার্থকতা। তা না হলে বাস্তব দৃষ্টিতে এটা কেবল গল্প মাত্র বা ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিচার করলে

আর্য-অনার্য সংঘাতের একটা রেকর্ড শুধু। ইতিহাসের ইঙ্গিত আমরা সারা রচনা ভরেই দিয়েছি অনেকবার, এবার পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অধ্যাত্ম তত্ত্বের আলোচনা।

'একান্নপীঠে'র ইতিহাস যুক্ত ৺মায়ের অর্থাৎ শক্তি, অর্থাৎ সতী, অর্থাৎ আদি জননীর সঙ্গে। যেখানেই সেই দেহখণ্ড, সেখানেই তা এক একটি মাতৃরূপ। কিন্তু ৺মায়ের যথার্থরূপের কল্পনা সত্য সত্যই বড় কঠিন। ৺মা প্রথম আবির্ভূতা হয়েছিলেন সকল জাতির কাছেই মাতা ধরিত্রী হয়ে। উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসাবেই পূজো করতেন তাঁকে সকলে। কিন্তু সেই ৺মায়ের কল্পনায় অধ্যাত্ম দর্শনের ছিলনা সত্যতা। ৺মা, যিনি উর্বরা শক্তির প্রতীক, তিনি একক হতে পারবেন না কখনও। চাই দুই। সেই জন্যই সম্ভবতঃ মহেন-জো-দড়োতে কল্পনা লিঙ্গ এবং যোনির! কিন্তু এই দুই প্রতীকের পূজারীকে আর্যরা করতেন ঘৃণা, বলতেন 'শিশ্নদেবাঃ'। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে নিশ্চয়ই তারা বুঝতে পেরেছিলেন এই অনার্য প্রতীকের মূল্য, তাই পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে এই প্রতীককেই মূল্য দিয়ে নিজেরাই করেছিলেন সিদ্ধিলাভ। যে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য ছিল আর্যদের মধ্যে, সেই পুরুষ দেবতাদেরও আর কখনও একা রাখেননি তারা। তাঁর শক্তি হিসাবে পাশাপাশি তৈরী করেছেন মাতৃমূর্তি, যেমন, বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মী, ব্রহ্মার পাশে সাবিত্রী, শিবের পাশে শক্তি, সতী, উমা দুর্গা বা কালী।

সম্ভবতঃ অনার্যদের সংস্পর্শে আসবার পরই আর্যরা বুঝতে পেরেছিলেন এই দ্বৈতরূপের যথার্থতা।

'পুরুষ' এবং 'প্রকৃতি' শব্দ দুটি সাংখ্যের। সাংখ্যকার বিশ্বরহস্য বিশ্লেষণের পর তবেই পেয়েছিলেন পুরুষ-প্রকৃতির সন্ধান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সৃষ্টির মূলে আছে দুই—একটি স্থায়ী আর একটি অস্থায়ী। ক্রমবিকাশ মানেই পরিবর্তন। কিন্তু যত পরিবর্তই হোক না কেন, মূল থেকে সে কখনও নয় বিচ্ছিন্ন। আলো এবং অন্ধকার, স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তন, এ-দুটো চিরকালই পাশাপাশি। অন্ধকারের ধারণা না থাকলে আলোর ধারণা অসম্ভব। পরিবর্তন না থাকলে

স্থায়িত্ব কাকে বলে বোঝা ভার। 'সাংখ্য-দর্শন' তাই বিশ্বরহস্য ভেদ করতে পুরুষকে করেছে স্থায়িত্বের এবং প্রকৃতিকে পরিবর্তনের প্রতীক। 'বৈদিক-দর্শনে' এই পুরুষকেই বলা হয়েছে 'ঈশ্বর' এবং প্রকৃতিকে 'মায়া'। 'ঈশ্বর' হলেন পরিবর্তনশীল এই জগতের অন্তরালে অপরিবর্তনীয় সত্য। বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে কল্পনা করেছেন এই 'পুরুষ' এবং শ্রীরাধাকে 'প্রকৃতি' রূপে। অপরপক্ষে শৈবরা শিবকে করেছেন পুরুষের প্রতীক, এবং শক্তিকে প্রকৃতির।

প্রকৃত সত্য হল একটি চিৎ (চেতনা)-ঘন সত্তা। প্রকৃত সত্যের গুণ যদি হয় চেতনা, তাহলে চেতনার উপাদানও নিশ্চয়ই থাকবে তাঁরই মধ্যে। এই চেতনা কাজ করতে পারে কেবলমাত্র দ্বৈত দিয়েই। চেতনা শব্দের অর্থই হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন, যদি না চেতনালাভের জন্য থাকে অন্য কিছু। এই 'অন্য কিছু'—যিনি চেতনা লাভ করবেন যদি তাঁর মূল সত্তা থেকে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন, তা হলে তাকে চেতনার মধ্যে আনা সম্ভব নয় কখনই। সুতরাং সেই চেতনালভ্য বিষয়েরও প্রয়োজন আছে চেতনালাভকারীর সমচরিত্র হওয়া। আমরা কখনও যা নই, তাকে জানতে পারিনা কোনমতেই। সেই জন্য জ্ঞান সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হল আত্মজ্ঞান। আবার এটাও সত্য যে, আমাদের থেকে যা সম্পূর্ণ পৃথক, তাকেও পারিনা জানতে। আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হবে আমাদেরই সম চরিত্রের, অথচ আমাদের চাইতে পৃথক। দ্বৈতের এটা হল এক রহস্যময় অবস্থা। প্রত্যেক জ্ঞানের ক্ষেত্রেই আমরা প্রথমে করি জ্ঞাতব্য বিষয় এবং জ্ঞাতার মধ্যে ভেদ সৃষ্টি। এই ভেদ সৃষ্টির পরই আবার আরম্ভ করি অভেদ। খ্রীষ্টান দার্শনিকেরা সত্যের এই স্বরূপ উপলব্ধি করেই বলেছেন, আত্ম নিজেকেই নিজে থেকে করে বিচ্ছিন্ন আবার নিজের কাছেই ফিরবে বলে (The self separates itself from itself to return to itself, to be itself.)

যদি চেতনা সম্পর্কিত এই ধারণা হয় সত্য, তাহলে আমরা মূলকে ডাকিনা যে নামেই—আল্লা, গড্, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তিনিও নিশ্চয়ই আত্মচেতন। যদি চেতনক্রিয়া থাকে তাঁর মধ্যে, তাহলে অবশ্যই

থাকবে পৃথকীকরণও। কিন্তু এই পৃথকীকরণের ফলে ঐশ্বরিক যে সর্বাত্মতা, তা নষ্ট হয় না কখনও। এবং সর্বাত্মতা রক্ষা করেও চেতনলভ্য বস্তু তৈরি করেন তিনিই, এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেই করেন নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি। মূল সত্তা যখন অনন্ত, তখন যে বিষয়ের মাধ্যমে সেই অনন্ত সত্তা নিজেকে করেন উপলব্ধি, তাও নিশ্চয়ই অনন্ত। সেই অনন্তচেতনা নিজেকে করেন বিচার, আবেগ এবং ইচ্ছার মাধ্যমে অনুভব।

অনন্তের এই যে অধ্যাত্ম লীলা, যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেন এ সম্পর্কে, তাঁরাই শুধু বোঝেন। তাই পৌত্তলিকতাবিরোধী খ্রীষ্টানেরাও একইভাবে হিন্দুদের মত এই আশ্চর্য লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন অনন্তের। খ্রীষ্টধর্মের যে তত্ত্ব সেটা হিন্দুদের উপরের ধারণার মতই। ঈশ্বর বা ব্রহ্মণ যেমন আমাদের ক্ষেত্রে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে করেন অনুভব বা উপভোগ, তেমনই খ্রীষ্টানদের পিতা করেন খ্রীষ্টের মধ্যে। অবশ্য এই খ্রীষ্ট নয় দেহধারী খ্রীষ্ট, 'Trinity'র খ্রীষ্ট তিনি, অধ্যাত্ম। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই পিতা চিরকাল নিজেকে করছেন উপভোগ তাঁর বিবেক শক্তি, প্রেমের শক্তি এবং ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে। এই যে পদ্ধতি, যার মাধ্যমে পিতা (সৎ) চিরকাল নিজেকে করছেন পৃথক নিজের কাছে ফিরে এসে আপন হবার জন্য, খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রকারেরা তাকেই বলেন Eternal Generation of Christ. একেই আবার পিতা এবং পুত্রের মধ্যে শাশ্বত কথোপকথোন বা 'Eternal colloquy between the father and the son' বলেছেন কেউ।

খ্রীষ্টানদের এই যে 'Eternal Generation', আমরা একেই বলি নিত্যলীলা। ভারতের ধর্মীয় গল্পকথার যদি প্রকৃত সত্য করতে হয় অনুধাবন—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, এমনকি বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও, তাহলে এই নিত্যলীলাকে বুঝতে হবে প্রথম। সমস্ত প্রতীকের অন্তরালে এই নিত্যলীলাই রয়েছে ক্রিয়াশীল।

ইতিহাসের বিচারে যা অসত্য, অধ্যাত্ম বিশ্লেষণে তাই হয়ে ওঠে সত্য। সুতরাং আমার একাম্রপীঠ সন্ধানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

পাঠ করে যাঁরা যাচ্ছিলেন হতাশ হ'তে, তাঁদের বলছি—প্রয়োজন নেই হতাশ হবার, নিজের বিশ্বাসকে ত্যাগ করবারও নেই দরকার। শুধু মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করবেন না, এই জন্যেই বক্তব্যের অবতারণা এতখানি। যদি পুরাণ কাহিনীকে কাহিনী হিসাবে ভাবেন সত্য তাহলে বিরাট ভুল করবেন নিজেই এবং অজ্ঞানতার পাপে ডুববেন ধীরে ধীরে। আপনার অধ্যাত্ম উদ্দেশ্য হবে না সফল যদি না কাহিনীর স্থূল অযথার্থতা বুঝতে পেরে অনুধাবন করেন তার অধ্যাত্মতা। সুতরাং শিব-সতীর গল্প-কাহিনীকে পাঠ করতে গিয়ে পুরুষ ও প্রকৃতি-তত্ত্ব মনে রাখতে হবে আপনাকে। এ-কাহিনীর থাকতো না কোন মূল্যই যদি এ কাহিনী হ'ত শিবহীন শুধুমাত্র মাতৃশক্তির গুণকীর্তন। এ 'একান্নপীঠে'র থাকতো না কোন অর্থ, যদি সতীর দেহখণ্ডপাতিত ভূমিতে শক্তিরূপে সতী করতেন বিরাজ। কিন্তু হয়নি তা। 'একান্নপীঠে' শক্তির প্রতিমূর্তির পাশে উপস্থিত রয়েছেন ভৈরব রূপে শিব স্বয়ং। প্রকৃতি হননি পুরুষচ্যুতা। সুতরাং 'একান্নপীঠে'র কোন পীঠই অবাস্তব অর্থহীন নয় ধর্মবিশ্বাসের কাছে, যদি পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক যথার্থ পারেন অনুধাবন করতে। সুতরাং আসুন, আর একটু এই দ্বৈত লীলা বুঝবার পর আমরা আরম্ভ করি ঐতিহাসিক 'একান্নপীঠে'র সন্ধান।

সত্যের স্বরূপ খ্রীষ্টানদের যেমন পিতৃরূপে. হিন্দুদের (আর্য অনার্য সমন্বয়ে হয়েছে হিন্দু) তেমনই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতৃরূপে বা শক্তিরূপে। ওদের যেমন পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক, আমাদের তেমনই ৺মায়ের সঙ্গে সন্তানের, বা প্রেমিকের সঙ্গে প্রণয়ীর। অবশ্য আমাদের মধ্যে যে নির্বিকল্প ব্রহ্মের উপাসনা নেই তা নয়। শিবের এমন উপাসকও আছেন, যাঁরা সরাসরি চান ব্রহ্মস্বরূপের সন্ধান পেতে। যাঁরা ব্রহ্মস্বরূপের গুণকে শক্তিরূপে, বিশ্বের মূলরূপে করেন কল্পনা, মাতৃ উপাসক হ'লেন তাঁরাই। ব্রহ্মের গুণাত্মক প্রকাশ শক্তিরূপা এই ৺মায়ের স্বরূপ বুঝে—তাঁরাই করেন আত্মজ্ঞান লাভ।

এই 'শক্তি'কেই ভারতবর্ষে বিভিন্ন মানুষ দেখেন বিভিন্ন দৃষ্টিতে—

যেমন, কেউ দেখেন তাঁকে মায়া রূপে, কেউ বা কালী-দুর্গা কেউ বা রাধা ও শক্তি হিসেবে। 'মায়া' বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি ভ্রান্তি, ইংরাজীতে যাকে বলে illusion. কিন্তু মায়াবাদের জনক শঙ্করাচর্য, এই ভ্রান্তিকে চাননি বোঝাতে illusion হিসেবে। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—"সৃষ্টির আগে ব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয় ছিল কি? শঙ্কর বলেছিলেন,—'অবর্ণনীয় মায়া। নামস্বরূপ যে মায়া নয় ব্রহ্মাণ থেকে পৃথক আবার ব্রহ্মাণের সঙ্গে একও।' শঙ্করের মায়া হল, ব্রহ্মাণ নিজেকে যে তিনটি ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ করে করেন উপভোগ, সেই আত্মস্বরূপ উপভোগের একটি পথ মাত্র। আগেই বলেছি, ব্রহ্মাণ নিজের স্বাদ উপভোগ করেন নিজেই, কখনও মনন, কখনও প্রেম, কখনও আবার ইচ্ছাশক্তির মধ্য দিয়ে। ব্রহ্মাণ যখন মনন দ্বারা নিজেকে জানেন জ্ঞাতব্য করে, সেই জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁর কাছে হয় প্রতিভাত মায়া বলে। আবেগ বা প্রেম দ্বারা যখন নিজের দ্বৈতকে করেন অভনুব তখন এই প্রকৃতি হন আবির্ভূতা রাধা হিসাবে। রাধাকে বলা হয় সেই জন্যই প্রেমময়ী অর্থাৎ প্রেমরূপে জ্ঞাতব্য ব্রহ্মাণের। ব্রহ্মাণ যখন ইচ্ছা শক্তি দ্বারা নিজের বিষয়রূপ করেন অনুভব, তখন তিনি শক্তি। সেই জন্য মায়া হলেন ব্রহ্মাণের মনন, রাধা হলেন আবেগ, এবং শক্তি হলেন ইচ্ছাপ্রসূত প্রকৃতি। মনন দ্বারা সত্যকে আমরা করি অনুধাবন আবেগ বা প্রেম দ্বারা উপভোগ, এবং ইচ্ছা দ্বারা পূর্ণতা ও বিকাশ সাধন। সেই জন্য যাঁরা শক্তি আরাধক, তাঁর ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা করতে চান প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ। মহাযোগী শিব, ইচ্ছা দ্বারা প্রকৃতিকে করতেন পরিচালনা। কিন্তু যখন সেই প্রকৃতি হলেন তাঁর অবাধ্য, হল একটি প্রকৃতিলীলার অবসান। ব্রহ্মাণের অবিচ্ছেদ্য, অনির্বচনীয় সেই প্রকৃতিকে আরও পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনে শিব সেইজন্য সতী-স্কন্ধমুক্ত হলে আবার বসলেন ধ্যান করতে।

খ্রীষ্ট যেমন খ্রীষ্টীয় চেতনার বাস্তবরূপ রাধা এবং শক্তিও তেমনি শুধু একটা দর্শন নয়, তা ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত। রাধার ব্যক্তিত্বের

মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ করেন আত্মস্বরূপ উপভোগ। শিব নিজের আত্ম-স্বরূপ উপভোগ করেন শক্তির মাধ্যমে। ব্রহ্মণ, কৃষ্ণ (বিষ্ণু) বা শিব, সেই একই সৎ-এর গুণানুভব হেতু ভিন্ন রূপ। কিন্তু মূলতঃ তাঁরা এক। সেই জন্য 'শ্রীমদ্ভাগবতে' দক্ষযজ্ঞনাশ উপাখ্যানে শিবের কৃপায় পুনরায় যখন ছাগমুণ্ড-দক্ষ বিষ্ণুকে দিয়ে করালেন যজ্ঞ সমাপন, তখন বিষ্ণু তাঁকে—শিব আর বিষ্ণু যে এক—সেইকথা দিলেন বুঝিয়ে। সৎ যখন তাঁর গুণকে ইচ্ছাদ্বারা করেন উপভোগ, তখন সেই ইচ্ছার প্রকোপেই প্রকৃতিস্বরূপ ব্রহ্ম-গুণ নানা রূপে হন প্রকাশিতা। ব্রহ্মণের প্রেম-মাধ্যম আত্মানুভবে প্রকৃতি থাকেন একই রূপে, সেই জন্য রাধা হলেন একজনই। কিন্তু ইচ্ছামাধ্যম উপভোগে প্রকৃতি হন নানারূপে আবির্ভূতা। সেই জন্যই শক্তির এত নানা রূপ। কখনও তিনি সতী, কখনও উমা বা দুর্গা, কখনও কালী, কখনও দশমহাবিদ্যা, কখনও সতীর দেহখণ্ডোদ্ভূতা নানা নাম। সেই জন্য 'একান্নপীঠ'-এর উদ্ভব মিথ্যে নয় যদি ব্রহ্মণের ইচ্ছামাধ্যম প্রকৃতি-উপভোগের স্বরূপ বুঝতে পারি আমরা। সেই জন্য সতী সম্পর্কিত গল্পের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকলেও তা সত্য, সত্য তাঁর দেহখণ্ডপাতসৃষ্ট •একান্নপীঠ, পীঠদেবতা এবং ভৈরব। যাঁরা বিশ্বরহস্যের এই তত্ত্ব আছেন অবগত তাঁদের কাছে একান্নপীঠ বিশ্বাসে নেই কোন বাধাই।

শিব এবং শক্তি এক। পুরুষ এবং প্রকৃতি এক। শিব কখনও হতে পারেন না শক্তিহীন, শক্তিও হতে পারেন না কখনও শিবহীন। এই জন্যই, যখনই কোন মাতৃমূর্তির পাশে শিব বিরাজ করেন ভৈরব হয়ে, তখনই তা অধ্যাত্ম-সত্য। একান্নপীঠের গল্পকার যদি শিবহীন মাতৃরূপ করতেন কল্পনা, তা হলেই তা হ'ত অর্থহীন। একান্নপীঠের গল্পকার শিবহীন বিভিন্ন আঞ্চলিক দেবীকে দক্ষযজ্ঞ গল্পের মধ্যে এনে দান করেছেন অধ্যাত্মলোকের যথার্থতা। এই জন্যই মাতৃরূপ কল্পনার সার্থকতা হল একান্নপীঠ।

শিব এবং শক্তি সম্পর্কের এই দুরূহ তত্ত্ব শৈব সাধকরাও ছিলেন অবগত। তাই তাঁরা এই দ্বৈতের এক আশ্চর্য ব্যাখ্যা করে বোঝাবার

চেষ্টা করেছেন সত্যস্বরূপকে। তাঁদের মতে শিব যখন আত্মস্থ, তখন তিনি শিব, কিন্তু তিনি যখন সপ্রকাশ, তখন তিনি শক্তি। বিশ্বপ্রকৃতি শিবের প্রকাশ। তাই প্রকৃতি না থাকলে লীলা বন্ধ। ব্রহ্মের ক্রিয়ারূপ—বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা—শিবকে তাই উদ্বোধিত করেন পাণি গ্রহণ করতে অর্থাৎ নিজেকে করতে প্রকাশ। এবং এই প্রকাশের ইচ্ছাকে জাগরিত করার জন্যেই করেন মদনকে প্রেরণা দান। মদন যখন শিবের ইচ্ছা-শক্তিকে করে তোলে সগুণ তখনই জেগে উঠে তাঁর ঐশ্বর্য অর্থাৎ প্রকৃতি বা শক্তি। এই জন্যই শক্তিকে বর্ণনা করা হয় ঐশ্বর্য বলে। শক্তি হল শিবের হৃদয়, তাঁর সার। এই জন্যই শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন কালী। মূর্তি কল্পনায় এই জন্যই শিবের বুকের উপর দণ্ডায়মানা বলে শুধুমাত্র কালী এবং তারাই হলেন মহাবিদ্যা। আর যে আটটি মূর্তি, তাঁরা হলেন এই দুই মহাবিদ্যা থেকেই উদ্ভূতা।

শিবশক্তি সম্পর্কের এই অপার রহস্য ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন বলেই তান্ত্রিক পদ্ধতিতে শক্তিপূজার ব্যবস্থা। ব্যবস্থা আসনের, ন্যাসের, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুদ্ধিকরণের। পঞ্চ 'ম'-কার তন্ত্রসাধনা দেখে যাঁরা একে ঘৃণা করেন একটা বর্বর মানসিকতার প্রকাশ বলে, তাঁরা বাস্তবিক পক্ষে কিছুই বোঝেন না তন্ত্র সম্পর্কে। এ-এক আশ্চর্য অতীন্দ্রিয় সাধন কৌশল। তন্ত্রপদ্ধতি যাঁরা আয়ত্ত করেছেন, শুধুমাত্র তাঁরা ছাড়া আর কেউ বুঝবেন না এ রহস্য। এ সম্পর্কে কুলার্ণবতন্ত্রের একটি ভাষ্য বলছি, তা হলেই সম্ভবতঃ বুঝতে পারবেন সব। যে কারণবারি চিত্তকে করে উৎফুল্ল, তা হল কুলকুণ্ডলিনীশক্তির সহস্রারস্থ শিবের সঙ্গে মিলন-সম্ভূত অমৃত। যিনি পান করেছেন মিলনজাত এই অমৃত, তিনিই জানেন সুরা পানের অর্থ; নইলে সুরাপায়ী অমৃতপায়ী নয় কখনও, যথার্থই সুরাপায়ী। যে-লোক জ্ঞানখড়্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণাগুণকে পারবেন হত্যা করতে, তিনিই কেবল বলি দেওয়া পশুমাংস ভক্ষণে প্রাপ্ত হতে পারেন শিবত্ব, নইলে মাংস ভক্ষণই সার। তিনিই যথার্থ মৎস্যাসী, যিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মনের মধ্যে স্থাপন করেন মনকে, নইলে মৎস্য ভক্ষণই সার। বস্তুজগতে পাশবিক প্রবৃত্তি

দ্বারা বদ্ধ যে শক্তি, তাঁকে যদি জাগ্রত করে সহস্রারে না যায় নিয়ে যাওয়া তাহলে শক্তিসাধনা অর্থহীন। এটা যিনি পারেন, তিনিই যথার্থ কৌলিক। শক্তি এবং আত্মনের মধ্যে যে মিলন, সেই মিলনজাত আনন্দ দ্বারা তিনি স্নাত। শিবশক্তির এই মিলনসাধনই হল শক্তি-সাধকের লক্ষ্য।

সতীঅঙ্গ থেকে একান্নপীঠ উদ্ভবের আর একটি শাস্ত্রগত ব্যাখ্যাও আছে হিন্দুদের। সে ব্যাখ্যাটাও রীতিমত চিন্তা করবার ব্যাপার। পুরুষের শক্তিই সম্প্রসারিতা হয়ে বিশ্বরূপে প্রকাশিত। তন্ত্রমতে সৃষ্টির প্রথম পর্ব হল পুরুষের এক অব্যক্ত ভাব থেকে তাঁর গুণের প্রকাশ। এই গুণ হল তাঁর শক্তি। পুরুষের যখন গুণের আভিব্যক্তি সেই গুণের অব্যক্ত সংমিশ্রণে প্রথম উপত্তি নাদের। নাদ থেকে হয় বিন্দু। আবার আছে একটু ভিন্ন ধরনের বর্ণনাও। প্রলয়কালে বস্তুজগৎ মিশে যায় শক্তির মধ্যে। শক্তি, বস্তুজগতের যা হল মূলতত্ত্ব, সেই শক্তি ফিরে চলে কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ পুরুষের দিকে। পুরুষের মধ্যে জেগে উঠে বিচিকীর্ষা। সেই থেকে দেখা দেয় বিন্দু। বিন্দু মহাবেগে বিস্ফোরিত হয়ে আবার তৈরি হয় বিন্দু, নাদ এবং বীজ। বিন্দু রূপ নেয় শিবের অর্থাৎ জ্ঞানের। বীজ রূপ নেয় শক্তির। এই বিন্দু ও বীজের সম্পর্কই হল নাদ। যখন বিন্দু বিস্ফোরিত হয় তখন উঠে এক প্রচণ্ড অপরিণত শব্দ। এই শব্দকে বলে শব্দব্রহ্মণ। এই শব্দব্রহ্মণই হল প্রকাশমান চৈতন্য। অপরিণত শব্দ থেকে হয় ব্যক্ত শব্দ ও অর্থ। এই ব্যক্ত শব্দ থেকেই বর্ণ বা অক্ষর। বস্তুরূপে প্রকাশিত হবার পূর্বে সেই মূল কেন্দ্র থেকে স্তরে স্তরে ৫১টি অক্ষরে সৃষ্টির ইচ্ছা নেমে আসে স্থূলের দিকে। এই একান্নটি অক্ষরের উৎপত্তি শক্তি থেকে। বস্তুত: এই একান্নটি অক্ষরই হল সতীদেহের অর্থাৎ শক্তিদেহের একান্নটি অংশ। দেহের অর্থাৎ Space-এর বিভিন্ন অংশে অর্থাৎ স্তরে ছড়িয়ে আছে এই শব্দের প্রতীক একান্নটি অক্ষর। এই একান্নটি অক্ষরকেই ভারত-মৃত্তিকার একান্নটি বিভিন্ন অংশে স্থাপন করে হয়েছে একান্নটি শাক্তপীঠ গড়ে তোলার চেষ্টা, হয়েছে দক্ষযজ্ঞরূপ গল্প তৈরি। দেশের এই একান্নটি

ক্ষেত্রে একান্নটি অক্ষরের স্তরভেদী বিভিন্ন চেতনার হয় সাধনা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনার এই ভেদ হল ক্ষেত্র মাহাত্ম্য। দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে পাদনখপর্যন্ত স্তরে স্তরে খসে পড়া হল কেন্দ্র থেকে বস্তুজগতের পথে ধাবমান শক্তির বিভিন্ন স্তর। অর্থাৎ আদ্যাক্ষর 'অ' রয়েছে ব্রহ্মরন্ধ্রে, 'আ' রয়েছে নেত্রে, 'ই' রয়েছে নাসিকায়, 'ঈ' রয়েছে জিহ্বায় ইত্যাদি। এইভাবে ওষ্ঠ, দন্ত, কণ্ঠ, বক্ষ, স্তন ইত্যাদি করে পাদনখ পর্যন্ত দেহের ক্রম অধঃ অংশে। উর্ধ থেকে স্তরে স্তরে সাজানো নিম্ন পর্যন্ত পড়েছে যে অংশ যেখানে, শক্তির বিভিন্ন স্তরের সাধনার ধারা রয়েছে সেখানে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কালীঘাটে পড়েছে পাদাঙ্গুলী অর্থাৎ চৈতন্যরূপিনী শক্তি স্থূলের অত্যন্ত নিকটে এই সাধন-ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কালীঘাট উর্ধ জগতের পথে সাধনার প্রথম ধাপ। এবং এই জন্যই কালীঘাট জাতীয় পীঠগুলি সদাসর্বদা উন্মুক্ত সাধারণ মানুষের কাছে। শক্তির প্রতীক কালীর গলার নরমুণ্ডমালারও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। অর্থাৎ শক্তির স্থূল জগতের পথে আত্মপ্রকাশের সময় একান্নটি অক্ষরবর্ণ থেকে উদ্ভুত যে শব্দতত্ত্ব, তার প্রতীক এই একান্নটি মুণ্ড। এর মধ্যে ৫০টি রয়েছে গলায়, একটি হাতে।

সুতরাং শক্তি-তত্ত্বের এই মূল রহস্য যাঁরা জানেন—মহাশাক্তপীঠ একান্নপীঠ তাঁদেরই জন্য সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। যে-কোন পীঠে গিয়েই তাঁরা শক্তির এক আনন্দোজ্বল মূর্তিকে পাবেন দেখতে, যে শক্তি শিব-শক্তির মিলনে অমৃতরসধারাসিক্ত। সেই জন্যই ঐতিহাসিকের কাছে যা মিথ্যা, আধ্যাত্মিকের কাছে তা নয়। তবে অজ্ঞানের কাছে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস, দুইয়েরই নেই কোন মূল্য। দুইই তখন সমান।

তথাপি যে-কোন কিছুর মূল্যই প্রত্যেকটি মানুষের মানস-প্রকৃতির প্রকারভেদে। সেই মানসপ্রকৃতির নির্দেশে, আমার একান্নপীঠ অনুসন্ধানের প্রয়াসকে যিনি যে-ভাবে খুশি পারেন গ্রহণ করতে। আপনাদের সেই মানসিকতার কাছেই একান্নমহাপীঠের যাথার্থকে ছেড়ে

দিয়ে, এবার আমি ব্যক্ত করছি একান্নপীঠের কথা : কোথায় পড়েছিল সতীর দেহখণ্ড, কোন্ স্থানে, পীঠনির্ণয় যে তালিকা রেখেছে সেই হিসেবে। যাঁরা জানেন না, তাঁরা অনুসরণ করতে পারেন আমাকে, আসতে পারেন আমার সঙ্গে। তবে পীঠনির্ণয়ের প্রশ্নে আমার নিজস্ব নেই কোন বক্তব্য।

দক্ষযজ্ঞনাশের গল্প বলেছি। বলেছি দক্ষের শিবকৃপায় পুনর্জীবন লাভের কথাও। এবং বলেছি সতীকে স্কন্ধে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত শিবের ভারত পরিভ্রমণের কথা। বলেছি, কিভাবে শিবকে সতীদেহভারমুক্ত করবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি সতীদেহে প্রবেশ করে তাঁকে করেছিলেন খণ্ডবিখণ্ড, কিংবা বিষ্ণু আপন চক্রে সতী-অঙ্গ কেটে করেছিলেন টুক্‌রো টুক্‌রো। মুকুন্দরাম বলেছেন, বিষ্ণুচক্র কীটরূপ ধরে সতীর দেহে প্রবেশ ক'রে তাঁকে করেছিল টুক্‌রো টুক্‌রো। পরিভ্রমণরত শিবের স্কন্ধ থেকে সেই টুক্‌রো অংশগুলি পড়েছিল দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে। যে-যে-স্থানে দেহের যে-যে-অংশ পড়েছিল এবং তা থেকে গড়ে উঠেছিল যে-যে পীঠ, সেই সেই পীঠস্থানের বর্ণনা দেওয়া আছে পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠনিরূপণে। শুধু পীঠবর্ণনা নয়, সেই সঙ্গে আছে পীঠদেবী এবং ভৈরবের নামও। প্রত্যেকটি পীঠস্থানে, শক্তি আরাধিতা ভিন্ন নামে, এবং ভৈরব হিসাবে শিবও বিরাজমান নানা পরিচয়ে। পীঠনির্ণয় অথবা মহাপীঠনিরূপণ অনুসারে প্রথম তুলে দিচ্ছি বিভিন্ন পীঠ—সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং দেবী ও ভৈরবের নামের একটি পূর্ণ তালিকা, তারপর আসছি সেগুলির বর্ণনায়।

সংখ্যা	পীঠস্থান	দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	দেবী	ভৈরব
	হিঙ্গুলা বা হিঙ্গুলাট	ব্রহ্মরন্ধ্র	কোট্টরী, কোট্টভী, বা কোট্টরীশা	ভীমলোচন
	করবীর বা শর্করার	ত্রিনেত্র	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ বা ক্রোধেশ

সংখ্যা	পীঠস্থান	দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	দেবী	ভৈরব
৩।	সুগন্ধা	নাসিকা	সুনন্দা বা সুগন্ধা	ত্র্যম্বক
৪।	কাশ্মীর	কণ্ঠ	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্যেশ্বর বা ত্রিনেত্রেশ্বর
৫।	জ্বালামুখী	জিহ্বা	সিদ্ধিদা	উন্মত্ত
৬।	জ্বালন্ধর	স্তন	ত্রিপুরমালিনী বা ত্রিপুরনাশিনী	ভীষণ বা ঈশান
৭।	বৈদ্যনাথ	হৃদয়	জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
৮।	নেপাল	জানু	মহামায়া	কপালী
৯।	মানস বা মালব	দক্ষিণ-হস্ত	দাক্ষায়নী	হর, হরি বা অমর
১০।	বিরজাক্ষেত্র (উৎকল)	নাভি	বিমলা বা বিজয়া	জগন্নাথ বা জয়
১১।	গণ্ডকী বা গণ্ডুক	গণ্ড	গণ্ডকী বা চণ্ডী	চক্রপাণি বা জগন্নাথ
১২।	বহুলা বা বাহুলা	বাম বাহু	বহুলা বা বাহুলা	ভীরুক বা তীব্রক
১৩।	উজ্জয়িনী, উজ্জানী, উজ্জনী বা উর্জয়িনী	কূর্পর	মঙ্গলা বা মঙ্গলচণ্ডী	কপিলেশ্বর বা কপিলাম্বর
১৪।	চট্টল (চন্দ্রশেখর)	দক্ষিণ বাহু	ভবানী	চন্দ্রশেখর
১৫।	ত্রিপুরা	দক্ষিণপাদ	ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরী	নল, ত্রিপুরেশ বা ত্রিপুরাক্ষ

সংখ্যা	পীঠস্থান	দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	দেবী	ভৈরব
১৬।	ত্রিস্রোতা (সংস্কৃত ত্রিস্রোতস) বা তিরোতা	বামপাদ	ভ্রামরী বা অমরী	ঈশ্বর বা অম্বর
১৭।	কামগিরি (কামরূপে মূলতঃ ছিল দশটি পীঠ)	মহামুদ্রা বা যোনি	কামাখ্যা	উমানন্দ, শিবানন্দ, রামানন্দ বা রাবানন্দ
১৮।	যুগাদ্যা (ক্ষীরগ্রাম)	দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ	যুগাদ্যা বা যোগাদ্যা	ক্ষীরখণ্ড বা ক্ষীরকণ্ঠ
১৯।	কালীপীঠ বা কালপীঠ (কালীঘাট)	দক্ষিণ পাদাঙ্গুলি	কালী	নকুলেশ নকুলীশ বা নলীশ
২০।	প্রয়াগ	হস্তাঙ্গুলি	ললিতা	ভব
২১।	জয়ন্তী বা জয়ন্তা	বামজঙ্ঘা	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
২২।	কীরিট বা কিরীটকোণা	কিরীট	ভুবনেশী বা বিমলা	সিদ্ধিরূপ বা সংবর্ত
২৩।	মণিকর্ণিকা (বারাণসী)	কুণ্ডল	বিশালাক্ষি	কাল
২৪।	কন্যাশ্রম	পৃষ্ঠ বা দৃষ্টি	সর্বাণী	নিমিষ
২৫।	কুরুক্ষেত্র	দক্ষিণ গুল্ফ	সাবিত্রী	স্থানু বা স্নায়ু
২৬।	মণিবেদ, মানবেদক, মণিবন্ধ বা মণিবেদক		গায়ত্রী	সর্বানন্দ
২৭।	শ্রীশৈল বা শ্রীহট্ট	গ্রীবা	মহালক্ষ্মী বা মহামায়া	সম্বরানন্দ সমরানন্দ বা সর্বানন্দ

সংখ্যা	পীঠস্থান	দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	দেবী	ভৈরবী
২৮।	কাঞ্চী	কঙ্কাল	দেবগর্ভা	রুরু
২৯।	কালমাধব	নিতম্ব	কালী	অসিতাঙ্গ
৩০।	নর্মদা, শোণ বা শৈল	নিতম্ব	শোণা বা নর্মদা	ভদ্রসেন
৩১।	রামগিরি, রাজগিরি বা রামাকিনী	স্তন, নাসা বা নলা	শিবানী	চণ্ড
৩২।	বৃন্দাবন (উমাবন) বা কেশজাল	কেশ	উমা বা ক্যাত্যায়নী	ভূতেশ বা কৃষ্ণনাথ
৩৩।	শুচি বা অনল	উর্দ্ধদন্ত	নারায়ণী	সংহার বা সংক্রুর
৩৪।	পঞ্চসাগর	অধোদন্ত	বারাহী	মহারুদ্র
৩৫।	করতোয়াতট	বামকর্ণ, তল্প বা গুল্‌ফ	বারাহী বা অপর্ণা	বামন বা বামেশ
৩৬।	শ্রীপর্বত	দক্ষিণ কর্ণ, তল্প বা দক্ষিণ গুল্‌ফ	সুন্দরী	সুন্দরানন্দ বা সুনন্দানন্দ
৩৭।	বিভাস	বামগুল্‌ফ	ভীমরূপা বা কপালিনী	কপালী বা সর্বানন্দ
৩৮।	প্রভাস	উদর বা অধর	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
৩৯।	ভৈরব পর্বত বা ভীরুপর্বত	উর্দ্ধোষ্ঠ, ওষ্ঠ বা তুণ্ড	অবন্তী	লম্বকর্ণ বা নম্রকর্ণ
৪০।	জনস্থান বা জলস্থল	চিবুক	ভ্রামরী	বিকৃত বা বিকৃতাক্ষ

সংখ্যা	পীঠস্থান	দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	দেবী	ভৈরব
৪১।	গোদাবরীতীর	বামগণ্ড	বিশ্বেশী বা রাকিনী	বিশ্বেশ, দণ্ডপাণি বা বৎসনাভ
৪২।	রত্নাবলী বা রত্নাবতী	দক্ষিণ স্কন্ধ	কুমারী বা শিবা	শিব বা কুমার
৪৩।	মিথিলা	বাম স্কন্ধ	উমা বা মহাদেবী	মহোদর

প্রথম পীঠনির্ণয়ে এর বেশী ছিলনা পীঠের নাম। কারণ, কামরূপে ছিল দশটি পীঠ। পরে কামরূপকে একটি পীঠ হিসাবে ধরে নিচের পীঠগুলির দেওয়া হয় নাম। কিন্তু যারা কামরূপের কাছে আরও নয়টি পীঠকে সতী-পীঠ বলে নিয়েছেন ধরে তাঁরা পীঠের সংখ্যা ৫১-এর পরিবর্তে করেছেন ৫২। কিন্তু যাঁরা পীঠসংখ্যা ধরেছেন একান্নতে তাঁরা নতুন পীঠের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

সংখ্যা	পীঠস্থান	দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	দেবী	ভৈরবী
৪৪।	নলহাটী	নলা	কালী	যোগীশ বা যোগেশ
৪৫।	কালীঘাট (কালীপীঠ)	মুণ্ড	জয়দুর্গা	ক্রোধীশ বা ক্রোধেশ
৪৬।	বক্রেশ্বর	মন	মহিষমর্দ্দিনী	বক্রনাথ
৪৭।	যশোর	পাণি	যশোরেশ্বরী	চণ্ড বা চণ্ডেশ
৪৮।	অট্টহাস	ওষ্ঠ	ফুল্লরা	বিশ্বেশ
৪৯।	নন্দিপুর	হার	নন্দিনী	নন্দিকেশ্বর
৫০।	লঙ্কা	নূপুর	ইন্দ্রাক্ষী	রাক্ষসেশ্বর বা নন্দিকেশ্বর
৫১।	বিরাট	পাদাঙ্গুলী	অম্বিকা	অমৃত বা অমৃতাক্ষ

পরবর্তী পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা অনুযায়ী (কারণ, প্রথম তালিকাতে ছিল না পরবর্তী আটটি পীঠের নাম) একান্নটি পীঠের নাম আপনাদের কাছে ধরলাম তুলে। কিন্তু এতেই যে লেখক হিসেবে কিংবা একান্ন-পীঠের সন্ধানী হিসেবে আমার অভিযাত্রা শেষ, নয় তা। কারণ, পাঠক হিসাবে আপনারা যেমন, লেখক হিসেবে আমিও তেমনই বুঝছি যে, কৌতূহল এতে বাড়ছে বই কমে যাচ্ছে না এতটুকু। দেবী নিয়ে প্রশ্ন নয়, ভৈরব নিয়ে নয়, নয় দেবীর অঙ্গ নিয়েও, একান্নপীঠের সত্যতা নির্ধারণে সবচেয়ে যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বড় অন্তরায়, তা হল—তার স্থান নির্ণয়। কোথায় সেই স্থানগুলি, যেখানে পড়েছিল সতীর দেহের নানা অংশ? কোন্ মৃত্তিকা মহাতীর্থ হয়ে আছে সেই পুণ্যদেহের স্পর্শ পেয়ে? পীঠনির্ণয়ের তালিকাতে নাম থাকলেও তার ভূগোল নেই। কোথায় আছে কোন্ তীর্থ, খুঁজে বেড়ানো দুষ্কর। কিন্তু সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হবে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় সেই পুণ্যস্থান। সুতরাং এবার আমার শেষপর্যায়ের অভিযাত্রা ভূগোল নিয়ে, স্থান নিয়ে। এবার পথ বন্ধুর এবং যাত্রা হল ক্লান্তিকর। কিন্তু অভিযাত্রীর অভিযাত্রা বন্ধ হয় না ক্লান্তির ভয়ে। সুতরাং আসুন, আবার নতুন কার যাত্রা করি মাভৈ বলে। একান্নপীঠের ঘাটে ঘাটে নৌকো বেঁধে সওদা যদি না করা যায়, সত্য তবে ঘোমটা টেনে দূরে থাকবে। এতক্ষণের অভিযাত্রা ব্যর্থ হবে। কোন অভিযাত্রীই স্বীকার করবে না সে ব্যর্থতা। সুতরাং আসুন, নতুন করে নৌকো ভাসাই জয় ৺মা বলে।

পীঠনির্ণয়ের বর্ণনাতে সতীর দেহের সর্বোত্তম অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল যেখানটাতে, সেখান থেকেই শুরু করি। অর্থাৎ হিঙ্গুলা বা হিঙ্গুলাট থেকে। হিঙ্গুলা বা হিঙ্গুলাট, আপনার কোন কি ধারণা আছে এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে? যদি না থাকে, আমার সঙ্গে আসুন। আমার সঙ্গে আপনিও নিন স্পষ্ট করে।

পীঠনির্ণয়ে দেবীর অঙ্গপাতন সম্পর্কে প্রথম যে উল্লেখযোগ্য বাক্য প্রয়োগ তা হল এই ধরনের :

"ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা (কোট্টরীশা) মহাদেবী ত্রিগুণায়া দিগম্বরী।"

অর্থাৎ হিঙ্গুলাতে পড়েছিল ব্রহ্মরন্ধ্র। সেখানে ভৈরব হলেন ভীম-লোচন। ত্রিগুণা দ্বিগম্বরী কোট্টারীশা হলেন মহাদেবী। কিন্তু কোথায় সেই হিঙ্গুলা যে-স্থান ধন্য হয়েছে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র ধারণ করে? কোথায় সেই কোট্টারীশা মহাশক্তি বিরাজমানা, পাশে যাঁর শিব রয়েছেন ভৈরব হয়ে ভীমলোচন নামে? স্থান না হলেও স্থানের নামটি খুবই পরিচিত আমাদের কাছে। যদি একটুখানি ঘুরিয়ে করা যায় উচ্চারণ, অর্থাৎ হিঙ্গুলা বা হিঙ্গুলাট না বলে যদি বলা যায় হিংলাজ, সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন মনে পড়ে যাবে অবধুতের লেখা সেই বইয়ের কথা, 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। এবং যাঁরা চলচ্চিত্রে এই হিংলাজ অভিযাত্রা দেখেছেন পুণ্যার্থীদের, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝবেন যে, এক দুর্গম মরুপ্রান্তর পাড়ি দিয়ে তবে যেতে হয় এই মরুতীর্থ মহাশাক্তপীঠ হিংলাজে। কিন্তু যদি বলি কোথায় এই হিংলাজ? এর ভৌগোলিক অবস্থান কোথায়? অমনিই দেখবেন অনেকেই আমরা ইতস্ততঃ করতে থাকব সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং আসুন, আগে জেনে নিই ভৌগোলিক অবস্থান স্থানটির, অভিযাত্রা হবে পরে। ইংরেজ আমলে অবিভক্ত ভারতের মানচিত্রটা একবার মনে করুন। উত্তর পশ্চিমে, বালুচিস্থানে কাৎ করে বসানো যে ইংরেজী এম-এর (Σ) মত (ভারতের) মুখ, সেই এম-এর অধোরোষ্ঠই হল মাক্‌রাণ,—এবং যেখানে পর্বতশ্রেণী মাকরাণ আর লুস্ কে করছে পৃথক সেই পর্বতশ্রেণীর প্রান্তভাগেই অবস্থিত রয়েছে হিংলাজ, মাক্‌রাণের মধ্যে। সিন্ধুনদের মোহনা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৮০ মাইল, আরব সমুদ্র থেকে বার। এখন যদি সেখানে যেতে চান যেতে হবে ভিন্ন রাষ্ট্রের উপর দিয়ে। করাচী থেকে উত্তর-পূর্বদিকে মরুভূমির উপর দিয়ে ১২৮ কিলোমিটার পথ। একসময় মরুজাহাজ উট ছাড়া অন্য কোন ছিল না যানবাহন। কিন্তু এখন হয়েছে পথ। মোটর যায়, জীপও চলে। পাহাড়শ্রেণীর মাথায় এখানে ভীষণ

আছে এক কালীমন্দির। স্থানীয় লোকেরা সে মন্দিরের দেবীকে ডাকে মহামায়া বা 'নানী' বলে।

ঐ দেবীর জন্যই বিখ্যাত এই জায়গাটা। যদি পড়েন নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ, তাহলে ভাববেন এই দেবীর জন্যই হিঙ্গুলা বিখ্যাত 'পীঠ' বলে। কিন্তু এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ভ্রমণবিলাসীদের কথা [যাঁদের মধ্যে আছেন পদব্রজে ঘোরা সতেরবার ভারতভ্রমণকারীও। আধুনিক সুলতান মামুদ আর কি !] যে, এখানে যে আছে পাহাড়পর্বত, তার গুহাতেই থাকেন সতীর ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে জ্যোতির্ময়ী দেবী কোট্টরীশা—জ্যোতিরূপে যিনি বিরাজিতা। এই জ্যোতিরূপে অবস্থানের একটা শাস্ত্রীয় তাৎপর্যও বের করেছেন কেউ কেউ। ঋগ্বেদে স্পন্দন বা শব্দের অন্তর্নিহিতা দেবী হলেন প্রকৃতি বা শক্তি। তাঁর নাম বাক, গৌ, গাভী ইত্যাদিও। বাক্-গাভীর প্রাথমিক স্ফুরণধ্বনি হল হিঙ্। সামগানের প্রথমেই হিঙ্শব্দ উচ্চারণের আছে বিধান। প্রজ্বলিত অগ্নিও স্ফুরিত হবার মুখে শব্দ করে হিঙ্। হিঙ্ শব্দ উচ্চারিত হবার পর অগ্নি সর্বদা থাকে ক্রিয়াযুক্ত। সেইজন্য অগ্নিকে অনেকে মনে করেন প্রকৃতিস্বরূপ। অর্থাৎ নারী বা শক্তি। এই অগ্নি সর্বদা লাস্যবিলাসে যুক্ত থাকেন ঋত্ ও ছন্দগতিপূর্ণ হয়ে। লাস্য বিলাস রাজ্যের অধিশ্বরী হিসেবে তিনি হিঙ্লাজ। অন্ধকার পর্বত গহ্বরে বিদ্যুতের আভার ন্যায় স্ফুরজ্যোতি হয়ে তিনি দৃষ্ট। যেখানে এই হিঙলাজ অধিষ্ঠিত সেস্থান হল লাসবেলাস রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। হয়তো বা লাসবেলাস রাজ্যটি লাস্যবিলাসেরই অপভ্রংশ। জীবের ব্রহ্মরন্ধ্রপথে প্রাণশক্তির যে তড়িৎ তরঙ্গবৎ লাস্যলীলা, দেবী হিঙলাজ হলেন তারই প্রতীক। ঐতিহাসিকদের মতে ইনিই হলেন কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় অঙ্কিত নণদেবী। একদা মধ্য এশিয়ার বিস্তির্ণ অঞ্চলে তাঁর হত পূজা। কারও মতে ইনিই হলেন সুমেরীয় ইন্নিনী, প্যালেষ্টা-ইনের নিনা বা ঋগ্বেদের ননা। ইনিই হলেন ব্যাবিলনের ইশ্তার এবং অথর্ববেদের রণদেবী ইন্দ্রানী। অথর্ববেদে বাক্‌কে বলা হয়েছে বিশ্বসৃষ্টির অধিশ্বরী পিত্র্যারাষ্ট্রী। রাষ্ট্রী হল রাজ্ঞী, যাকেই বলা হয়

মুসলিম শব্দে শাহী বা শাই। উচ্চারণভেদে অনেকে বলেন কাই। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে দেবতা বালের প্রকৃতির নাম ছিল বালিৎ বা সাই-বেলি। উচ্চারণভেদে কাই-বেলি। ঋগ্বেদের ইন্দ্র ছিলেন সহসঃ সুনু অর্থাৎ সাহস বা বলের পুত্র শচ। তাঁর প্রকৃতির নাম হল শচী। এইভাবে বালের প্রকৃতির নাম বালুচি। এই শচী বা বালুচির স্থান বালুচিস্থান। ইন্দ্রানী বা নানীর দেশ। হিঙলাজে যাঁরা তীর্থে গিয়েছেন তাঁদের কাছে শোনা, পর্বতের নিচের দিকে আছে সুরঙ্গ। এই সুরঙ্গ হল যোনি স্বরূপ। এই সুরঙ্গের মধ্যে যা যায় নিয়ে যাওয়া তাই হয়ে যায় প্রসাদ। এইভাবেই সুরঙ্গ-পথ ঘুরে এসে বহু সন্ন্যাসী জটায় ধারণ করেন প্রসাদী সুপারী বা স্বর্ণমক্ষী নামে এক ধরনের ধাতুদ্রব্য। অর্বাচীনকালে মন্দিরে যে বসেছে কালিকা-বিগ্রহ, তার নেই কোন তেমন মানে। যদি ইচ্ছা হয়, যদি চান করতে পুণ্য সঞ্চয়, তবে পাসপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন তীর্থযাত্রায় পাকিস্তানে। ভিষা পাবেন চাণক্যপুরী নয়া দিল্লী থেকে।

পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা অনুযায়ী সতীর অঙ্গপাতপুষ্ট দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য শাক্তপীঠ হল করবীর বা শর্করারে। পীঠনির্ণয়ে আছে :

করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দ্দিনী
ক্রোধীশো (ক্রোধেশো) ভৈরবস্তত্র”·:

অর্থাৎ করবীরে পড়েছে সতীর ত্রিনেত্র। শক্তির রূপ এখানে মহিষমর্দ্দিনী। অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হিসেবে ভৈরব এখানে ক্রোধীশ নামে। কিন্তু এই করবীর কোথায়, যে-স্থান লাভ করেছে দেবীর ত্রিনেত্র পুণ্য-ভূমি হয়ে? করবীর বা করবীরপুরকে অনেকেই বলেছেন শর্করার। যেমন কোন বাংলা কবিতাতেই আছে :

“শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণবৈভব—
মহিষমর্দ্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব।”

কিন্তু আমাদের কাছে করবীরের পরিবর্তে যদি শর্করার নাম হয় উচ্চারিত তাতেও হয়না কোন হেরফের। কারণ, শর্করার কোথায় তাও জানিনা আমরা। ভারতের প্রাচীন ভূগোল নিয়ে যাঁরা নিত্য

করেন চর্চা তাঁদের ধারণা—শর্করার হল সিন্ধু প্রদেশের বর্তমান সহর সুক্কুর বা শক্কর; সুক্কুর বা শক্কর নামক জেলাতে। কিন্তু এ-বিষয়ে যে নিশ্চিন্ত হবেন, তারও নেই কোন উপায়। কারণ, কে বললে যে, করবীরই হল শর্করার বা সুক্কুর বা শক্কর? করবীরপুর সম্পর্কে শাক্তগ্রন্থেই আছে ভিন্ন রকমের ইঙ্গিত, যেমন, কালিকাপুরাণে আছে, করবীরপুর ছিল ব্রহ্মাবর্তদেশের রাজধানী, যে ব্রহ্মাবর্তদেশ বলতে বুঝায় পূর্ব পাঞ্জাব: কালিকাপুরাণ নিশ্চিত যে, এই করবীরপুর ছিল দৃশদ্বতী নদীর ধারে। কিন্তু অনেকেরই ধারণা, দৃশদ্বতী নদীর ধারে ব্রহ্মাবর্তদেশের রাজধানী সেই করবীরপুর নয় করবীর, করবীর হল বর্তমান মহারাষ্ট্রের কোল্‌হাপুর, যাকে স্থানীয় লোকেরা বলে করবীর। তাহলে 'করবীরে ত্রিনেত্রং মে' বলে পীঠনির্ণয় যে করেছে দেবীদেহপাত সম্পর্কে বর্ণনা তা যথার্থই কোথায়? আমার অজ্ঞতা স্বীকার করছি নিজে আমি। স্বীকার করছি যে, করবীরের অবস্থান সম্পর্কে আমিও নই নিঃসন্দেহ। তবুও একদল আছেন ভ্রমণবিদ যাঁরা জোর করেই চান বলতে যে, করবীরই হল শর্করার, আর শর্করারই হল পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের বর্তমান সহর সুক্কুর বা শক্কর। সেইজন্যই তাঁদের নির্দেশ, যদি যেতে চান এই তীর্থে, পাসপোর্ট নিন, সংগ্রহ করুন ভিষা চাণক্যপুরী (নয়াদিল্লী) থেকে। তারপর যান পাকিস্তানের বন্দর সহর করাচীতে। করাচী থেকে সুক্কুর নামক ষ্টেশনে। সেখান থেকে টাঙ্গায়। শক্কর জেলার কাবেরী মৌজায় মন্দির। দেবী হলেন দশভূজা।

দেবীর অঙ্গপাতে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য পীঠ হল সুগন্ধায়:

……সুগন্ধায়াশ্চ নাসিকা।
দেবস্ত্র্যম্বকনামা চ সুনন্দা তত্র দেবতা॥

অর্থাৎ এই সুগন্ধায় পড়েছিল সতীর নাসিকা। দেবীর নাম সুনন্দা এবং ভৈরব হলেন ত্র্যম্বক। বাংলায় অনুবাদ আছে এই রকম:

'সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা।'

এই সুগন্ধা কোথায় জানেন কি? ভূগোলে তো শুনেছেন অনেক জায়গার নাম, শোনেন নি সুগন্ধার? অন্ততঃ আমি শুনিনি আগে। এবং ভূগোল সম্পর্কে আমার জ্ঞান যে অত্যন্ত রকমে দুর্বল সে-কথা জানিয়ে রাখতেও লজ্জা নেই কোন। সুগন্ধার পরিচয় পাবার জন্য পাঠ্য ভূগোলের পাতায় যদি হূণেদের মত দেন হানাও তবুও বোধ হয় মৃত-চক্ষু হয়ে ভূগোলে তাকিয়ে থাকবে আপনার দিকে, বলবে না কোন কথা। যে কালের ভূগোলে দেশের চাইতে বিদেশের কথা পড়ানো হয় বেশী, (যেমন, ইতিহাসে ঠাকুর্দার নামধাম পরিচয় জানাবার আগেই জানতে হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী বা চীনের চেয়ারম্যানের আপাদমস্তক পরিচয়) সে-কালের ভূগোলে সুগন্ধার নাম আশা করাই অন্যায়। ধন্য শিশুহন্তারক বিদ্যাবৈতরণীর কর্ণধারেরা। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। নিজের লজ্জা অপরের ঘাড়ে চাপিয়েই বা লাভ কি? অভিযাত্রী যখন, পীঠ সন্ধানের দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে নিজেকেই। সুতরাং শুনুন, ভূগোলে পাবেন না, এ্যাটলাস খুলে খেলেও নয়, বরং পুরানো লোক যদি থাকে আশেপাশে, দেখতে পারেন তাদের জিজ্ঞাসা করে। তন্ন তন্ন করে খুঁজুন, তাহলেই পেয়ে যাবেন বাঙ্গাল দেশের বরিশাল বাসীদের কাছে থেকে, তাঁরাই জানেন সন্ধান। ঐতিহাসিকেরা জেনেছেন খবর নিয়ে, সুগন্ধা আছে শিকারপুরে, বরিশাল সহর থেকে ১৩ মাইল উত্তরে, প্রাচীন বাখরগঞ্জের সোন্ধ (Sondha) নদীর ধারে। আছে ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দির পোনাবালিয়া সাম্রাইলে, ঝালকাটি থেকে মাইল তিনেক দক্ষিণে, ঐ সোন্ধ নদীরই ধারে। খালবিল জলে ভরা বাঙ্গালদেশের বরিশাল। পাশপোর্ট সংগ্রহ করুন যদি চান যেতে। ভিষা নিন কলকাতা থেকে। তারপর বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীর কাছেই চলুন ফিরে যাই বিদেশী নামে। দেবীর দেহাংশের উপর কোন্ মূর্তিতে ৺মার প্রকাশ জানিনা।

তবে জেনেছি ডঃ নিহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে, শিকারপুর গ্রামের মন্দিরে আছে একটা শবের উপরে দাঁড়ানো দেবীমূর্তি। তাঁর চার হাতে আছে খেটক, খড়্গ, নীলপদ্ম আর নরমুণ্ডের কঙ্কাল। মাথার উপর আছে কাতিক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব এবং গণপতি। লেখকের ধারণা মূর্তিটি বৌদ্ধ তন্ত্রমতের উগ্রতারা। শাক্ত সুনন্দা এই উগ্রতারাই কিনা তা বলতে পারেন প্রবীণ ব্যক্তিরা। তবে শিকারপুর যে পুরানো, প্রাচীন স্থান, তা বোঝা যায় এই মূর্তি থেকেই। প্রবীন ব্যক্তিদের কাছে পারেন খবর নিতে।

(৪) এবার চলুন চতুর্থপীঠে। চতুর্থপীঠ সম্পর্কে পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা হল এই রকম :

কাশ্মীরে কণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর ভৈরব।
মহামায়া ভগবতী গুণাতীত বরপ্রদা॥

অর্থাৎ কাশ্মীরে পড়েছিল সতীর কণ্ঠ। দেবী সেখানে মহামায়া এবং ত্রিসন্ধ্যেশ্বর ভৈরব। অবশ্য এতেই কিন্তু সব হয়ে যাচ্ছে না শেষ। কাশ্মীর নয় ছোট, কয়েক স্কোয়ারফিট একটা জায়গা। পার্বত্য দেশ এই কাশ্মীরে গিয়েছেন যাঁরাই তাঁরাই জানেন যে, পাঠানকোটের পর কত দীর্ঘ বঙ্কিম পথ ভেঙ্গে, তবে যেতে হয় শ্রীনগরে। প্রায়ই যাওয়া যায় না একদিনে। দীর্ঘপথক্লান্তি সহ্য করলে তবে মিলে শ্রীনগর। পাহাড়ঘেরা স্বপ্নের দেশ। ঝিলমের বুকে পান্নাবরণ। ভূস্বর্গ দীঘি ডাল, নাগিন, উলার, পহেলগাঁও আর গুলমার্গ। কত উদ্যান, কত ভগ্ন ইমারত! মাত্তান যান—তারপর চন্দনবাড়ি হয়ে অমরনাথের পথে; কাশ্মীর এখন বাঙ্গালীর কাছে ডালহৌসি স্কোয়ারের মত ডালভাত। কাশ্মীর সম্পর্কে কথা বলতে যাওয়া মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্পের মত। যেটা আমার বলার, সেটা এই যে, কাশ্মীর নয় একটা ছোটো-খাটো জায়গা যে, কাশ্মীরে দেবীর কণ্ঠ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধরে নেওয়া যাবে, সে অঙ্গটি পড়েছিল এইখানে। সমগ্র দেশের নাম করে দেহের কোন অংশ ফেলে, পীঠ-গঠনের কথা বলার যুক্তি নেই। দেবীর দেহের সে অংশটি কোথায় পড়েছিল যে, বলতে পারি, তা এইখানে?

ইদানিংকালে যাঁরা কাশ্মীর ঘুরেছেন, একাধারে পর্যটক এবং অন্যধারে তীর্থপুণ্যপ্রয়াসীর মন নিয়ে, তাঁরা বলেন—অমরনাথই হল সেই পুণ্য ক্ষেত্র, যেথানে পড়েছিল সতীর কণ্ঠ। একান্নপীঠের একটি পীঠ এই অমরনাথেই। আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা ঘুরেও এসেছেন সেই মহাতীর্থে।

শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও, ৯৪ কিঃ মিঃ যেতে হবে বাসে চেপে। তারপর পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি, ১৬ কিঃ মিঃ জীপে করে। অমরনাথ পর্যন্ত বাকীপথটুকু পায় হেঁটে বা টাট্টু, ঘোড়ায়। সমুদ্রতল থেকে ১২৭২৯ ফুট উঁচুতে হল অমরনাথ গুহা। গুহার মধ্যে আছে তুষার লিঙ্গের পাশে ছোট ডিমের মত যে বরফ পিণ্ড, তারই নাম হল পার্বতী বা শিবের শক্তি মহামায়া। শ্রাবণী পূর্ণিমায় হাজার হাজার পুণ্যার্থী যান অমরনাথের গুহায় পুণ্যের আশায়। শিবের পাশে দেখেন প্রকৃতি-শক্তিকে। অনন্ত পুণ্য অর্জন করেন গুহার বাইরে অমরাবতী-ধারায় স্নান করে। অবশ্য অনেকেই আবার অমরনাথ নয়—ক্ষীরভবানীকেই মনে করেন সতীকণ্ঠজাত পীঠ বলে —শ্রীনগর থেকে দূরত্ব যার দুই কিলোমিটার পথ মাত্র। কিন্তু··· কিন্তু, তবু কোথায় যেন একটা 'কিন্তু' থেকেই যায় কাশ্মীরের ইতিহাস পড়বার পরে। অন্তর থেকে কিছুতেই যেন বাধাবন্ধহান উঠে না সাড়া স্বীকার করে নিতে। তীর্থক্ষেত্র যখন হয় ব্যবসার স্থান তখন নকল তীর্থক্ষেত্রও গড়ে উঠে অনেক। নইলে······

শাক্তপীঠ হিসাবে অমরনাথের ধারণা ষোড়শ শতাব্দীতেও ছিল না হিন্দের মানুষের। মোগল সম্রাট আকবরের দরবারি ঐতিহাসিক এ-ব্যাপারে রেখে গেছেন এমন এক মধ্যযুগীয় সাক্ষ্য যে, অমরনাথের পীঠত্ব সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহ জাগে মনে। আবুল ফজল সতীর দেহখণ্ডপাতে পীঠস্থানের উৎপত্তির জানতেন গল্প। কিন্তু জানতেন না যে, সে-দেহ বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে একান্নটি মহাশাক্তপীঠ তৈরী করবে উত্তর কালে। তিনি জানতেন, এ-ধরনের মাত্র চারটি পীঠের কথা। তাই বলেছেন "মহামায়াকে লোকে বলে শিবের পত্নী।

অবশ্য শাক্তপণ্ডিতেরা বর্ণনা করেন মহাদেবের শক্তি বলে। তাঁর নিজের এবং স্বামীর প্রতি অবমাননা লক্ষ্য করে মহামায়া সহস্তে আপন দেহ কর্তন করেন খণ্ডে খণ্ডে। তাঁর বিখণ্ডিত সেই দেহ-খণ্ড গুলি ছড়িয়ে পড়ে দেশের চার অংশে। মস্তিষ্ক আর অন্যান্য কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পড়ে কামরাজের কাছে উত্তর কাশ্মীরের পর্বতশীর্ষে। অঙ্গের এই অংশগুলিকেই শারদা বলে লোকপ্রবাদে।" জানা যায় শারদার ইতিহাস পড়লে, তীর্থ-মাহাত্ম্যের পুরানো ঐতিহ্য শারদার চাইতে আর বেশী নেই কা'রো কাশ্মীরে।

শারদার আধুনিক নাম শার্দি। শারদা পরিচিতা শক্তি হিসাবেও। দুর্গম পথ দিয়ে যেতে হয় শারদা তীর্থে। সেপোর হয়ে গেলে শ্রীনগর থেকে প্রায় ৯০ মাইল পথ। পার্বত্য অঞ্চলে থাকে সঙ্কর জাতের মানুষ। গণেশগিরি বা গণেশঘাটি হল শারদাপীঠের আসল নাম। শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ কাশ্মীরের চিন্তাধারা ও অধ্যাত্ম নীতির পরিবর্তন ঘটাতে এই শারদাতীর্থেই এসেছিলেন সর্বপ্রথম। গল্প আছে, শারদামন্দিরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলে শারদাদেবী নাকি বারণ করেছিলেন তাঁকে, কারণ, শঙ্করাচার্য যৌনজ্ঞান লাভের জন্য কোন এক মৃত রাজার দেহে ঢুকে নাকি করেছিলেন নারী সঙ্গম। সুতরাং কলুষিত শঙ্করাচার্য, শারদা দর্শনে নেই অধিকার কোন। কিন্তু শঙ্করাচার্য জানিয়েছিলেন, যৌনজ্ঞান নিয়েছিলেন তিনি পূর্ণ জ্ঞানের জন্য। কারণ, সকল জ্ঞান লাভ না করলে জ্ঞানে আসেনা পরিপূর্ণতা। তা ছাড়া আত্মাকে কখনও কলুষ করেনা স্পর্শ। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা থাকে স্পর্শলেশহীন চেতনাশূন্য।

কাশ্মীরের পণ্ডিতেরা শারদা মণ্ডলেই আয়োজন করেন শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তর্কসভার। কিন্তু তাঁরা হারাতে পারেননি শঙ্করাচার্যকে যুক্তি-তর্কে। নিজেরাই হার মানেন তর্কযুদ্ধে। শঙ্করাচার্যের বিরোধিতা করেছিলেন বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা। শঙ্করাচার্যও কাশ্মীরে এসেছিলেন বৌদ্ধ প্রভাব থেকে শারদামণ্ডলকে মুক্ত করতে। জয়লাভ করে কাশ্মীরকে তিনি মুক্ত করেছিলেন বৌদ্ধ প্রভাব থেকে।

পৌরাণিক গল্পে আছে, কাশ্মীরের শারদা বনে এসে শাণ্ডিল্য মুনি লাভ করেছিলেন ত্রিশক্তি রূপে শারদার সাক্ষাৎ। জনশ্রুতি, শঙ্করাচার্যও দেখেছিলেন শারদাপীঠের গহ্বর থেকে আবির্ভূতা সরস্বতী, শক্তি এবং দুর্গার সম্মিলিত রূপকে।

মূল শারদামন্দির প্রাকারবেষ্টিত। মন্দিরের পেছনে উঁচু পাহাড় থেকে একটা ঝর্ণা এসে পড়েছে নিচে, নাম অমরকুণ্ড। প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশপথ ছিল কোন্ দিকে কেউ জানে না। কালের বহু নির্মম আঘাত গেছে এর উপর দিয়ে। গেছে মানুষেরও নিষ্ঠুর ব্যবহার। এখন মূল মন্দিরে প্রবেশের পথ পশ্চিমে।

ঐতিহাসিক ও কবি কল্হন, দ্বাদশ শতাব্দীতে শারদা মন্দিরের দিয়েছেন ইতিহাস। তাতে অনুমান, এ-মন্দিরের বয়স হবে দু' হাজার বছরের কম নয়। শারদা থেকেই কাশ্মীরের একটি অচলিত নাম শারদাস্থান।

মন্দিরের অভ্যন্তর ক্ষুদ্র বটে, তবে ছায়াচ্ছন্ন। বিগ্রহ নেই কোন। একটি চতুষ্কোণ আছে সিঁদুর লেপিত শিলা মাত্র, শাক্তপীঠে সতীর অঙ্গ আছে যেমন ভাবে। সতীর অঙ্গ এখন সর্বত্রই আছে শিলারূপে। কামাখ্যা মন্দিরের যোনিদেশও শিলারূপ। তবে শারদাপীঠের পাথর নয় কষ্টিপাথর, রুক্ষ। কয়েক ইঞ্চি পুরু।

এই শারদা শিলাখণ্ডকে কেন্দ্র করেই কাশ্মীরের অগণিত যুগের ইতিহাস, সাহিত্য, কাব্য, গাঁথা এবং লোকসঙ্গীত; দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সব। আজ যাকে বলা হয় 'কাশ্মীরবোলী' অর্থাৎ নিজস্বভাষা কাশ্মীরের, তার মূল নাম হল 'শাদিবোল্সি' বা শারদা মণ্ডলের ভাষা। এই ভাষার ভিত্তি, গঠন এবং নির্মাণ হল আগাগোড়াই পুরনো ধরনের সংস্কৃত।

শারদাদেবীর মূল একখণ্ড শিলা হলেও, একদিন অন্যান্য পীঠস্থানের মত সেখানেও ছিল মূর্তি। অল্‌বিরুণী তার বিবরণীতে বলে গেছেন এই মূর্তির কথা। তিনি বলেছেন, 'মহাসিন্ধুনদের পথে বোলর গিরিশ্রেণীর মধ্যে আছে এক দারুমূর্তি, শারদা-সরস্বতী।'

কাশ্মীরের অন্যতম কবি বিল্হন, কল্হনের আগেই একাদশ শতাব্দীতে বর্ণনা করে গেছেন শারদা প্রসঙ্গ। বলেছেন "রাজহংসেশ্বরীর মত সুবিশাল মূর্তির পিছনে আছে স্বর্ণমণ্ডিত চালাচত্র। মধুমতী-গঙ্গার স্বর্ণরেনুকণায় বিধৌত সেই মূর্তি। তিনি জ্যোতির্ময়তা বিকীর্ণ করছেন বিশ্বভুবনের দিকে। স্ফটিকস্বচ্ছতায় নিত্য তিনি উজ্জ্বল।"

এই হল শারদাদেবী, যাঁকে কেন্দ্র করে কাশ্মীরের সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি এবং সব। পীঠনির্ণয়ের বর্ণনার আগে এই শারদা দেবীই ছিলেন কাশ্মীরের দেবী দেহোদ্ভূতা পীঠদেবী, অন্তত আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে যা জানা যায় (নিশ্চয়ই আবুল ফজল হিন্দু পণ্ডিতদের কাছেই এ কাহিনী শুনে থাকবেন)। পীঠনির্ণয়ে বর্ণনা করা হয়েছে সমগ্র কাশ্মীরে মহামায়ার দেহখণ্ডপাতের কথা। নির্দিষ্ট কোন স্থানের নেই উল্লেখ। তাহলে নিশ্চিত কি করে বলা যায় যে, অমরনাথই হল পীঠস্থান? তবে অমরনাথের পক্ষে বড় প্রমাণ এই যে, সেখানে রয়েছেন শিব স্বয়ং। এবং শিব ছাড়া শক্তি হলেন অর্থহীন। কিন্তু অমরনাথের শিবের নান কি ত্রিসন্ধ্যেশ্বর? মতান্তরে অনেকেই কাশ্মীরের দেবীর পাশে ভৈরবের নাম করেছেন অম্বরনাথ। তিনিই কি তবে অমরনাথ? এ রহস্য ভেদ হবার নয় সহজে।

সতীপীঠের পঞ্চম উল্লেখযোগ্য পীঠের নাম হল জ্বালামুখী। নির্ণয়ে লেখা আছে :

'জ্বালামুখ্যাং তথা জিহ্বা (মহা জিহ্বাং) দেব উন্মত্ত ভৈরব।
অম্বিকা সিদ্ধিদা নাম্নী (দেবী)······॥

অর্থাৎ, এখানে পড়েছে সতীর জিহ্বা। দেবীর নাম সিদ্ধিদা। ভৈরবের নাম হল উন্মত্ত। জ্বালামুখী প্রাচীন তীর্থ। দেবীপীঠ উদ্ভবের মধ্যপর্বে শাক্তপীঠ হিসাবে তার পরিচয়। পাঠানকোট থেকে জ্বালামুখী যেতে হবে কাঙড়া উপত্যকার দিকে ছোট লাইনের গাড়িতে। গাড়ি এনে নামিয়ে দেবে আপনাকে জ্বালামুখী রোডে। সেখান থেকে প্রায় তের মাইল দূরে জ্বালামুখী। বাসেই যায় লোকে। বাস যাত্রা কষ্টকর। উঁচু নীচু পথ দিয়ে যাতায়াত। ভীড়ও হয় অসম্ভব।

ধর্মশালা আছে, একটি আছে পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফের অফিস, আর আছে দু'দুটো হোটেল। পাণ্ডার উৎপাৎ যথেষ্ট। বুদ্ধি করে এড়াতে না পারলে পড়তেই হবে খপ্পরে।

একান্নপীঠের একটি পীঠ জ্বালামুখী—একথা বলেছি আগেই। তবে পাণ্ডাদের কাছে বিবরণ শুনলে হবেন বিভ্রান্ত। দিল্লীর লালকেল্লার গাইড আর হিন্দু মন্দিরের পাণ্ডার মত ইতিহাস-বিদ্বেষী মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। জ্বালামুখীর পাণ্ডারা পড়ে নি পীঠনির্ণয়। কিংবা হাজার গণ্ডা যে মত আছে পীঠ সম্পর্কে, তারই কোন একটার অনুসারী। পদব্রজে যিনি ভারত ভ্রমণ করেছেন সতের বার, তাঁর মুখে শোনা, দেবীর নাম অম্বিকা, ভৈরব হলেন উন্মত্ত। ভৈরবের নাম ঠিক আছে। তবে 'অম্বিকা সিদ্ধিদা নাম্নী'র অর্থ যদি হয়—অম্বিকা, সিদ্ধিদা নন, তাহলে কিছু বলার নেই। ভ্রমণ কাহিনী লিখে বিখ্যাত মিশনের কোন স্ট্যাম্প মারা এক স্বামীজীর কাহিনীতে দেখেছি, জ্বালামুখীর দেবীর নাম অম্বিকা এবং ভৈরবের নাম বটুকেশ্বর। পীঠনির্ণয়ের বর্ণনার সঙ্গে মিল নেই।

মন্দিরের কাছে আছে একটা কুণ্ড। স্নান করে সেখানেই পূজো দেয় লোকে। অবশ্য কুণ্ডে নামতে দেওয়া হয় না কাউকে, কারণ, কুণ্ডের জলেই হয় ৺মায়ের পূজা। কুণ্ডের ধারে পূজো সেরে করতে হয় মন্দির প্রদক্ষিণ। মন্দিরের উপরে আছে দুটি তপ্তকুণ্ড—ব্রহ্মকুণ্ড ও গোমুখী। এখানেও করতে হয় জলস্পর্শ। পূর্বদিকে প্রশস্ত আঙ্গিনার পরই প্রবেশ দ্বার। প্রবেশ দ্বারের দুই পাশে দুই বাঘের মূর্তি। সামনে একটা ছোট আঙ্গিনা আর নাট মন্দির। মূল মন্দির খুব বড় নয়।

পাহাড়ের উপরে জঙ্গলের মধ্যে ভৈরবের মন্দির। ৺মায়ের মন্দিরে নেই কোন মূর্তি। পাথরের ফাটল দিয়ে আসছে অগ্নিশিখা। এই অগ্নিশিখার মধ্যে জ্যোতির্রূপে আছে ৺মায়ের মূর্তি। শিখা সাতটি। তবে একটি শিখারই পূজো হয় বিশেষ ভাবে। ভূমিকম্পে নাকি বন্ধ ছিল ক'বছর। তারপর জ্বলছে আবার। তবে আগের মত তেজ নেই আর অগ্নিশিখায়। মন্দিরের মাঝখানে হোম কুণ্ডেও আছে দু-একটা

শিখা। এই শিখাতেই হোম হয়, যাত্রীরা দেয় আহুতি। এই হোম-কুণ্ডে পুজো দিয়ে নির্দিষ্ট শিখার পুজো করতে হয় পরে। হোমকুণ্ডের পাশেই আছে পাথরের বুকে ৺মায়ের দুটি পদ চিহ্ন। মৃত সতীর পায়ের ছাপ পড়ল যে এখানে কেমন করে, কে জানে! কিংবা জ্যোতির্ময়ী দেবীর পায়ের ছাপ! বিশ্বাসে হয় সবই।

পীঠনির্ণয়ের মতে দেবীর জিহ্বা পড়েছিল জ্বালামুখীতে। তবে আবুল ফজলের আইনা আকবরীতে আছে ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দুদের কাছ থেকে শোনা ভিন্ন ধরনের গল্প। যেমন মহামায়ার মুণ্ড এবং কিছু অঙ্গপ্রতঙ্গ পড়েছিল উত্তর কাশ্মীরে, (২) কিছুঅংশ পড়েছিল দক্ষিণ ভারতের বিজাপুরের কাছে তুলজা বা তুরজা ভবানীতে, (৩) কিছু অংশ পড়েছিল পূর্ব ভারতের কামরূপে এবং (৪) বাকী অংশ পড়েছিল নগর কোটের কাছে—যেখানে জালন্ধরী নামে লোকে পুজো করে সেই অংশকে।

জালন্ধরীর কাছেই মাটি থেকে এক জায়গায় ওঠে আগুন। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী দূর দূরান্ত থেকে এসে সেই আগুন দেখে। আগুনে ছুঁড়ে দেয় নানা জিনিষ পুণ্য অর্জনের আশায়।

এই প্রসঙ্গে আরও এক আশ্চর্য গল্প করেছেন আবুল ফজল কাঙ্ড়া সম্পর্কে। পার্বত্য সহর নগরকোট। তার দুর্গের নাম কাঙ্ড়া। সহরের কাছে আছে মহামায়ার মন্দির। মহামায়ার আছে যাদুকরী ক্ষমতা। দূর দূর প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে ইচ্ছাপূরণের আশায়। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, পুণ্যার্থীরা তাদের জিভ্ কেটে দেয় উপহার, যাতে দেবী তাদের ইচ্ছা পূরণ করেন সেই জন্য। কারো কারো নাকি জিভ্ গজায় তক্ষুনি, কারো গজায় দু-এক দিন পরে। হেকিমী মতে, যদিও গজাতে পারে কাটা জিভ্ তবু এত তাড়াতাড়ি তা অসম্ভব।

কোন্ মন্দিরের কথা বলেছেন আবুল ফজল? কাঙ্ড়াতেও একটা পীঠ আছে ব'লে লোকে বলে। তবে একান্নপীঠের মধ্যে নয়। একে বলে 'গুপ্ত পীঠ'। দেবীর বাম স্তন নাকি পড়েছিল এখানে। দেবীর নাম

ত্রিপুরমালিনী, ভৈরবের নাম ভীষণ। দেবীর কোন মূর্তি নেই। একটি ছোট শিলাখণ্ডের উপর হয় ৺মায়ের পূজো। মন্দিরের পিছনে আর একটি ছোট মন্দিরে আছে অষ্টভূজা ৺মায়ের মূর্তি। সতীর দেহখণ্ডকে ভিত্তি করে যে সকল পীঠস্থান, চরিত্রের দিক থেকে তাদের সঙ্গে কাঙ্‌ড়ার আছে স্পষ্ট মিল। ইদানিং অনেক ভ্রমণার্থী কাঙ্‌ড়া গিয়ে দেবীর নাম জেনেছেন ত্রিপুরমালিনী এবং ভৈরবের নাম ভীষণ। কিন্তু পীঠনির্ণয়ে ত্রিপুরমালিনী ও ভীষণ হলেন যথাক্রমে জালন্ধরের দেবী এবং ভৈরব। আবুল ফজল কাঙ্‌ড়ার দেবীকে মহামায়া আখ্যা দিলেও পরিচয়ে তিনি জালন্ধরী এবং রয়েছেন কাঙ্‌ড়া দুর্গের কাছে। কিন্তু জালন্ধরীর কাছেই আছে নাকি মাটি থেকে ওঠা অগ্নি-জিহ্বা, যে লক্ষণ জ্বালামুখীর। জিভ্‌ কেটে দেবার কথা শুনে ধারণা, আবুল ফজল বলেছেন জ্বালামুখীর কথাই। অথচ কাঙ্‌ড়ার কাছেও আছে দেবীপীঠ, কিন্তু সেখানে পাথরের ফাটল থেকে আসে না অগ্নিশিখা। জ্বালামুখী থেকে কাঙ্‌ড়া হল মাইল বিশেক দূরে। কাঙ্‌ড়া সহরের কাছে বলতে কি এই দূরত্বটাকেই বোঝাতে চাইছেন আবুল ফজল? কিন্তু সেখানকার দেবীর নাম হবে কেন জালন্ধরী? শোনা কথা এবং অস্পষ্ট ধারণা থেকে লেখা বলেই কি কাঙ্‌ড়া, জ্বালামুখী আর জালন্ধর গেছে জড়িয়ে? তৈরি করে ফেলেছে নতুন একটা কাহিনী? সত্যি, একান্নপীঠ সত্যি সত্যিই রহস্য!

☞ পীঠনির্ণয় অনুসারে একান্নপীঠের ষষ্ঠ পীঠ হল জালন্ধর। বর্ণনা আছে এইরকম:

···স্তনং জালন্ধরে মম।
ভীষণে. ভৈরবস্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী॥

বঙ্গ অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন এইরকম—

'জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন।
ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ॥'

জালন্ধরে পড়েছে দেবীর এক স্তন। দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী, এবং ভৈরবের নাম ভীষণ।

আমাদের একটা বড় স্বভাব শুদ্ধ উচ্চারণে আমরা নই অভ্যস্ত। মূর্খ কি পণ্ডিত, সবাই তাই 'গন্ধার'কে বুঝিনা না বললে গান্ধার এবং জালন্ধরকে জলন্ধর। এবং সেই সঙ্গে পঞ্জাবকে পাঞ্জাব। অর্থাৎ আমাদের ভুল উচ্চারণের যে পাঞ্জাব, এবং আরও ভুল উচ্চারণের জলন্ধর, তাকে চিনি আমরা সবাই। পাঞ্জাবের জেলাসহর জলন্ধর। নাম শুনলেই হয় বিশেষ রকমের একটা ধারণা। এবং সে ধারণাটা যে কি, সেটা বলছিনা আর স্পষ্ট করে।

জালন্ধরের পীঠে যদি যেতে চান, তাহলে জালন্ধর ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে নেমে যান দেবীতলাও। এখানে যে মন্দির ও বিগ্রহ, তা অর্বাচীন। তলাও বা পুষ্করিণীতে স্নান করে পাথরের পাশে করতে হবে অর্ঘ্যদান। পীঠস্থানের পাশেই আছে স্বামী শঙ্করপুরীজীর আস্তানা। জালন্ধর পীঠের কথা যদিও শাস্ত্রে উল্লেখ আছে অনেক দিনই, তবু লোকে বোধহয় এ-পীঠের কথা বিস্মৃত ছিল কিছুকাল। কারণ, অনেক দিনই স্থানটি ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পরে পরিষ্কার করে করা হয়েছে মন্দির নির্মাণ। প্রথমেই আছে কালভৈরবের, পরে মহাবীরের মন্দির। শাস্ত্রমতে দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী, কিন্তু মন্দির হল বিন্ধ্যেশ্বরীর। জটিলতা অশেষ।

পীঠস্থানে দেবীর নামও দেখা যাচ্ছে যে, মাঝে মাঝেই যায় পাল্টে। 'নামষ্টোত্তরশতম'-এ এখানে যে পীঠদেবীর করা হয়েছে নাম, পীঠ-নির্ণয়ের বর্ণনার সঙ্গে তার নেই মিল। 'নামষ্টোত্তরশতমে' বলা হয়েছে এইভাবে :

'জালন্ধরে বিশ্বমুখী, তারা কিষ্কিন্ধাপর্বতে।'

পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে : স্তনং জালন্ধরে মম। কিন্তু কালিকা পুরাণে আছে : জালন্ধরে স্তনযুগং স্বর্ণহারবিভূষিতম। আবার বাংলাতে বলা হয়েছে :

'জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন
ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ॥'

'পুণ্যতীর্থ ভারত' নামে এক ভ্রমণকাহিনীর লেখক বলেছেন—

'কথাপ্রসঙ্গে জানিলাম জলন্ধরেও আছে একটি পীঠস্থান।' লেখক একজন স্বামীজী। একান্নপীঠের কাহিনী তাঁর অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। কিন্তু পীঠের বর্ণনা বিভিন্ন শাস্ত্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিয়েছেন এমন ভাবে যে, একান্নপীঠের সন্ধান পাওয়াই দুষ্কর। অথচ জালন্ধর যে একটি পুরানো পীঠস্থান তাতে নেই সন্দেহ। জালন্ধর, কামরূপ, শ্রীহট্ট এবং পূর্ণগিরি গুরুত্বপূর্ণ মাতৃপীঠস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে অষ্টম শতাব্দী থেকেই।

পদ্মপুরাণে আছে, সাগরের ঔরষে ও গঙ্গার গর্ভে জলন্ধর নামে এক দৈত্যের জন্ম। তার জন্মকালে পৃথিবী উঠেছিল কেঁপে। কেঁপেছিল পাতালও। এতে ব্রহ্মার হয় ধ্যানভঙ্গ। কোন বিপদ হয়েছে অনুমান করে ব্রহ্মা বললেন এসে সাগরের কাছে—'হে সাগর, তুমি গর্জন করছ কেন এমন করে?' সাগর বললেন, 'প্রভো, এ আমার গর্জন নয়, আমার পুত্রের।'

সাগরপুত্রকে দেখেই ব্রহ্মা উঠলেন চমকে। সাগরপুত্রও ব্রহ্মাকে দেখে তাঁর দাড়ি ধরল টেনে। ব্রহ্মা উঠলেন যন্ত্রনায় কাতর হয়ে। কিন্তু নিজেকে পারলেন না মুক্ত করতে কিছুতেই। অবশেষে মুক্ত করলেন তাঁকে সাগর। শিশুর পরাক্রম দেখে ব্রহ্মা নাম রাখলেন তার জলন্ধর। বললেন, এ শিশু হবে তিন লোকের অধিপতি।

শিশুর পরাক্রম দিনে দিনে চলল বেড়ে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য একদিন সাগরকে তাই বললেন, 'হে সাগর তুমি মহাত্মাদের তপোভূমি থেকে যাও দূরে সরে, পুত্রকে স্থাপন কর একটি রাজ্যে।' শুক্রাচার্যের কথামত সাগর স্থাপন করলেন তাকে একটি রাজ্যে, সেই রাজ্যের নামই জলন্ধর।

জলন্ধর লাভ করেছিলেন এমন বর, যাতে তার স্ত্রী যতদিন থাকবে সতীসাধ্বী কেউ পারবেনা তাকে বধ করতে। কিন্তু বিষ্ণু একদিন জলন্ধরের রূপ ধরে তার স্ত্রী বৃন্দাকে করলেন বঞ্চনা। এই কারণে জলন্ধর হলেন শিবের কাছে পরাজিত। কিন্তু যত বারই জলন্ধরের

মাথা কাটেন শিব ততবারই তা জোড়া লাগে। অগত্যা শিব তার মাথা কেটে মাটিতে পুঁতে দিলেন পাথর চাপা।

আছে আর এক ধরনের গল্পও। জলন্ধর ছিল রাক্ষস। তার অত্যাচারে ত্রিভুবন হত কম্পিত। ভগবান তাই বামন রূপ ধরে হত্যা করলেন তাকে। মরার সময় রাক্ষস পড়েছিল উপুড় হয়ে। ফলে তার পীঠের উপরই গড়ে উঠল এক রাজ্য। সেই রাজ্যের নামই জালন্ধর। লোকের বিশ্বাস, এই জালন্ধরেই পড়েছিল সতীর বাম স্তন। বাঙ্গালী কবি বলেছেন, 'পাড়ল এক স্তন', সুতরাং হতে পারে যে বাম স্তনই পড়েছিল এখানে। কিন্তু পীঠনির্ণয়ে আছে, 'জালন্ধরে স্তনং মম' অর্থাৎ শুধুমাত্র পড়েছিল স্তন। কিন্তু কালিকা পুরাণের মতে পড়েছিল দুই স্তন—'স্তনযুগং'। যাঁরা জালন্ধরে বামস্তন পড়েছিল বলে করেন উল্লেখ, তাঁরা বলেন—দেবী এখানে 'বিশ্বমুখী'। 'নামষ্টোত্তরশতমে' আছে: 'জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্ধ্য পর্বতে।' কোনটা সত্য কে জানে। সত্যই অত্যন্ত বিশৃঙ্খল এই ইতিহাস।

পীঠনির্ণয়ের মতে দেবীর অঙ্গপাতে সপ্তম পীঠ হল বৈদ্যনাথ। তাই বলা হয়েছে: 'হার্দ্যপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরব:
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা.........॥'

বৈদ্যনাথধাম বা দেওঘর খুবই পরিচিত নাম আমাদের কাছে। কাছেপিঠে যে-সব জায়গায় আমরা প্রায়ই যাই বেড়াতে, বৈদ্যনাথ হল সেই সব জায়গার মধ্যে একটি, যেমন, রাজগির, রাঁচী, মধুপুর, গিরিডি ইত্যাদি। দেওঘরে আছে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সৎসঙ্ঘের আশ্রম। তবে শিব-ক্ষেত্র হিসেবেই বৈদ্যনাথের খ্যাতি। পুরাণে আছে: রাবণ নিত্য পূজো করতেন শিবকে। কৈলাসে শিব রাবণের পূজো দেখে খুশি। রাবণ বললেন—তাহলে চলুন আমার সঙ্গে লঙ্কায়। শিব বললেন—তথাস্তু। তবে আমাকে নিয়ে যেতে হবে মাথায় করে। নামাতে পারবেনা কোথাও। যেখানে নামাবে, সেখানেই থাকব স্থির হয়ে। রাবণ মাথায় নিয়ে চললেন শিবকে। তা দেখে দেবতারা ভয়ে অস্থির—শেষে কি না কি বর পেয়ে যান রাবণ!

রাবণ যখন শিবকে যাচ্ছেন মাথায় নিয়ে, তার আগে পার্বতীর পরামর্শে করে নিয়েছিলেন আচমন। সেই আচমনের সময় বরুণ ঢুকে পড়েছিল রাবণের পেটে। তার ফল পাওয়া গেল সময় মত। বৈদ্যনাথ আসতেই রাবণের পেল পেচ্ছাব। কি করবে রাবণ, শিবকে তো নামাতে পারবেনা কোথাও! সে পড়ল ভারি বিপদে। এমন সময় ব্রাহ্মণের বেশে বিষ্ণু এসে দাঁড়ালেন সেখানে। রাবণ ভাবল, ব্রাহ্মণের হাতে শিবকে রেখে বসা চলে পেচ্ছাবে, তাহলে আর মাটিতে নামানো হলনা শিবকে। ব্রাহ্মণের হাতে শিবকে দিয়ে রাবণ বসলেন পেচ্ছাবে। পেচ্ছাব হয় না আর শেষ। অনেক দেরী, ইতিমধ্যে শিবকে মাটিতে রেখে বিষ্ণু চলে গেছেন কোথায়।

পেচ্ছাব করে শৌচ সেরে রাবণ দেখলেন ব্রাহ্মণ পালিয়েছে শিবকে রেখে মাটিতে। অনেক টানাটানি করেও শিবকে আর উঠাতে পারলেন না রাবণ মাটি থেকে। স্তব স্তুতি করেও ফল হলনা কোন। ফলে রাগ করে তিনি শিবকে বসিয়ে দিলেন মাটির ভিতরে আরও গভীরে।

শিব খুশি নয় কিছুতেই। ফলে রাবণ আরম্ভ করলেন পূজো, তাতে যদি ভোলানাথের মন ফেরে। কিন্তু পূজো করতে গিয়ে বিপদ। জল নেই। যে দীঘি তার সামনে রয়েছে সেটা তৈরী হয়েছে পেচ্ছাবের জলে। অগত্যা শিবের স্নানের জন্য একটা কূয়ো তৈরী করে রাবণ চলে গেলেন লঙ্কায়।

পুরাণের কথামত সেই থেকেই শিব এসে আছেন বৈদ্যনাথে। কিন্তু লোকে জানত না সে-কথা। শিব প'ড়ে ছিলেন অনেক দিন অরণ্যে। অরণ্যে থাকতো এক গোয়ালা। নাম তার বৈজু। বেঁচে থাকে ফলমূল খেয়ে। শিব একদিন স্বপ্ন দেখালেন তাকে, 'আমি আছি এখানে। কেউ পূজো করেনা, তুমি কর।' বৈজু খুঁজে খুঁজে বের করল শিবকে। তারপর বনের ফলমূল দিয়েই করতে লাগল পূজো। পাত্রের অভাবে মুখে করে সে জল এনে দিত শিবকে। তাতে শিব ভয়ানক অখুশি। উচ্ছিষ্ট জলে স্নান করে তাঁর অস্বস্তি। অথচ অপরাধও পারেন না নিতে। কারণ, মনে পাপ নেই বৈজুর। অগত্যা শিব

স্বপ্ন দেখালেন রাবণকে। রাবণ পঞ্চতীর্থের জল নিয়ে এসে শিবকে করলেন অভিষেক। বাকী জল ঢেলে দিলেন কুয়োর মধ্যে। সেই থেকে সেই জল পবিত্র। তাই দিয়ে হয় শিবের পূজো।

পঞ্চতীর্থের পবিত্র জলে শিবের আর নেই অস্বস্তি। বৈজু তেমনই চলেছে পূজো করে। শিব একদিন বললেন বৈজুকে, আমি খুশি হয়েছি তোমার উপর, বর চাও। বৈজু বলল—আমার কোন অভাব নেই, চাইব কি? তবে যদি একান্তই চাও বর দিতে, তবে এই বর দাও আমাকে, লোকে যেন পূজোর সময় আমার নাম করে তোমার আগে। শিব বললেন, তথাস্তু। রাবণ এনেছিলেন এ শিব, তাই প্রথমে নাম ছিল রাবণেশ্বর। এবার থেকে নতুন নাম নিলেন বৈজুনাথ—, সেই বৈজুনাথই এখন বৈদ্যনাথ।

এই বৈদ্যনাথেই পড়েছিল সতীর হৃদয়। এবং পড়েছিল সেখানেই রাবণ যেখানে এনে বসিয়েছিলেন শিবকে। সেইজন্য বৈদ্যনাথ শুধু শৈব নয় শাক্তপীঠও। শিবের অর্থাৎ ভৈরবের নাম এখানে বৈদ্যনাথ, আর শক্তির নাম জয়দুর্গা।

জশিদি থেকে গাড়ি বদল করে যান পূর্বরেলের বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে। যদি করতে চান দেবীদর্শন শিবগঙ্গায় যান স্নান করে, এটাই বিধি।

পীঠনির্ণয়ের বর্ণনানুসারে শাক্তপীঠের অষ্টম পীঠ হল—নেপালে। নেপালে পড়েছিল সতীর জানু। বর্ণনা করা হয়েছে এই ভাবে:

'.........নেপালে জানু মে শিব॥
কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা।'

বাঙ্গালী কবির কলমে এর বঙ্গানুবাদ হয়েছে এই রকম:

'নেপালে পড়িল জঙ্ঘা কপালী ভৈরব।
দেবী তায় মহামায়া সদা মহোৎসব॥"

নেপাল আমাদের ঘরের পাশে। বিদেশ হলেও রয়েছে একটা আত্মিক যোগ। বিহারের সীমান্ত থেকে আপনি অনায়াসেই পারেন নেপাল যেতে। ভারতীয় চেকপোষ্ট রক্সৌল থেকে নেপালের

বীরগঞ্জ চেকপোষ্ট মাত্র তিন কিঃ মিঃ দূরে। কিন্তু আপনি কোন্ নির্দিষ্ট স্থানে নেপালে গিয়ে এই মহাতীর্থক্ষেত্র করবেন দর্শন? পীঠনির্ণয়ে কোন স্থান নির্দেশ করে দেওয়া হয়নি এখানকার। নেপালের বিখ্যাত মন্দির হল পশুপতিনাথের। শিবমন্দির সন্দেহ নেই, কিন্তু এত বড় শিব উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সতীর দেহ পড়েনি তাঁর কাছে। শিব কপালী নামে ভৈরব হয়ে কোথায় আছেন, পীঠনির্ণয়কার বলে দেননি সে কথা। শিবচরিতেও আছে যে, নেপালে পড়েছিল দক্ষিণজঙ্ঘা, দেবীর নাম মহামায়া বা নবদুর্গা। ভৈরবের নাম একই, কপালী। কিন্তু এই পীঠনির্ণয়ের বা শিবচরিতের বর্ণনা নিয়ে যদি কেউ নেপালে গিয়ে খোঁজ করেন একান্নপীঠের একপীঠ, দেখবেন, কেউ কোন হদিশ দিতে পারছেনা কোথাও। এমনকি নয় পাণ্ডারাও। সতী-শিবের গল্প, দক্ষযজ্ঞনাশের গল্প যে তাদের কাছে অজ্ঞাত, নয় তাও। কিন্তু তারা আপনাকে যে-স্থানে নিয়ে যাবে, তা সম্পূর্ণ কল্পনার বাইরে আপনার। মন্দিরের কাছেই তারা আপনাকে নিয়ে যাবে এমন যায়গায় যে, তীর্থস্থান বলে মনেই হবেনা তাকে। বিরাট আছে এক অশ্বত্থ গাছ। তলায় খানিকটা জায়গা বাঁধানো। একটা ছোট গর্ত। জলে পূর্ণ। চারদিকে রয়েছে বেড়া দেওয়া। পূজারী বলবে, এই হল একান্নপীঠের একপীঠ। এখানে পড়েছিল ৺মায়ের গুহ্যদেশ। তাই দেবীর নাম গুহ্যেশ্বরী। একেবারে যে হেসে উড়িয়ে দেবেন ব্যাপারটা, নয় তাও। কারণ, দেবীভাগবতে মধ্যেযুগের শাক্তপীঠের দেওয়া আছে একটি তালিকা। তাতে আছে :

'গুহ্যকাল্যা মহাস্থানং নেপালে যত প্রতিষ্ঠিতম্'

কি করে যে কি, কেমন করে হচ্ছে কোথা থেকে, বোঝার নেই উপায়। ফলে স্থানীয় পূজারীরা যা বলবে, মেনে নিতে হবে তা-ই। সুতরাং পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা হোক্‌না যা-ই কেন, নেপালে আপনি পাবেন না সতীর জানুদেশ। এবং তাঁকে পাবেন না মহামায়া রূপেও। পাবেন গুহ্যেশ্বরী হিসেবে।

কিছুটা যেন অবজ্ঞার ভাব। কিছুটা যেন চাপা পড়ে গেছে পশুপতির বিরাটত্বের আড়ালে। শিবভক্তদের এটা ইচ্ছাকৃত কিনা বলবে কে। কিন্তু নেপালের মানসিকতা মাতৃশক্তি বিরোধী এ-কথাও তো যায়না বলা। তা যদি হোত, তাহলে কুমারী পূজোর নামে এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটতো না নেপালে। নেপালে বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেকটি বিহালে (বিহারে) উলঙ্গ বালিকাকে পূজো করা হয় কালী বা দুর্গা হিসাবে। সারা রাজ্যের জন্যও এ-ধরনের কুমারী পূজার আছে ব্যবস্থা। এই কুমারী নির্বাচন করা হয় সাধারণতঃ বর্ণ হিন্দুদের মধ্য থেকে, বিশেষ করে পুরোহিতদের। নির্বাচনের দিন হল নবরাত্রের শেষদিনে, অবশ্য পরীক্ষা করে নেবার পর। অনেকেরই বিশ্বাস নেপালে, যে, নেপাল উপত্যকা হল কুমারীর। সুতরাং প্রতিবছর নেপালের রাজাকে অনুমোদন নিতে হবে এই কুমারীর কাছ থেকেই। পুরনো কুমারী যখন ঋতুমতী হবার মুখে, তখনই নির্বাচন করা হয় নতুন কুমারী। সুতরাং ৺মায়ের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব আছে নেপালীদের মধ্যে একথাও যায়না বলা। কিন্তু তবুও, একান্নপীঠের ব্যাপারটা যে কি, বলবে কে। ঐতিহাসিকদের ধারণা, পরবর্তীকালে একান্নপীঠের কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে নেপালে, এবং এ-কল্পনা করেছেন নেপালীরা নয়, বাইরের মানুষ নেপালের। ঈশ্বর ছাড়া এ রহস্য ভেদ করবার আর কেউ নেই।

পীঠনির্ণয়ের হিসাব অনুযায়ী একান্নপীঠের নবম পীঠ হল মানসে। যেমন :

'মানসে দক্ষহস্তো মে দেবী দাক্ষায়ণী হর।
অমরো ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥'

অর্থাৎ মানসে দেবী হলেন দাক্ষায়ণী এবং ভৈরব হলেন অমর। পড়েছে দেবীর দক্ষিণ হাত

বাঙ্গালী কবির ভাষাতে :

'আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মান সরোবরে।
দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে॥'

মূলটাকে রেখে তিনি অবশ্য পীঠনির্ণয়ের নিচের অংশটুকু দিয়েছেন বাদ,

যেখানে ভৈরবের নাম দেওয়া হয়েছে অমর। কিন্তু বাঙ্গালী কবির বর্ণনাতে দাঁড়াচ্ছে, ভৈরব হল হর। অবশ্য উপরের অংশেরও দক্ষিণ হস্তের সবটুকু রাখেননি তিনি। ডান হস্তকে করেছেন অর্ধেক। এবং এই সব উর্বর মস্তিষ্কের জন্যই সম্ভবতঃ সব ব্যাপারটাই পড়ে গেছে একটা বিরাট গোলমালে। অন্য একটি বর্ণনাতে, সংস্কৃতেই, 'মানসের' পরিবর্তে 'মালব'-এর করা হয়েছে উল্লেখ, যেমন—'মালবে দক্ষহস্তং'। পীঠনির্ণয়েরই ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে 'মানসের' বদলে 'মালবে' কথাটি লেখা আছে। আবার ঐ পীঠনির্ণয়েরই আর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'দাক্ষায়ণী হরিঃ' শব্দটি। সুতরাং সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা যাবে কি করে? পাঠক হয়তো গেলেন মানস সরোবরে—কিন্তু গিয়ে এলেন ব্যর্থ হয়ে। মানস-কৈলাস শিবের ক্ষেত্র, এ-কথা ঠিক। এবং শিবের সঙ্গে পার্বতীও যে সেখানে আছেন বিরাজমানা এটাও সত্য। কিন্তু তাই বলে যে, সতীর দেহের কোন অংশকে পড়তেই হবে মানস কৈলাশে এমন নেই কথা। তীর্থপুণ্যমানসে হয়তো খরচা করে গেলেন শতদ্রুর উৎস মানস সরোবরে,—তারপর হয়তো কিছুই পেলেন না খুঁজে পেতে। তখন? ৺মায়ের 'নামষ্টোত্তরশতম'-এ আছে—'মানসে কুমুদা নাম বিশ্বকায়া তথাম্বরে।' পীঠনির্ণয়ের সঙ্গে মিল নেই। পীঠনির্ণয়ের মতে দেবীর নাম দাক্ষায়ণী। অবশ্য সতীকে যে আদর করে দাক্ষায়ণী নামে ডাকতেন শিব একথার দক্ষযজ্ঞনাশ গল্পেই আছে উল্লেখ। ভ্রমণের জগতে সুলতান মামুদসদৃশ্য এক ভদ্রলোক, যিনি সতেরবার পায় হেঁটে ভারত করেছেন পরিভ্রমণ, তাঁর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করে এ-ব্যাপারে পেয়েছি যে বর্ণনা, তাতে তিনি মানস সরোবরকেই লিখে দিয়েছেন একান্নপীঠের অন্যতম একটি পীঠ বলে। তাঁর বর্ণনা এইরকম—যেমন: এই মানস হল তিব্বতের অন্তর্গত মানস সরোবর। দেবীর বামহস্তার্ধ পড়েছে এখানে। দেবীর নাম দাক্ষায়ণী, ভৈরবের নাম অমর। ভারত সীমান্ত থেকে পদব্রজে ১২৫ মাইল পথ হাটলে গ্যারিয়াং গিরিপথ পার হয়ে তিব্বতের কৈলাস পর্বতের পাদদেশে পাবেন মানস সরোবর। এখন যদি যান, পথে তাঁবু, গাইড,

কুলি ও চীন সরকারের লাগবে পাশপোর্ট। কৈলাস পর্বতের একখণ্ড শিলায় অবস্থান করছেন দেবী। সর্বত্রই অবশ্য মূলতঃ দেবীর অধিষ্ঠান শিলাতে। তাঁর দেহাংশ সর্বত্রই আছে শিলারূপে। কামরূপ গেলেও তাই, কালীঘাটেও একই। সকলেই বলবেন, এ মূর্তি নয় আসল, আসল মূর্তি রয়েছেন শিলিভূত আকারে। তবে চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'তন্ত্রকথায়' আছে যে, মানস সরোবরের দেবী হলেন ভীষণাকৃতি দশভূজা।

দুর্গম গিরি পার হয়ে অনেকেই গিয়েছেন মানস সরোবরে। কিন্তু তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে একান্নপীঠের একটি পাঠ যে এখানে অবস্থিত তার নেই কোন উল্লেখ। জনৈক স্বামীজী—যিনি 'পুণ্যতীর্থ ভারত' নামে লিখেছেন ভ্রমণ কাহিনী—তিনি মানস কৈলাস ভ্রমণ করেও এই শাক্ত-পীঠের সন্ধান পাননি কোথাও। কারণ, সর্বদেবতায় তাঁর যে ধরনের ভক্তি, তাতে—এখানে কোন শাক্তপীঠের সন্ধান পেলে ৺মায়ের পূজা না দিয়ে যে ক্ষান্ত হতেন না তিনি এ বিষয়ে নেই সন্দেহ। সুতরাং সন্দেহ হয়, পীঠবর্ণনাতে অনেকেই যখন 'মানস'-এর পরিবর্তে করেছেন 'মালব' শব্দের ব্যবহার, তখন। বস্তুতঃ এ-পীঠটি নয়তো মালবেই? তবে মালবে হবার সম্ভাবনা কম, কেননা এই পীঠনির্ণয়েই উজ্জয়িনীকে (মালবের একটি শহর, প্রাচীন রাজধানী) একান্ন পীঠের একটি অন্যতম পীঠ বলে করা হয়েছে বর্ণনা। কিন্তু এখানেও গোলমাল। কে না জানে উজ্জয়িনীর শিব অর্থাৎ মহাকালের নাম? অথচ পীঠনির্ণয়ে মহাকালের নাম নেই, সেখানে ভৈরবের নাম করা হয়েছে কপিলাম্বর এবং দেবীর নাম মঙ্গলা। আর উজ্জয়িনী বাদে যদি মালবকে আলাদা করে হয় বোঝাতে, তাহলে সম্ভবতঃ বোঝাবে পূর্বমালবকেই। এর প্রাচীন রাজধানী হল বিদিশা—জীবনানন্দের সেই কবিতার লাইন—'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।' এখন অবশ্য নাম আর বিদিশা নয়, বেস্‌নগর, গোয়ালিয়রে। তবে, সব দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে, মালব নয়, মানসেই হবে পীঠস্থান। যদি সশরীরে সেখানে গিয়ে পীঠপুণ্য না পারেন সংগ্রহ করতে, তাহলে করুন মানসেই।

পীঠনির্ণয়ের দশম পীঠ হল উৎকলে, বিরজাক্ষেত্রে। বলা হয়েছে :

'উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী, জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ ॥'

অর্থাৎ উৎকলে পড়েছিল সতীর নাভি। দেবী এখানে বিমলা, এবং ভৈরব হলেন জগন্নাথ। কিন্তু মধ্যযুগের সেই বাঙ্গালী কবি এ বর্ণনা মানতে নন রাজি। এবার তাঁর অনুবাদ তাই একটু ভিন্ন রকম, যেমন—

'উৎকলে পড়িল নাভি, মোক্ষ যাহা সেবি।
জয় নামে ভৈরব বিজয়া নামে দেবী ॥'

পীঠনির্ণয়েরই ভিন্ন এক পাণ্ডুলিপিতে আছে—

'বিরজাচোৎকলেখ্যাতা নাভির্মে মম ভৈরব।'

বাঙ্গালী কবি, অর্থাৎ ভারতচন্দ্র একে পড়তে চান এইভাবে—

'বিজয়াচোৎকলেখ্যাতা নাভির্মে জয় ভৈরব।'

বা

'বিজয়া সা মহাদেবী জয় নামা তু ভৈরব।'

'শিবচরিত' বলে একটি পীঠবর্ণনা গ্রন্থে কিন্তু ভারতচন্দ্রের বর্ণনার সঙ্গে আছে মিল। তাতে উৎকলে নাভিদেশ পড়ে যে হয়েছে দেবীর সৃষ্টি, তাঁর নাম বলা হয়েছে বিজয়া, এবং ভৈরবের নাম জয়।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের দক্ষযজ্ঞভঙ্গ অংশে বলেছেন—

'দক্ষিণ চরণ বরে পড়িল যে যাজপুরে
তার নাম হইল বিরজা।'

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুনাথ কর যে বৈতরণী তীরবাসী যাজপুরের এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ১৮ পাঠের সংগ্রহ করেছিলেন নাম—তাতে উৎকলের কথা বলা ছিল এইভাবে—

'উৎকলে বিরজা দেবী মাণিক্যাং চক্রকোটিলে।'

পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা মত উৎকলে যেখানে পড়েছিল নাভিদেশ তার নাম বিরজাক্ষেত্র। বিরজাক্ষেত্রকেই পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন বর্তমান যাজপুর, উড়িষ্যার কটক জেলাতে। কিন্তু ভৈরব যদি পুরী

জেলাতে হয় তবে নিশ্চয়ই তা এসে পড়ে পুরীতে। ঘটনার সত্যতা যে কি—তা উদ্ধার করা অসম্ভব। জগন্নাথের জয়যাত্রা লক্ষ্য করে শেষপর্যন্ত কি শাক্তেরাও এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করবার জন্য তাঁরই ছত্র ছায়াতলে? নইলে জগন্নাথ তো শিব নন। চক্রতীর্থ উপনীত যে দারুকাষ্ঠ দিয়ে তাঁর নির্মাণ। তাতে স্বীকার করতে হয় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। পণ্ডিতেরা জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মধ্যে পেয়েছেন বৌদ্ধ ত্রিরত্নের সন্ধান। আবার একদল পণ্ডিতের মতে শৈব ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের রয়েছে নিকট সম্পর্ক—যেমন রয়েছে শিবের ধ্যাননেত্র এবং বুদ্ধের ধ্যাননেত্রের মধ্যে। শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টই দক্ষযজ্ঞ নাশ অংশে দেখিয়েছে, বিষ্ণু আর শিবে নেই কোন পার্থক্য। সেই কারণেই কি শাক্তদের চোখে জগন্নাথও হয়েছেন ভৈরব?

পুরী গিয়েছি আমি বহুবার। নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে—নয় তীর্থপুণ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজনে। কারণ, তাহলে নানা দেবদেবীর ইতিহাস সংগ্রহ করতাম বসে বসে। সাক্ষীগোপালে পাণ্ডাদের উৎপাতের জন্য তাদের কথা আছে মনে। কিন্তু মনে নেই অনেক দেবদেবীর কথাই। পুরীর কথায় ধর্মচিন্তার সামান্য কোন চিত্রও যদি ভেসে উঠে চোখের উপর তবে তা বিরাটাকার জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রের মূর্তি। সমুদ্রের তীরে অপ্রয়োজনে অসংখ্য ঢেউ গুনেছি বসে বসে, কিন্তু ঠাকুর দেবতার সংখ্যা গণনা করিনি এতটুকুও। এ লজ্জা স্বীকার করছি বর্তমান কাহিনী লিখতে বসে। পুরীর মন্দির চত্বরের মধ্যেই আছে একান্ন পীঠের একটি পীঠ। বিমলাদেবী নামে আছে সেখানে দেবীর এক অর্বাচীন মূর্তিও। মূর্তি নিয়ে গল্পেরও নেই অভাব। গল্প আছে জগন্নাথ মন্দির তৈরি হবার পরও বহুদিন জগন্নাথ হননি সেখানে স্থাপিত। অবশেষে যখন জগন্নাথ এলেন মন্দিরে এসে দেখলেন বিমলা দেবী সেখানে আছেন অধিষ্ঠান করে। তিনি মন্দির ছাড়লেন এক শর্তে, শর্ত এই, প্রত্যেক দিন জগন্নাথ ও বলভদ্রকে নৈবেদ্য দেবার পর বিমলাকে তা করতে হবে অর্পণ। সেই নিয়ম চলে আসছে আজও। তবে এ-সব গল্প-কাহিনী থাকা সত্ত্বেও বিমলাদেবী কিন্তু সতী

অঙ্গোদ্ভূতা দেবী হিসেবে আমার পড়েনি চোখে। কিন্তু বহু তীর্থপুণ্য প্রয়াসীই সেখানে দক্ষিণা দিয়ে করেছেন রীতিমত মাথা নত। আমার দুর্ভাগ্য।

দেবীর নাভিদেশ উৎকলের যে কোন অংশেই পড়ুক না কেন, আজ যে দেবীর স্থান হয়েছে জগন্নাথের ছায়ার নিচে সে বিষয়ে নেই কোন সন্দেহ। একান্নপীঠের একটি পীঠ আজ যদি আপনারা দেখতে চান উৎকল দেশে, তাহলে অবশ্যই বিরজাক্ষেত্র বা নয় কটক জেলা শাস্ত্র যাই বলুক না কেন, আপনাকে যেতে হবে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যেই।

পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা মতে একান্ন পীঠের একাদশ পীঠ হল গণ্ডকী বা গণ্ডকে—যে বিষয়ে বর্ণনা আছে এইভাবে :

……..গণ্ডক্যাং গণ্ডপাতশ্চ তত্র সিদ্ধির্নসংশয়।
তত্র সা (সা তত্র) গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণিস্তু ভৈরবঃ ॥'

অর্থাৎ গণ্ডকে পড়েছে সতীর গণ্ডদেশ। দেবীর নাম গণ্ডকী চণ্ডী, ভৈরবের নাম চক্রপাণি।

বাঙ্গালী কবি কিন্তু অঙ্গব্যবচ্ছেদে পীঠনির্ণয়কার থেকে ওস্তাদ অনেক বেশী। সর্বত্রই তাঁকে দেখছি অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পীঠনির্ণয় থেকে এগিয়ে। পীঠনির্ণয় যেখানে শুধুমাত্র 'গণ্ডপাত' বলে দিয়েছেন ছেড়ে, সেখানে তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কোন্ গণ্ড তাও দিয়েছেন বলে। যেমন,

গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্র যায়।
চক্রপাণি ভৈরব, গণ্ডকী চণ্ডী তায় ॥'

কিন্তু দুই গণ্ডই পড়ুক আর এক গণ্ডই পড়ুক, প্রথম যে প্রশ্ন আমাদের সামনে, তা হল এই, গণ্ডকী আছে কোথায়? কোথায় যাব গণ্ডকী চণ্ডীকে আমাদের ভক্তি অর্ঘ্য করতে নিবেদন?

গণ্ডকী নয় কোন জায়গার নাম, এটি একটি নদী, এখন যাকে বলে গণ্ডক। গঙ্গার একটি শাখা। আবার গঙ্গার সঙ্গেই এসে মিলেছে বিহারের বক্তিয়ারপুরের কাছে। পীঠের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা

চর্চা করেছেন—তাঁরা বলেন, শালগ্রামের কাছে, গণ্ডকের যেখানে উৎপত্তি, সেখানেই হবে এই পীঠস্থান। কিছু কিছু তান্ত্রিকের মতে এটা হল মুক্তি-নাথ তীর্থ, নেপালে। কেউ কেউ বলেন, কালী গণ্ডকীর উৎস যে মাসতং, সেখানে। যদি আপনি মনে করেন যে, তান্ত্রিকদের ধারণাই সত্য, মুক্তিনাথই হল এই গণ্ডপাতের ক্ষেত্র, তাহলে নেপালের পোক্‌রা থেকে হাঁটাপথে ১২৬ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে আপনাকে যেতে হবে মুক্তিনাথে, সমুদ্রতল থেকে ১২৪৬০ ফুট উচ্চে।

কিন্তু পদব্রজে বহুবার ভারত পরিভ্রমণ করেছেন এমন লোকের ধারণা—কালী গণ্ডকীর উৎস মাসতং-ই এই পীঠস্থান। কালী গণ্ডকীর ধারে ধারে অন্ততঃ ৪৬ মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে আপনাকে জমসম থেকে মাসতং। কারণ, এখানেই পাশে আছে চণ্ড নামে অনাদি লিঙ্গ। লোকের বিশ্বাস, নদীর উৎসমুখের কুণ্ডে থাকেন দেবী। কোন মূর্তি নেই। শিলাখণ্ডে হয় পুজো। শিলাখণ্ডে দেবী পুজো হলে আশ্চর্য হবার নেই কিছু। বস্তুতঃ সেটাই হল স্বাভাবিক। গণ্ডকীর দেবীর নাম চণ্ডী। এই চণ্ডী নানাভাবে পূর্ব ভারতের গ্রামে গঞ্জে করেণ অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে বিরাজ। চণ্ডী শব্দের উৎপত্তি কি ভাবে জানিনা। তবে 'চাণ্ডি' বলে একটি শব্দ আছে ভারতের আদিম অধিবাসিদের মধ্যে, মুণ্ডারি ভাষায় 'চাণ্ডি' অর্থ শিলাখণ্ড। আদিম জন গোষ্ঠি এই শিলা খণ্ডের পূজা করেছে বহুদিন। শিলাখণ্ড সম্পর্কে আজও আমাদের রীতিমত শ্রদ্ধা। নীলা, গোমেদ, পোখরাজ নানা পাথরকে আজও আমরা সমীহ করি জাগ্রত বলে। সুতরাং শিলাখণ্ডকে দেবী কল্পনা করে পূজা করাটা নয় অসম্ভব কিছু ব্যাপার। সে যাই হোক জায়গাটা নয় কাছে, সেই নেপাল-তিব্বত সীমান্তে। তবে থাকবার আছে ব্যবস্থা। গিয়ে অথৈ জলে পড়বেন না বা মরুভূমিতে। ধরমশালা আছে কাছেই। যদি পুণ্য সঞ্চয়ে আপনি হন দৃঢ়সংকল্প—তাহলে পত্র লিখুন 'পোক্‌রা ট্যুর-এণ্ড ট্রাভেল্‌স'কে।

পীঠনির্ণয়ের মতে দ্বাদশ শাক্তপীঠ হল বহুলাতে। এখানে পড়েছে সতীর বাম বাহু। দেবীর নাম বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক।

"বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাস্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরব স্তত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥'

পাণ্ডুলিপিভেদে কোথাও বা 'বহুলায়াং'—এর স্থলে বলা হয়েছে 'বাহুলায়াং'। আবার ভীরুকের স্থলে বলা হয়েছে 'তীব্রকো ভৈরবো দেবঃ'। অন্নদা মঙ্গলে আছে—

'বাহুলায় বাম বাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥'

জায়গাটা কোথায়, আঁচ করতে পারেন কিছু? আপনি বোধ হয় ভাবছেন লোটা কম্বলের কথা? অনির্দিষ্টের পথে বেরিয়ে পড়তে হবে এই ভেবে? না, না, এবার আর নেই ভয়ের কোন কারণই। আমাদের ঘরের খুব কাছেই এই মহাশাক্তপীঠটি। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রামে। প্রাচীন কালে এই কেতুগ্রামকে বলা হত বহুলা বা বাহুলা। রাজা চন্দ্রকেতুর নাম থেকে এর নাম হয় কেতুগ্রাম। গ্রাম হিসেবে যথেষ্ট প্রাচীন। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বহুলা। এর ভৈরব হলেন শ্রীখণ্ডের উত্তর দিকে অবস্থিত অনাদি লিঙ্গ শিব। প্রাণতোষণী-তন্ত্রে এই শিবকেই বলা হয়েছে ভীরুক। কেতুগ্রাম হল অজয় নদীর তীরে। আমাদের একেবারে প্রাণের সামগ্রী, কুমুদরঞ্জনের সেই কবিতার মত, 'উজানী আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।' এই পীঠের সব চাইতে কাছের রেল ষ্টেশন হল—কাটোয়া আহম্মদ শাখার অম্বলগ্রাম। কাটোয়া থেকে দূরত্ব প্রায় আট কিঃ মিঃ। ট্রেন যদি না ধরতে চান, বাসও আছে। কাটোয়া কিংবা বর্ধমান থেকে বাস পাবেন কেতুগ্রামের। পুরনো এক মন্দির আছে। কাছেই আছে এক যাত্রীনিবাস। অতন্তঃ হাত-পা ছড়িয়ে পারবেন একটু বসতে।

পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা মতে, ত্রয়োদশ শাক্তপীঠ হল উজ্জয়িনী:

"উজ্জয়িন্যাং কূর্পরশ্চ মাঙ্গল্য কপিলাম্বর (মঙ্গলা কপিলাম্বর)।
ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা॥"

অর্থাৎ উজ্জয়িনীতে কপিলাম্বর হলেন ভৈরব এবং মঙ্গলা বা মঙ্গল চণ্ডিকা দেবী।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রকারদের বর্ণনাতে সচরাচর যা হয়, অর্থাৎ বর্ণনাতে থাকেনা কোন মিল, সেই দোষ থেকে ত্রয়োদশ পীঠবর্ণনাও নয় মুক্ত। কেউ বলেছেন—উজ্জয়িন্যাং কুর্পরশ্চ, কেউ বলেছেন উজ্জন্যাং কুর্পরশ্চৈব, কেউ বলেছেন—উর্জ্জয়িন্যাং কুর্পরশ্চ। অন্নদামঙ্গলের বঙ্গানুবাদ হল এই ধরনের :

'উজানীতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি ॥'

উজ্জয়িনীর নাম কে না জানে। যে লোক ইতিহাসের ধার ধারে না সেও রোমান্টিক ভাববিলাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ার সময় নিশ্চয়ই একবার না একবার পড়েছে এই লাইন কয়টি :—

"দূরে বহুদূরে
স্বপ্নালোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদী পারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধাআধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।
মহাকাল মন্দিরের মাঝে—
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, উর্দ্ধে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।'

উজ্জয়িনী নয় হেলাফেলার জায়গা। অনেক কিংবদন্তী আর ইতিহাস জড়িয়ে আছে এখানে। প্রাচীন পীঠস্থানের তালিকাতে উজ্জয়িনীরও আছে নাম। অবন্তী বা পশ্চিম মালবের রাজধানী এই উজ্জয়িনী। এখন অবশ্য পশ্চিম ভারতের গোয়ালিয়রে। বর্তমানে

আর উজ্জয়িনী নাম নেই, নাম হল উজ্জইন। শৈবতীর্থ উজ্জয়িনী, মহাকালের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। শিবের যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ আছে তার একটি আছে উজ্জয়িনীতেই, মহাকাল নামে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শৈবক্ষেত্র উজ্জয়িনীতে সতীর দেহখণ্ড পড়া নয় তেমন আশ্চর্য কিছু ব্যাপার। তার পীঠনির্ণয় পীঠ হিসেবে উজ্জয়িনীর নাম করেছে বটে—কিন্তু ভৈরব হিসেবে মহাকালের নাম না করে করেছে কপিলাম্বরের। মহাকাল ব্যতীত উজ্জয়িনীতে হতে পারে না শিব। সুতরাং মহাকালেরই যখন নাম নেই তখন এ-পীঠ নয় উজ্জয়িনী। সেই সুযোগে হয়তো বাঙ্গালী কবির উর্বর মস্তিষ্ক থেকে লাফিয়ে নেমেছে—উজ্জয়িনীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলাদেশের আর একটি জায়গার নাম—উজানী।

হ্যাঁ, উজানী বলে একটা জায়গা আছে বর্ধমান জেলাতে—উজানী বা কোগ্রাম। থানা মঙ্গলকোট। গেলে পরেই দেখবেন, লোকে বলবে, হ্যাঁ, সতীমায়ের ডান কনুই পড়েছিল এখানে। দেবী মঙ্গলচণ্ডী, ভৈরব হলেন কপিলেশ্বর।

আপনি হয়তো ভাববেন, পীঠনির্ণয়ে, দেখলাম কপিলাম্বর, উর্বর মস্তিষ্ক ভারতচন্দ্রও দেখছি লিখেছেন ঐ নামই, হঠাৎ সেটা আবার কপিলেশ্বর হল কি করে? হয়। এবং ভারতবর্ষে গুলগপ্পো তৈরি হয় এইভাবেই। এক জনের কাছ থেকে আর একজন, তার কাছ থেকে আর একজন; একজনের এক উচ্চারণ আর একজনের আর এক। শেষে গোড়ার উচ্চারণ যে বেমালুম কোথায় পড়ে গেছে চাপা—ইতিহাসের বাবার সাধ্যি নেই তাকে উদ্ধার করে সেখান থেকে। যেমন, আমার—কলেজে যাওয়ার পথে আছে একটা বাস স্টপেজ—কেত্‌লা হাট। কনডাক্টররা তারস্বরে চিৎকার করে—কেত্‌লা হাট, কেত্‌লা হাট। এ-ধরনের অদ্ভুত টাইপের নাম কেন, খোঁজ করতে গিয়ে একজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম রহস্যটা। আসলে নাম হল—কেঁয়াতলা। সেটাই শেষপর্যন্ত হয়েছে কেত্‌লা। পীঠনির্ণয়ের উজ্জয়িনী সেই ভাবেই হয়তো শেষপর্যন্ত ভারতচন্দ্র এসে ঠেকেছে উজানীতে। কোথায় পশ্চিম, আর কোথায় পুব। অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর

মেটারনিক নাকি এক প্রগতিশীল পোপকে দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন,—There is no answering for anything. কোন কিছুরই জবাব নেই। সুতরাং মূল যখন হাতের বাইরে, তখন মুঠোর মধ্যে যা আছে তাকেই সত্য বলে মানা ছাড়া নেই গত্যন্তর। ফলে উজ্জয়িনীর থাক না যত ঐতিহ্যই, শাক্তপীঠ হিসাবে উজানী মানিয়েছে তাকে হার। এখন উজানী ভরসা কেবলম। দ্বিধা করবেন না কোন, উজানীকেই নিন মেনে।

উজানীও যে একেবারে ইতিহাস বর্জিত, তা নয়। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থ ঘেঁটে উজানীর বের করেছেন একটা ঐতিহ্য। বৌদ্ধ কুব্জিকাতন্ত্রে বর্ণিত 'ওড্ডিয়ান মঙ্গলকোষ্ঠ' কেই এই উজানী বলে মনে করেন অনেকে। বর্তমানে এর নাম মঙ্গলকোট। মঙ্গলকোটের দেবী বলেই দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী। গুসকরা স্টেশন থেকে ১৬ মিটার পথ অতিক্রম করে গেলেই পাবেন উজানী। বাস আছে। গেলে পরে একেবারে যে শূন্য হাতে আসবেন ফিরে তাও নয়। শাক্ততন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের অপূর্ব শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখবেন এখানে। মন্দিরের চণ্ডীমূর্তির পিছনে একই গর্ভগৃহে আছেন বৌদ্ধতন্ত্রমতের বজ্রাসন বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধমূর্তি পেছনে, দেয়ালে আঁকা। চণ্ডীমূর্তি পিত্তলময়ী। দশভূজা মহিষমর্দিনী সিংহবাহিনী চণ্ডিকা। কাঠের সিংহাসনের উপর এই মূর্তি রয়েছে। বাঁয়ে পাথরের পলতোলা কালো লিঙ্গমূর্তি। এই লিঙ্গই কপিলাম্বর বা কপিলেশ্বর শিব। দু'য়েরই হয় পুজা।

এখানেই অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমে পাবেন—বৈষ্ণব ভক্ত লোচনদাসের শ্রীপাট। এই উজানীই হল শ্রীমন্ত সওদাগর ও কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মস্থান। কুমুদের সেই কবিতার লাইনটি ভুলবার নয় কখনও—'উজানী আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।'

পীঠনির্ণয়ের চতুর্দশ শাক্তপীঠ হল চট্টলে। পীঠ নির্ণয়ের বর্ণনা মতে :

'চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরব চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী যত্র (তত্র) দেবতা ॥

অর্থাৎ দক্ষিণ বাহু পড়েছে চট্টলে, অর্থাৎ চট্টগ্রামে। ভৈরব হলেন চন্দ্রশেখর। দেবী ভবানী। বাঙ্গালী কবির বর্ণনা মতে:

'চট্টগ্রামে ডান হস্ত অর্ধঅনুভব।
ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব॥'

বাহু এবং হস্ত নিশ্চয়ই এক নয়। অর্থাৎ বাঙ্গালী কবির বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, সামান্য হেরফের হচ্ছেই। এবার যতই এগুবেন, ততই দেখবেন বর্ণনার নেই মিল। একান্নপীঠের স্থাননির্ণয়ের কোন উপায়ই যাচ্ছেনা পাওয়া। একজন বললেন—দেখুন জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধান। অভিধান খুঁজে চক্ষুস্থির। পীঠনির্ণয়ের বর্ণনার সঙ্গে নেই মিল। সেখানে লেখা আছে দক্ষিণ বাহু পড়েছে বক্রেশ্বরে। দক্ষিণ হস্তার্ধ চট্টলে।

কোন এক জায়গায় বিরাট একটা গোলমাল ঘটে গেছে নিশ্চই। পীঠনির্ণয় বইটাও নয় মূল গ্রন্থ। মূলগ্রন্থ কুব্জিকাতন্ত্র। তাতে আছে ৪২টি পীঠের কথা। তারপর এসেছে 'শিবচরিত' বলে আর একটি বই। নিজের মহিমা প্রকাশের জন্য পীঠনির্ণয়ের সংখ্যা শিবচরিত বাড়িয়ে গেছে ইচ্ছামত। মূল পীঠ—৪২ থেকে হয়েছে ৫১। কেমন করে, কিসের জন্য, বলা কষ্ট। হয়তো কামাখ্যার দশমহাবিদ্যাকে এর অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা থেকেই হয়েছে এমনতর। অবশ্য সেক্ষেত্রে পীঠ-সংখ্যা হওয়া উচিত ৫২। বৃহন্নীলতন্ত্র ব'লে একটা বইয়েই আছে ৫২ পীঠের কথা। ব্যাপারটা হোকনা যাই কেন, শিবচবিত পীঠনির্ণয়ের উপর নিজের বাহাদুরী দেখিয়েছে মূল পাঠ সংখ্যাকে ৫১ হিসাবে দেখিয়ে এবং সেই সঙ্গে আরও ২৬টি উপপীঠের সংখ্যা জুড়ে দিয়ে। এমনও পারে হতে যে, পীঠনির্ণয়ে যে ৫১টি পীঠ সেটা এসেছে শিবচরিতের একান্নপীঠ দেখে পরবর্তীকালে। মোদ্দা কথা, ব্যাপাবটা এমন জটীল যে, মূল উদ্ধার করা অসম্ভব। কে যে যথার্থ একান্নপীঠের করছে পুণ্য সঞ্চয়, করছে না কে, বলা দুষ্কর।

হাতের কাছে এখনই আমার আছে একটি ভ্রমণ কাহিনী—'পুণ্যতীর্থ ভারত'। লেখক একজন মিশনের স্ট্যাম্পমারা স্বামীজী। ঘুরে এসেছেন চট্টগ্রামের পাহাড় চন্দ্রনাথ। সীতাকুণ্ডে জলের উপর করেছেন আগুন

স্পর্শ, দেখেছেন শম্ভুনাথকেও। পাহাড়ের গায়ে অগণিত ছোট ছোট শিবলিঙ্গ দেখেছেন তিনি, যাকে বলে উনকোটি শিব। কিন্তু সতীর দক্ষিণবাহু বা দক্ষিণ হস্তসম্ভূত কোন শাক্তপীঠ পড়েনি তাঁর নজরে। শিবের ভক্তদের চাপে পড়ে শাক্তপীঠ হারিয়ে গেছে কিনা বলবে কে। কালীঘাটে গেলে শিবকে মনে পড়ে কয়জনের? ৺মা কালীর মাহাত্ম্যে আর সবই যায় ডুবে। তেমনই হয়তো শিবের প্রধান্যে শক্তি চাপা পড়ে গেছে চন্দ্রনাথে। কিংবা চন্দ্রনাথ পাহাড়েই যে ভবানী করছেন বিরাজ বলবে কে। শাস্ত্রকারেরা তো কোন নির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ করেন নি কোথাও। শুধু বলেছেন, চট্টলে। সারাদেশ-ব্যাপী পড়তে পারেনা একটা ছোট হস্তার্ধ। হয়তো পড়েছে অন্যত্র। সেই কারণে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাণ্ডারা তার খবর পায়নি আজ পর্যন্ত।

কিন্তু আবার এমন ব্যক্তিও আছেন, যিনি সখের ভ্রমণ নয়, পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন সারা ভারত। তিনি কিন্তু চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপরই দেখতে পেয়েছেন দেবীর হস্তার্ধসম্ভূত শাক্তপীঠ। তাঁর মতে বর্তমানে বাংলাদেশের সীতাকুণ্ডেই আছে এই পীঠস্থান। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর উঠে মন্দিরের কুণ্ডে স্নান করে করতে হয় দেবী-দর্শন। মন্দিরের কোণে যে জ্বলছে প্রাকৃতিক অগ্নিশিখা তিনিই হলেন দেবী ভবানী। ঐতিহাসিক হিসাবে যাঁরা সতীদেহোদ্ভূত শাক্তপীঠের স্থান নির্ণয়ে হয়েছেন অগ্রসর তারাও মনে করেন, চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর সীতাকুণ্ডেই আছে এই পীঠ। যদি পুণ্য সঞ্চয়ের হয় আপনার ইচ্ছা —ভিসা এবং পাশপোর্ট নিয়ে যেতে পারেন বাংলাদেশে। গোয়ালন্দ গিয়ে স্টীমারে পদ্মা ও মেঘনা অতিক্রম করে চলে যান চাঁদপুরে। চাঁদপুর থেকে ট্রেনে করে নামুন গিয়ে সীতাকুণ্ড স্টেশনে। তারপরে মাইল দুয়েক পথ পায় হেঁটে যান এগিয়ে। এক হাজার একশ পনের ফুট উঁচু পাহাড়। দীর্ঘ সিঁড়ি আছে পাহাড়ে ওঠার। ইচ্ছে হলে সিঁড়ি পারেন ব্যবহার করতে, কিংবা পাহাড়ী পথেও পারেন উঠতে। কলকাতা থেকে মাইলের হিসাবে দুশ পঞ্চাশ মাইল দূরে। ধর্মশালা

আছে থাকেন পারেন। আছে রেলওয়ের বিশ্রামখানাও। সেটাও করতে পারেন ব্যবহার। আপনারা যেমন ইচ্ছে।

পীঠনির্ণয় অনুযায়ী পঞ্চদশ শাক্তপীঠ হল ত্রিপুরাতে। বলা হয়েছেঃ

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরসুন্দরী।
ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্বাভিষ্ট প্রদায়কঃ॥

অর্থাৎ ত্রিপুরায় পড়েছে দক্ষিণপাদ। দেবীর নাম ত্রিপুরসুন্দরী। (কলকাতার গড়িয়ার কাছে বোড়াল গ্রামেও ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দির আছে। স্থানীয় লোকের দাবি, সতীর কোন এক অঙ্গ পড়েছিল এখানে) ভৈরবের নাম ত্রিপুরেশ। সকল অভিলাষ তিনি পূর্ণ করেন। এ দেবী হলেন প্রকৃতপক্ষে ষোড়শী দেবী।

বাঙ্গালী কবি এবিষয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এই ধরণের :

'দক্ষিণ চরণখানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নল নামে ভৈরব, ত্রিপুরা দেবী তায়॥'

অর্থাৎ ত্রিপুরেশ সরাসরি আমাদের অভিলাষ পারছেন না পূর্ণ করতে। ত্রিপুরার ভৈরব কে তাই নিয়ে দেখি গোলমাল দানা বেঁধে উঠছে প্রথমেই। এবং দেবীকে নিয়েও। ভৈরব কি ত্রিপুরেশ, না নল? এবং দেবী কি ত্রিপুরসুন্দরী না ত্রিপুরা?

নামের এই গোলমালটিকে কিন্তু বাঙ্গালী কবি, অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের উর্বরমস্তিষ্কপ্রসূত বলে মনে হচ্ছে না এবার। পীঠনির্ণয়ের যে আরো দুটি পাণ্ডুলিপি, তাতেই পাওয়া গেছে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা। যেমন, একটিতে আছে 'দেবতা ত্রিপুরা মতা' এবং অপরটিতে আছে— 'দেবতা ত্রিপুরা নলঃ'। কে ঠিক, কে ভুল, বলুন এবার? পণ্ডিতদের ধারণা মূলগ্রন্থে ছিল এই ধরনের বর্ণনা : 'ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা নলঃ'। অর্থাৎ মূল রচনাটি এক লাইনেই সেরে দিয়েছিল দেবী এবং ভৈরবের বর্ণনা। মূল গ্রন্থেই যদি থাকে ত্রুটি, অপরের আর দোষ কি। কিন্তু ত্রুটি থাক যা-ই, একটা জিনিষ বোঝা যাচ্ছে যে, ত্রিপুরা বলে কোন একটা জায়গাতেই পড়েছিল সতীর দক্ষিণপাদ।

'ত্রিপুরা' শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনার

কাছে হয়ে যাচ্ছে সহজ? এইতো, আমাদের প্রতিবেশী, বাঙ্গালী অধ্যুষিত ত্রিপুরা। ত্রিপুরাকে না চেনে কে? খবরটাও অনেকেরই জানা। পুরানো রাঙামাটি, অর্থাৎ উদয়পুর, এখন যার নাম রাধা-কিশোরপুর, পার্বত্য ত্রিপুরাতে, সেখানে আছে বটে একটা মন্দির, ছোট পাহাড়ের উপর, রাজা ধর্মমাণিক্য তৈরি করেছিলেন ১৪২৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে। বৌদ্ধ প্যাগোডার মতন দেখতে না সেই মন্দিরটি? কতক্ষণ আর? কলকাতা থেকে প্লেনে চাপলেই,...নয়তো আসামের লামডিং বদরপুর হয়ে ধর্মনগর, সেখান থেকে আধঘণ্টা বাস পথে। আগরতলা থেকে মোটরে পৌঁছুতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টা; প্রতিবছর দীপাবলীর সময় বসে বড় মেলা। কিন্তু না, দাঁড়ান। চট করে যেন টিকিট কাটবেন না এক্ষুনি। ত্রিপুরা বলতেই যে আমাদের প্রতিবেশী ত্রিপুরারাজ্য, এমন করবেন না যেন মনে। আরও আছে ত্রিপুরা। প্রাচীন সাহিত্যে পাবেন ত্রিপুরা সহর বা ত্রিপুরী সহরের নাম। জায়গাটা মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের কাছে, আধুনিক কালের তেওয়ার। পুরানো দিনের এই বিখ্যাত জায়গাটাতেই যে দেবীস্থান নির্ণয় করে তাঁর অঙ্গপাত ঘটাননি শাস্ত্রকার তা পারেন না বলতে। ভাবসাব যা দেখা যাচ্ছে, তাতে অবাক হবার নেই কিছুই যে, স্থান-গুলো সব পাল্টে যাবে আগামী কোন ভাষ্যকারের বর্ণনায়। একটা পীঠ তৈরী হলেই যদি পেটের হয় সংস্থান হয়, তাহলে অন্য কোথাও যে পীঠ গড়ে উঠবে না তা যায় না বলা। তেওয়ারের লোকেরা যদি বলে এখানেই পড়েছিল দেবীর দক্ষিণ পাদ, বলবার কিছু আছে আপনার? সুতরাং বামপাদ কোথায় পড়েছিল সেটাই খোঁজ করা যাক আগে। দুটো পা স্বাভাবিক কারণেই পড়তে পারে কাছাকাছি কোথাও। সেই দেখেই গ্রহণ করুন সিদ্ধান্ত।

পীঠনির্ণয়ে ষোড়শ পীঠের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই ভাবে:

'ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবেশ্বরঃ।'

কোথাও বা আবার ভৈরবেশ্বরঃ-এর পরিবর্তে আছে 'ভৈরবাম্বর।' অর্থাৎ ত্রিস্রোতায় পড়েছে দেবীর বামপদ। দেবীর নাম ভ্রামরী,

ভৈরবের নাম ঈশ্বর বা অম্বর।

বাঙ্গালী কবি, অর্থাৎ ভারতচন্দ্র ব্যাপারটা নির্ণয় করেছেন এই ভাবে :

'তিরোতায় পড়ে বামপদ মনোহর।
অমরী দেবতা তাহে ভৈরব অম্বর ॥'

অর্থাৎ ভারতচন্দ্র স্থানের নাম বলেছেন তিরোতা, দেবীর নাম অমরী। ভৈরবের নাম অম্বর। আবার শিবচরিতের বক্তব্য যদি পড়েন, তাহ্'লে পাবেন আরেক রকমের বর্ণনা। যেমন, শিবচরিতের মতে ত্রিস্রোতায় পড়েছে দেবীর দক্ষিণ জানু। দেবীর নাম চণ্ডিকা। ভৈরবের নাম সদানন্দ। শিবচরিতের উপপীঠ বর্ণনাতেও আছে আরেক ত্রিস্রোতা, যেখানে পড়েছে সতীর পাদাংশ। দেবীর নাম পার্বতী, ভৈরবের নাম ঈশ্বর। এবার আপনি নিজেই চিন্তা করুন, কার নামে মন্ত্র প'ড়ে কাকে কাকে করবেন সন্তুষ্ট। তবে একটি ব্যাপারে ত্রিস্রোতার ক্ষেত্রে বাঁচোয়া যে, শিবচরিতেও নাম আছে ত্রিস্রোতা। ভারতচন্দ্র নাম পাল্টে বলেছেন তিরোতা। তবে, শব্দটার ক্ষেত্রে ত্রিস্রোতার রয়েছে আভাষ। কিন্তু আপনি যদি ব্যাপারটাকে আবার গভীরভাবে বিচার করেন, তাহলেই সব যাবে গোলমাল হয়ে। তিরোতা মানে হল সংস্কৃত অর্থে 'স্ত্রী', আসামীদের ভাষায়। কিন্তু ভারতচন্দ্র বোধ হয় বলেন নি সে তিরোতার কথা। তিনি তিরোতা বলতে বোঝাতে চেয়েছেন ত্রিহুতকে। এমন ধরনের একটা ইঙ্গিত আছে শিবচরিতেই। ত্রিহুতের সংস্কৃত নাম তীরভুক্তি, বর্তমান নাম তিরহুত। আছে উত্তর বিহারে। কিন্তু তিস্রোতাকে যদি ধরেন বর্তমান অর্থে, তাহলে ধরতে হয় উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীকে, ব্রহ্মপুত্র অথবা যমুনার একটি শাখা নদী। জলপাইগুড়ি জেলার শালবাড়িতে, তিস্তানদীর ধারে আছে একটি পীঠ। লোকে বলে, পড়েছে দেবীর বামপাদ। দেবীর নাম ভ্রামরী, ভৈরবের নাম অশ্বর। ভুল উচ্চারণ নিশ্চয়ই। অশ্বর নয়, হবে ঈশ্বর। তবে দেবীর নাম হতে পারে অমরীও, কিংবা ধরুন ভ্রামরী। অমরীতে আছে হিন্দু প্রভাব, ভ্রামরীতে বৌদ্ধ তন্ত্রের। তবে বৌদ্ধ তন্ত্র আর শাক্ত তন্ত্রের

মধ্যে যে আছে একটা সহমর্মীতা, বিশেষ করে বাংলাদেশে, তার প্রমাণ উজানিতে, যেখানে শাক্ত দেবীর সঙ্গে আছেন বজ্রাসনে বুদ্ধমূর্তি। এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে যে বৌদ্ধতন্ত্রর এখনও আছে প্রভাব সেকথা জানেন বঙ্গসংস্কৃতি যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরাই। সুতরাং ধরে নিন শালবাড়িতেই পড়েছে দেবীর বামপাদ, এবং এখান থেকে ত্রিপুরা যেহেতু খুব একটা নয় দূরে, সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সতীর দক্ষিণ পাদ পড়েছিল সেখানেই। ত্রিপুরায় যেতে চাইলে প্লেনে চাপুন, সেটাই ভাল। আর শালবাড়ি যেতে হলে চলুন নর্থবেঙ্গলের গাড়িতে। নামুন শিলিগুড়ি। সেখান থেকে বাস আছে, বললে পরেই নিয়ে যাবে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে, শালবাড়িতে, শাক্তীর্থে।

পীঠনির্ণয় বর্ণিত সপ্তদশ পীঠই হল প্রকৃত পক্ষে ভয়ঙ্কর, জাগ্রত এবং গুরুত্বপূর্ণ শাক্তপীঠ। এই পীঠের নাম কামরূপ কামাখ্যা। কামরূপ নাম না থাকলেও কামাখ্যাপীঠ একদিন ছিল ভারতের নানা প্রান্তেই। পদ্মপুরাণের পঞ্চমখণ্ডে আছে, উত্তরপ্রদেশে রায় বেরিলির উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পার্বত্য অঞ্চলে ছিল প্রাচীন যুগের কামাখ্যা। বর্তমানে এর নাম চণ্ডিকাস্থান। মহাভারতের বন পর্বে আছে, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে ছিল ৮০ বর্গ মাইল দীর্ঘ এবং চার মাইল প্রশস্ত দেবিকা সরোবর। সরোবরের তীরে ছিল রুদ্রদেবের পবিত্র স্থান কামাখ্যা তীর্থ। এই তীর্থে বাঁনর জাতীয় ব্রাহ্মণেরা করত দৈবকার্য। মাদ্রাজের কাঞ্চীপুরেও ছিল কামাখ্যাদেবীর মন্দির। সেখানে কামকোটিতে হয় দেবীর যোনি প্রতীকের পূজা। তবে বর্তমানে কামাখ্যা বলতে বোঝায় আসামের কামরূপ কামাখ্যাকেই। কামরূপ কামাখ্যা যে স্থান হিসেবে পুরনো এ বিষয়ে নেই সন্দেহ। স্থানের নির্দিষ্টতা নিয়েও তেমন নেই তর্ক। মহাভারতে এ-অঞ্চলকে বলা হয়েছে প্রাগজ্যোতিষ। কিন্তু পুরাণ আর তন্ত্রে বলা হয়েছে কামরূপ। মহাভারতের কালে এর বিস্তৃতি ছিল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে করতোয়া। কালিকাপুরাণে আছে, কামাখ্যা মন্দির হল কামরূপের কেন্দ্রস্থল। বিষ্ণু পুরাণে লেখা আছে, মন্দির থেকে চতুর্দিকে একশ যোজন পর্যন্ত (অর্থাৎ ৪৫০ মাইল

পর্যন্ত) ছিল এর বিস্তৃতি। অতটা যদি বিশ্বাস নাও করেন, তবে অন্ততঃ ধরে নিতে পারেন যে, প্রাচীন কামরূপের মধ্যে ছিল পূর্ববঙ্গের সবটা, সেইসঙ্গে আসাম এবং ভূটান। যোগিনী তন্ত্রে আছে—পশ্চিমে করতোয়া নদী থেকে পূর্বদিকে সিন্ধু, এবং উত্তরে কুঞ্জগিরি থেকে দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মপুত্র ও লাখ্যা নদীর সঙ্গম, এই নিয়ে ছিল কামরূপ রাজ্য। অর্থাৎ, এর মধ্যে ছিল ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা, ভূটান, রঙপুর ও কুচবিহার এবং উত্তরপূর্ব ময়মনসিংহ ও গারো পাহাড়। এবং দেশটা ছিল চার ভাগে বিভক্ত। যেমন, কামপীঠ (করতোয়া থেকে সঙ্কোশ), রত্নপীঠ (সঙ্কোশ থেকে রূপাই), সুবর্ণপীঠ (রূপাই থেকে ভরলি), এবং সৌমার পীঠ (ভরলি থেকে দিক্‌রাঙ)। অবশ্য আরও ভিন্ন ধরনের বিভাগও আছে অন্য গ্রন্থে। কিন্তু সেই নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় না গিয়ে আমাদের যেটা মূল বিষয় সেখানেই আসছি আবার।

কামরূপ নামের উৎপত্তি সতী এবং দক্ষযজ্ঞনাশ গল্পটিকে কেন্দ্র করেই। যেমন, সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়ে করলেন দেহত্যাগ। শোক-বিহ্বল শিব ঘুরতে লাগলেন প্রিয়তমা পত্নীকে কাঁধে নিয়ে। শিবকে রক্ষা করতে এই ভ্রান্তি থেকে বিষ্ণু তাঁকে করলেন অনুসরণ। এবং তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে ধীরে ধীরে সতীর দেহ কেটে করলেন টুক্‌রো টুক্‌রো। একান্নটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাঁর যোনি-দেশ পড়ল কামগিরিতে অর্থাৎ বর্তমান গৌহাটির কাছে নীলাচল পাহাড়ের উপরে। কিন্তু শিবের উদ্‌ভ্রান্ততা কাটেনা। তিনি তখন বসে গেলেন গভীর ধ্যানে। শিব বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রকৃতিকে তিনি সম্পূর্ণ পারেননি নিয়ন্ত্রণ করতে। যদি পারতেন, তাহলে সতী তাঁর কথার বিরুদ্ধে যেতে পারতেন না দক্ষযজ্ঞে। তাই প্রকৃতিকে আত্মস্থ করতে তিনি নিমগ্ন হলেন সমাধিতে। প্রকৃতি তো আর কেউ নয় স্বয়ং পুরুষেই ক্রিয়াগুণ। পুরুষ যদি প্রকাশ না করেন ক্রিয়াগুণ, যদি তিনি থাকেন নির্গুণ হয়ে, তাহলে বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্ব পাবে লোপ। সুতরাং দেবতারা পড়লেন চিন্তায়। প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য তাই শিবের ধ্যান ভাঙতে এলেন এগিয়ে। ব্রহ্মাণ্ডের সক্রিয়তাকে চলবে না নিষ্ক্রিয় হতে

দেওয়া। তাই তাঁরা চাইলেন আত্ম সামাধিতে ডুবে থাকার আগে শিবের হৃদয়ে ইচ্ছাকে করতে জাগরিত, কামরূপ ইচ্ছা—যাতে তিনি নিজের প্রকৃতির সঙ্গেই থাকেন লীলামত্ত। সেই জন্য শিবের ধ্যানভঙ্গ করে তাঁর অন্তরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার জন্য পাঠালেন কামদেবকে। কামদেব তাঁর ফুলধনু থেকে শর নিক্ষেপ করলেন শিবের হৃদয়ে। শিবের ঘটল চিত্তচাঞ্চল্য। ধ্যাননেত্র উন্মিলিত করলেন তিনি। তাঁর চাঞ্চল্যের কারণ সামনেই দেখতে পেলেন কামকে। তৃতীয় নয়ন থেকে সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এসে দগ্ধ করে ফেলল তাঁকে। দেবতারা শিবকে সন্তুষ্ট করার পরে আবার কামদেব ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর কন্দর্প্য-কান্তি। আর যেখানে কামদেব ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর নিজের রূপ তারই নাম কামরূপ।

কামরূপ। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক। কামরূপের সব চাইতে যে প্রাচীন রাজার নাম জানা যায়, তার নাম মহিরঙ্গ দানব। তারপর একই বংশের হটক অসুর, সম্বর অসুর এবং রত্ন অসুর। কিন্তু বিস্তারিত কিছু নেই জানার উপায়। তবে নামের শেষে অসুর বা দানব শব্দ দেখে বোঝা যায়, আর যাই হোক আর্য নয়, এরা ছিলেন অনার্য।

এর পর বিশেষ ভাবে যে নাম নজরে পড়ে সেটা ঘটক। এইটুকু জানা যায়, কিরাতদের প্রধান ছিলেন তিনি। আর এ কিরাতরা যে মদ মাংসে আসক্ত, এ-খবরতো আপনিও জানেন। কারা এই কিরাত জানিনা এখনও, তবে মনু এদের বলেছেন ম্লেচ্ছ। এই কিরাতদেরই বিশেষ দেবতা হলেন শিব। এবং শিব যে হিমালয়ে অর্জুনের সঙ্গে কিরাতের বেশে হয়েছিলেন দ্বন্দ্বে লিপ্ত একথা তো মহাভারত যাঁরা পড়েছেন জানেন তাঁরাই। হিমালয় দুহিতা উমা আর গঙ্গাকে সেজন্য আজও ডাকা হয় 'কিরাতী' বলে।

এই ঘটককে পরাজিত করে হত্যা করেন নরক অসুর। পুরাণ আর তন্ত্রে আছে এই নরক অসুরকে নিয়ে নানা গল্প। যেমন, এই সব শাস্ত্রমতে নরক ছিলেন বিষ্ণুর পুত্র। বিষ্ণু যখন বরাহ অবতার,

তখন তাঁর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের জন্ম। বিদেহরাজ জনক যেমন সীতাকে পেয়েছিলেন লাঙলের ফলায়, তেমনি পেয়েছিলেন নরককেও। এই নরকই করেন প্রাগজ্যোতিষপুরকে তাঁর রাজধানী। অসংখ্য ব্রাহ্মণ এনে বসান তিনি কামাখ্যাতে। গৌহাটির কাছে এখনও দেখবেন একটি পাহাড়, লোকে বলে নরক অসুরের পাহাড়। পশ্চিমে করতোয়া, পূর্বে দিক্রাঙ, বিরাট এক রাজ্য ছিল নরকের। বিদর্ভরাজকন্যা মায়া, তাকে বিবাহ করলেন নরক। বিষ্ণুর আশীর্বাদে তাঁর হল অবিশ্বাস্য উন্নতি। বিষ্ণুর কাছেই নরক শিখলেন কামাখ্যা দেবীর আরাধনা।

কিন্তু মানুষের সৌভাগ্য স্থায়ী হয়না মানুষের নিজেরই ভুলে। দুঃখে মানুষ নিজেকে পারে যদিও বা ঠিক রাখতে, সৌভাগ্য এলে পারেনা। অহংকার এসে মনকে দেয় বিগড়ে। নরকের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধির জন্ম দিলেন শোনিতপুরের রাজা বান অসুর। নরক ধীরে ধীরে ধর্মপথ ছেড়ে নামলেন পাপের পথে। আত্ম-অহংকারে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে মনে করলেন তুচ্ছ। অসম্ভবকে সম্ভব করতে—দেবী কামাখ্যাকে বললেন তাঁর পত্নী হতে।

দেবী জানালেন, রাজী আছেন তিনি নরকের প্রস্তাবে, তবে এক শর্তে। একরাতের মধ্যেই নীল পাহাড়ের উপর করে দিতে হবে একটি মন্দির, পুষ্করণী এবং মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি। নরক তখন অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী। এ তো সামান্য কাজ, ইচ্ছে করলে পারেন চাঁদ ধরতে। সুতরাং সেই শর্তেই রাজি হলেন তিনি। আরম্ভ হল কাজ। অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করে আনলেন নরকাসুর। কাজ হয় প্রায় সমাপ্ত। দেবী তখন করলেন তাঁর মায়া বিস্তার। যেন রাত শেষ হয়েছে এমন মনে হল সকলেরই। একটা মোরগ ডেকে উঠল রাত শেষের জানান দিয়ে। দেবী বললেন, শর্ত হয়নি পালিত, সুতরাং স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন না তিনি নরককে। ক্রুদ্ধ নরক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মোরগের উপর। সেইখানেই হত্যা করলেন মোরগটাকে। যেখানে তিনি মেরেছিলেন মোরগটাকে আজো

সে স্থানকে লোকে বলে 'কুকুরাকাটা'।

মানুষের অহংকারই আনে মানুষের পতন ডেকে। দেবী রুষ্ট হলেন নরকের প্রতি। নরকও ক্ষুব্ধ দেবীর উপর। কামাখ্যার আর পূজা হতে দেবেন না তিনি কামরূপে। একবার বশিষ্ঠ মুনি এলেন কামাখ্যাকে পূজো দিতে। নরক দিলেন না পূজো করতে। ক্রুদ্ধ মুনি অভিশাপ দিলেন নরক এবং কামাখ্যা দুজনকেই। কামাখ্যাকে বললেন, এখানে পূজো করলে মনস্কামনা পূর্ণ হবেনা কা'রো। অবশ্য শিবের হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত অভিশাপের কমল সময়কাল। তিনশ বছর পরে কামাখ্যা-পূজায় আবার লোকের মনস্কামনা হবে পূর্ণ, এই ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি।

এর পরেই ভাগ্য বিরূপ হল নরকের। নরকের উপর ক্ষুব্ধ-হলেন দেবী কামাখ্যা এবং বিষ্ণু, দুজনেই। এবং আপনারা জানেন যে, বিষ্ণু শেষপর্যন্ত সুদর্শন চক্রে হত্যা করেছিলেন নরককে। নরকের আমলের সেই কামাখ্যা মন্দির আর নেই। মহাকালের নির্মম রথচক্র সময়ের উপর দিয়ে চলে গেছে ইতিমধ্যে দীর্ঘদিন। ইতিহাসও হেনেছে আঘাত। মুসলমানরাও মন্দির নষ্ট করেছে নির্মমভাবে। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোচরাজা নরনারায়ণ নতুন করে তৈরি করে দেন মন্দির। মন্দির প্রতিষ্ঠার পেছনে আছে তন্ত্রের অবদান প্রচুর। কালিকা-পুরাণে আছে, নিষ্কলঙ্ক মানুষের মাংস দেবীর বড় পছন্দ। নরবলির জন্য সেই কারণে আছে বিশদ শাস্ত্রবিবরণ। নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে এই নরবলি দিতে বিস্মৃত হননি কোচ-রাজা। তামার টাটে দেবীকে গুণেগুণে উপহার দেওয়া হয়েছে সদ্যবিচ্ছিন্ন নরমুণ্ড। একশ চল্লিশটি নরমুণ্ডের কম নয় কিছুতেই। তন্ত্রমতে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত দেবীও তাই জাগ্রত। সেইজন্য দেশ বিদেশ থেকে দেবীর মন্দিরে ভিড়েরও নেই অন্ত।

দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাতে কালিকাপুরাণে লেখা আছে—:

কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকুটে রহোগতা॥

কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে ॥

অর্থাৎ ভগবান বলছেন—'এই মহাদেবী অভিলাস পূরণের জন্য আমার সঙ্গে নীলকুটে আসায় নাম লাভ করেছেন কামাখ্যা। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামদায়িনী আব কামনাশিনীও। সেজন্যও লোকে বলে কামাখ্যা।

নীলকুট পর্বতের উপর যেখানে পড়েছিল দেবীর যোনিদেশ তার নাম কুব্জিকা। যোনিদেশ পড়েই হয়েছে প্রস্তরীভূত। এই প্রস্তরই কামাখ্যা, দেবী। যদি এই শিলা মানুষ করে স্পর্শ তবে পায় দেবত্ব, আর যদি দেবতা করে লাভ তবে পায় ব্রহ্মত্ব। লোকপ্রবাদে স্থানের মাহাত্ম্য অদ্ভুত। কেউ যদি এই যোনি পীঠে রাখেন লোহা, তবে তা নাকি ভস্ম হয়ে যায় মুহূর্তেই, এটা স্থানীয় লোকের বিশ্বাস।

যোনিমণ্ডলের পরিমাণ হল এই ধরনের : ২১ আঙ্গুল দৈর্ঘ্য, এক বিতস্তি প্রস্থ অর্থাৎ ½ হাত। সিঁদুর-কুঙ্কুমে চর্চিত প্রতিমুহূর্ত। দেবী মহামায়া নিত্যদিন এখানে বিরাজ করেন পঞ্চকামিনী রূপে, যেমন, কামাখ্যা, ত্রিপুরী, কামেশ্বরী, সারদা এবং মহোৎসাহা। দেবীর চতুর্দিকে আছে অষ্টযোগিনী—গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কটীশ্বরী, ধনস্থা, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী এবং প্রকটা। দেবীর বস্তুত কোন মূর্তি নেই। দেবীর অধিষ্ঠান যোনিপীঠের গহ্বরে। লাল শালুতে ঢাকা। শোনা কথা, দেবি নাকি প্রতিমাসে রজস্বলা হন এখানে।

তন্ত্রচূড়ামণিতে আছে—'এখানে শুধু কামাখ্যা নন আরও আছেন ৯ জন দেবী—শ্রীভৈরব, নক্ষত্রদেবতা, প্রচণ্ডচণ্ডিকা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাম্বিকা, বগলা, কমলা, ভূবনেশী ও সধুমিনি। সর্বসাকুল্যে দশজন ভৈরবও আছেন এখানে।

পীঠনির্ণয়েও আছে এই ধরনের বর্ণনা :

"যত্রচ ভৈরবী দেবী যত্র নক্ষত্র দেবতা ॥
প্রচণ্ড চণ্ডিকা তত্র, মাতঙ্গী ত্রিপুরাম্বিকা।
বগলা, কমলা তত্র ভুবনেশী সধুমিনী (স্বধামিনী ?) ॥

এতানি নবপীঠানি শংসন্তি নবভৈরবাঃ।
এবং তু দেবতা সর্বা এবং তু দশ ভৈরবাঃ ॥”

ভৈরব ছাড়া শক্তি নেই। দশজন ভৈরব যখন আছেন তখনই হয় মনে, কামাখ্যাকে কেন্দ্র করেই আরও নয়টি পীঠ ছিল এখানে। যে কারণেই হোক তা সতীদেহোদ্ভূত শাক্তপীঠের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে একদিন। এবং এই পীঠগুলিই পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে গড়ে উঠেছে একান্নপীঠের সংখ্যা রাখতে যথাযথ। কারণ, পীঠনির্ণয়ের মূল পাণ্ডুলিপিতেই নলহাটী, কালীঘাট, বক্রেশ্বর, যশোর, অট্টহাস, নন্দিপুর, লঙ্কা আর বিরাটেই নেই নাম। এসেছে পরে।

রহস্য হোক যা-ই, তাকে ভেদ করা প্রায় অসম্ভব। একান্নপীঠ নাম দিয়েই ভিন্ন ভিন্ন তালিকা আছে বিভিন্ন গ্রন্থে—যাতে একের সঙ্গে অপরের মিল নেই অনেক ক্ষেত্রেই। কে জানবে কোনটা? তন্ত্রচূড়ামণি বর্ণিত ৫১-পীঠের সঙ্গে মিল নেই পীঠনির্ণয়ের। আবার জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস যে একান্নপীঠের দিয়েছেন তালিকা তাঁর অভিধানে, তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই ফারাক পীঠনির্ণয়ের এবং তন্ত্রচূড়ামণির। তাহলে? বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। অর্থাৎ যার হাতে পড়বে যে তালিকা, সেইটেকেই মেনে নিতে হবে তর্কবিতর্ক না করে। ইতিহাসের সত্যের চাইতে বড় অন্তরের সত্য, বিশেষ করে যাঁরা ভিন্ন জগতের খোঁজ করেন তাঁদের কাছে। সুতরাং তর্ক থাক। যা পেয়েছি তাই নিয়ে যাক এগিয়ে যাওয়া।

কামরূপ কামগিরি, হাজার পুণ্যার্থী যাচ্ছেন আসামের গৌহাটীর কাছে কামাখ্যাতে। ইতিহাসের ভৌগোলিক অবস্থান আড়াল সৃষ্টি করে থাকেনি এখানে। সত্য কিংবা মিথ্যা, সবকিছুই যাচাই করে নিতে পারেন নিজেই আপনি যদি একবার সামান্য কষ্ট করে যান কামাখ্যাতে। যাওয়াটাও নয় খুব দুষ্কর। কামাখ্যা রেল-স্টেশনে নেমে ৩২০টি সিঁড়ি ভেঙ্গে বা গৌহাটী থেকে সরাসরি মোটরে চেপে পাহাড়ের উপরে পারেন উঠে যেতে। গেলেই দেখতে পাবেন কামাখ্যাকে, ভৈরব উমানন্দকে। অবশ্য উমানন্দকে কেউ বলেছেন উমানন্দ, কেউ শিবানন্দ,

কেউ রামানন্দ, কেউ বা আবার রাবণানন্দ। যেমন, অন্নদামঙ্গলেই দেখুন বর্ণনা আছে এই ধরনের :

"মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায়।
রামানন্দ ভৈরব কামাখ্যা দেবী তায়॥"

সে-যাই হোক, সেজন্য নেই অস্বস্তি। পাণ্ডার মুখের কথাই হোল মোক্ষম কথা তীর্থক্ষেত্রে।

পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা মতে অষ্টাদশ পীঠ হল যুগাদ্যায়। এই ধরনের বর্ণনা আছে পীঠনির্ণয়ে :

ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডক।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদোমম॥'

অর্থাৎ যুগাদ্যাতে পড়েছে মহামায়ার দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ। ভৈরব সেখানে ক্ষীরখণ্ডক। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের কবি চান না এ ধরনের বর্ণনা মানতে। তাঁর মতে শ্লোকটা হবে এই ধরনের :

"ক্ষীরগ্রামে মহাদেব—ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডকঃ।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদোমম॥"

সুতরাং তিনি যখন বঙ্গানুবাদে দিচ্ছেন এর বর্ণনা, সেটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম :—

"ক্ষীরগ্রামে ডানি পা'র অঙ্গুষ্ঠবৈভব।
যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব॥"

বর্ণনা-পার্থক্য যা-ই থাকুক, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে এই যে, যুগাদ্যা বা ক্ষীরগ্রামে দেবীর ডান পায়ের পড়েছে অঙ্গুষ্ঠ। দেবীর নাম যুগাদ্যা, ভৈরবের নাম ক্ষীরখণ্ডক। স্থানীয় লোকেরা বলেন এই ধরনের কথা : ক্ষীরদীঘি পুকুরের দক্ষিণ দিকে, মধ্যস্থলে, সতীর পড়েছিল দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের এক খণ্ড। দেবী এখনও যোগাদ্যা বটে তবে ভৈরবকে লোকে বলে ক্ষীরেশ্বর। ক্ষীরদীঘি থেকে কিছুদূরে ঈশান কোণে আছে ক্ষীরেশ্বরের মন্দির। লোকে বলে, আগে ছিলনা কোন মূর্তি। ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্তকে দেবী দেখা দিয়েছিলেন উগ্রচণ্ডী মূর্তিতে। মূর্তি কষ্টি পাথরের। সিংহবাহিনী দশভূজা।

ভুগোলে যদি যুগাদ্যা খুঁজে ফেরেন তাহলে হয়তো চলে যাবে একটা যুগই, কিন্তু যুগাদ্যাকে পাবেন না কোথাও। সুতরাং যুগাদ্যা নাম দেখেই যেন কোন ভৌগোলিক অভিধান বসবেন না খুলে নিয়ে। আপ্তবাক্য জিনিষটাকে তেমন সরল সাদাসিধে মনে হয় না আমার কাছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বড় প্রবল অনীহা এই শব্দটার দিকে। কিন্তু যদি ধর্মের দিক থেকে বিচার করেন, তাহলে আপ্তবাক্য যে আপনার একটা বড় সম্বল, সে বিষয়ে নেই সন্দেহ। সুতরাং যুগাদ্যা নয়, যাঁরা একে বলেছেন ক্ষীরগ্রাম, তাদের কথাই শিরোধার্য করে আসুন করি যাত্রা শুরু।

জায়গাটা খুব দূরে নয়. হাতের কাছেই, ইচ্ছে করলেই যায় ঘুরে আসা। এ জন্য বিছানাপত্র বেঁধেছেদে সুদূরের গন্ধ শোঁকার দরকার নেই স্টেশনে বসে। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে, ক্ষীরগ্রাম। কেউ বা এখানকার দেবীকে বলেন ভূতধাত্রী। দেবীর বর্তমান বন্দনা এইরকম :

সিংহ পৃষ্ঠে শোভা পায় দক্ষিণ চরণ,
বামাঙ্গুষ্ঠে করিয়াছে মহিষমর্দন।
কণক কীরিট শোভে মস্তক উপরে।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, গলে গজমতী,
দিব্য বস্ত্র পরিহিতা দেবী হৈমবতী।

কৈচর স্টেশনে নেমে হাঁটতে আরম্ভ করুন গ্রামের দিকে। মাইল তিনেকের বেশী হাঁটতে হবে না কোন মতেই। ক্ষীরদীঘির জলে বিগ্রহ ডোবানো থাকে সারা বছর। বৈশাখের সংক্রান্তিতে তুলে এনে পূজা হয়। সেই পুরানো বিগ্রহ নেই আর। দেবী বন্দনায় আছে যে রূপের বর্ণনা, তাই শুনে নতুন বিগ্রহ তৈরি করেছেন দাঁইহাটের এক শিল্পী। কবি কৃত্তিবাসের 'যোগাদ্যা বন্দনা' নামক গ্রন্থে দেবী সম্পর্কে গল্প আছে এইরকম : হনুমান অহিরাবণ ও মহীরাবণকে বধ করলে তাদের উপাস্য দেবী ভদ্রকালী তাঁকে স্থানান্তরিত করার জন্য বলেন হনুমানকে। হনুমান তখন তাঁকে পীঠে করে দিয়ে আসেন

বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে। ভদ্রকালীর পূজায় আগে নরবলি দেওয়া হত। পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে তিনদিন। কাছেই আছে ইস্কুল। ইচ্ছে করলে ধর্মশালার মত তিন রাত্রি কাটিয়ে আসতে পারেন সেখানে।

পীঠনির্ণয়ের বর্ণনাক্রমে উনবিংশতি শাক্তপীঠ হল কালীপীঠ। বলা হয়েছে :

'নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলী-চ-মে।
সর্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা ॥'

অর্থাৎ কালীপাঠে ভৈরব হলেন নকুলীশ। সতীর দক্ষিণ পাদাঙ্গুলী পড়েছে সেখানে। দেবী কালিকা। নকুলীশ নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত, কালিকা নামের সঙ্গেও। কিন্তু কালীপীঠের সঙ্গে আমাদের নেই পরিচয়। নেই, তবে নামটা শুনে সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, কালীর যেখানে পীঠ, তারই নাম কালীপীঠ। বাংলাদেশে সে অর্থে নেই কালীপীঠের অভাব। সুতরাং কোন্ কালীপীঠ এটা?

আমাদের কাছে যে নাম সব চাইতে পরিচিত—সে হল কালীঘাটের কালী। শনিমঙ্গলে কোন না কোন একদিন কালীঘাটে যাননি ৺মায়ের মন্দিরে, হেন কলকাতাবাসী বাঙ্গালী অন্ততঃ কলকাতায় খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, পাঠনির্ণয়ে আমরা যাকে বলি কালীঘাট সেই কালীঘাট বোঝাতে নেই কালীঘাটের নাম। কিন্তু আর একটি পীঠকে যে 'কালীঘাট' নামে স্তোত্রে দেওয়া হয়েছে স্থান সে-পীঠ নেই মোটেও এই কলকাতাতে। তাহলে?

তাহলে অবশ্যই চিন্তার কোন কারণ নেই। ভৈরব যেখানে নকুলীশ তাঁর সঙ্গে দেবী হিসেবে কালিকা, সেই জায়গায়ই কালীপীঠ। সেই নকুলীশ আছেন আমাদের কলকাতার কালীঘাটে, সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, কালীপীঠ হল কলকাতার কালীঘাট। আর অন্যত্র যেখানে কালীঘাটের নাম আছে অথচ দেবতা হিসেবে নেই কালিকার নাম, এবং ভৈরব হিসেবে নকুলীশের, নিশ্চিন্তে বলতে পারি, আজকের অর্থে সে কালীঘাট নয় কালীঘাট।

অন্নদামঙ্গলে আছে কালীঘাটের বর্ণনা এইভাবে,—

"কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলি ডানি পা'র।
নকুলেশ ভৈরব, কালিকা দেবী তার॥"

বর্তমানে কালীঘাটের ভয়ানক কালীমূর্তি এবং মন্দিরে দেবীকে স্পর্শ করার জন্য অসভ্যরকমের ভিড়ের কথা জানেন সকলেই। ফেউয়ের মত পাণ্ডাদের কথাও নিশ্চয়ই নয় ভুলবার। তবে একদিন কিন্তু শাক্তপীঠ হিসেবে কালীঘাটের ছিল না এই দোর্দণ্ড প্রতাপ। জব চার্ণক কলকাতা নগরী পত্তন করবার আগে মনে হয়না কালীঘাটে হত পুণ্যার্থীদের এত ভিড়। ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম যখন লেখেন 'চণ্ডীমঙ্গল' তখনও পীঠহিসেবে কালীঘাটের দেননি তিনি বর্ণনা। অবশ্য সেজন্য যে কালীঘাটে ছিলেন না কালিকা দেবী বলতে পারেন না এমন কথা। পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকে বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' আছে কালীঘাটের কালিকার নাম। অবশ্য ষোড়শশতকের আর এক কবি বংশীদাস কালীঘাটকে বলেননি পীঠস্থান। পীঠস্থানের গুরুত্ব নিয়ে কালীঘাট দেখা দেয় কলকাতা শহরের পত্তন হবার পর থেকে।

কালীঘাটের পুরনো নাম কি, জানা নেই। আপনারা কেউ জানেন কি? তবে পণ্ডিত ব্যক্তিরা নাকি 'বৃহন্নীলতন্ত্র' আর 'শিচার্চ্চনতন্ত্র' গ্রন্থে পেয়েছেন এ-জায়গার নাম কালীঘট্ট। ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডে আছে :— 'গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধুনীতটে।'
আগে গঙ্গার উপরেই বিরাজ করতেন কালিকা দেবী। সাগরযাত্রী বণিকেরা এ-পথ দিয়ে যাবার সময় ঘাটে নেমে পূজা দিয়ে যেতেন ৺মায়ের। সেই থেকে সুরধুনীতটের নাম হয় কালীর ঘাট বা কালীঘাট। নিগমকল্পের পীঠমালায় এই কালীঘাটের সীমা নির্দিষ্ট করা আছে এইভাবে :

দক্ষিণেশ্বরমারভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরী।
ধনুরাকারক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয়সংখ্যকম॥
তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারং ক্রোশ মাত্রম ব্যবস্থিতম।
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকারং ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মকম॥
মধ্যে চ কালিকা দেবী মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা।

নকুলেশ ভৈরব যত্র গঙ্গা বিরাজিতা।

কাশী ক্ষেত্রং কালীক্ষেত্রমভেদোঽস্তি মহেশ্বর।”

অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে বহুলা পর্যন্ত (বেহালা?) দুই যোজন পরিমিত ধনুরাকার স্থান হোল কালীক্ষেত্র। এর মধ্যে এক ক্রোশ ত্রিকোণাকার স্থানে আছেন ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং মধ্য স্থলে মহাকালী নামে বিরাজ করেন কালিকা দেবী।

এখন যেখানে দেখছেন বেনেতি দোকানের অরণ্য, একদিন সেখানে ছিল প্রাকৃতিক বনাঞ্চল। লোকের ছিল না বসতি। এরই মধ্যে সামান্য এক কুটীরে থাকতেন কালিকা দেবী। পূজা করতেন কাপালিক আর সন্ন্যাসীরা। এবং এই ভাবে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আড়ালে ছিলেন বলেই বৃহন্নীলতন্ত্রে এ-কালীকে বলা হয়েছে—গুহ্যকালী। পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে, সতীর দক্ষিণ পাদাঙ্গুলী পড়েছিল এখানে। কিন্তু পীঠ মালাতন্ত্রের মতে, পড়েছিল বাম হস্তের অঙ্গুলী। এ-ধরনের গোলমাল যে আছে আগাগোড়া, সে তো বলেইছি, সেজন্য আপনার নেই মনোক্ষুণ্ণ হবার কারণ। সে ভাবে আছেন বিশ্বাস নিয়ে, তাই থাকুন।

গুহ্যকালীর মন্দিরকে সকলের চোখের কাছে তুলে ধরেন—যশোর খুলনার প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্ত রায়। প্রথম মন্দির হয় তাঁর চেষ্টাতেই এখানে। তবে কালীঘাটে বর্তমানে যে মন্দির দেখছেন সেটা নয়। এ মন্দির তৈরী করেন বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের সন্তোষ রায় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে। তৈরী করেন মানে তাঁর টাকাতে তৈরী হয়। আসলে তিনি মারা যাবার পাচ ছয় বছর পরেই তৈরী হয় এ মন্দির। তবে সতীর কোন্ অঙ্গ কোথায় পড়ল তা নিয়ে যেমন আছে মতান্তর—তেমনই বর্তমান মন্দিরের নির্মাতা কে তা নিয়েও মত বিরোধের অভাব নেই। একদল দেখি বলতে চান, বড়িশার সন্তোষ রায় নন, এ মন্দির তৈরী করেন ভূ-কৈলাশের ঘোষালেরা। দুশ বছর পার না হতেই মন্দিরের নির্মাতা নিয়ে যদি এই মতভেদ, তাহলে এমন কালের ঘটনা (দক্ষযজ্ঞনাশ গল্প) যা ঘটেছিল 'ইতিহাস' শব্দ তৈরী হবার আগেই, তার সঠিক বিবরণ আর পাওয়া যাবে কেমন করে? সুতরাং যে যা

বলে তাই মেনে নিন, শুধু নিজের অন্তরে বিশ্বাস রেখে। দক্ষিণ পাদাঙ্গুলির জায়গায় যদি বাম হস্তের অঙ্গুলীই পড়ে থাকে, তাতেও নেই ভয়ের কিছু। দেবী সেই জন্য ভক্তদের উপরে হবেন না বাম। যদিও তাঁর দক্ষিণ হস্তে আশীর্বাদ এবং বাম হস্তে খাঁড়া এবং মুণ্ড, তবু সেজন্য মর্মাহত হবার নেই কারণ। দরজার মাথায় ৺মায়ের হাতের খাঁড়া রাখি তার নিচ দিয়ে চলব বলে। হাঁড়ি কাঠে মাথা ঠেকিয়ে ফাঁড়া কাটাই। সুতরাং দেবীর বামঅঙ্গ বাম তো নয়ই, দক্ষিণের চাইতেও বেশী প্রসন্ন। অতএব ভয় না পেয়ে বলুন মাভৈ।

পীঠনির্ণয়ের মতে বিংশতি শাক্তপীঠ হল প্রয়াগে। বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই ভাবে:

'অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্য প্রয়াগে ললিতা ভবঃ।'

অর্থাৎ হাতের অঙ্গুলী পড়েছে প্রয়াগে। দেবীর নাম ললিতা, ভৈরবের নাম ভব। অন্নদা মঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র নিজের ইচ্ছামত বর্ণনাটি বাড়িয়ে গেছেন আরো। উদ্দেশ্য, প্রয়াগ-মাহাত্ম্য বাড়িয়ে দেওয়া আর একটু। প্রয়াগ সঙ্গমের গুরুত্ব এমনিতেই আছে কুম্ভ মেলার অনুষ্ঠানে। আবার সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রয়াগের মহিমা বাড়িয়ে গেছেন পাচ বৎসর অন্তর অন্তর সেখানে গিয়ে দাতাকর্ণ হয়ে। ভারতচন্দ্র আরও একটু চেষ্টা করেছেন মহিমা বাড়াবার দশ মহাবিদ্যা স্থাপন করে। যেমন, ভারতচন্দ্র শাক্তপীঠ হিসেবে প্রয়াগের বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে:

'প্রয়াগেতে দুহাতের অঙ্গুলী সরস।
তাহাতে ভৈরব দশ, মহাবিদ্যা দশ॥'

পীঠনির্ণয়ে অঙ্গুলীবৃন্দের সংখ্যা নেই, এবং যেহেতু তা নেই, সুতরাং ধরে নিলে ক্ষতি নেই যে, দশ অঙ্গুলীই হবে। আঙ্গুল যখন দশ তখন দশের Laws of association-এ দশ মহাবিদ্যা আনা সহজ। সুতরাং সুযোগ পেলে ছাড়ে কে? কামাখ্যার দশ মহাবিদ্যা এসে হাজির হয়েছে প্রয়াগে।

সমস্ত ব্যাপারটাই যে একটা একীকরণের প্রচেষ্টা, এমন প্রমাণও আছে প্রয়াগ তীর্থে, যেমন, গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে আছে বেণীমাধবের

মন্দির। সেই বেণীমাধবকেও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে শাক্তপীঠের কাহিনীতে। শিবচরিতে প্রয়াগ সম্পর্কে আছে এই ধরনের বর্ণনা, যেমন, এখানে পড়েছে দেবীর হস্তাঙ্গুলী। কিন্তু দেবীর নাম ললিতা নয় কমলা, আর ভৈরবের নাম বেণীমাধব। আপনি যদি শিবচরিত প'ড়ে যান ৺মাকে পুজো দিতে, তাহলে দেবেন কমলাকে, ভৈরব হিসেবে বেণীমাধবকে। আর যদি পীঠনির্ণয়ের মতে চলেন তাহলে পুজা দেবেন ললিতাকে, ভৈরব হিসেবে ভবকে। আর যদি ভারতচন্দ্রের মতে চলেন—তাহলে ঘুরে বেড়ান দশ মহাবিদ্যার সন্ধানে। মনে কোন দ্বিধা রাখবেন না, সঙ্কোচ আনবেন না আমার এই রচনা পড়ে। কারণ, নাম একটা ফ্যাক্‌টর নয়। যে নামে খুজবেন সে নামেই পাবেন তাঁকে। এবং আরও একটু সত্যি বললে, যেখানে খুজবেন পাবেন সেখানেই। কিন্তু তবু যেতে হয় তীর্থক্ষেত্রে। আমার ধারণা, এর কারণ তিনটি, পণ্ডাদের বিজ্ঞাপন, নিজের পাপবোধ আর তীর্থের নামে ঘোরার ইচ্ছে। সে যাই হোক, আপনার ব্যাপার আপনার। আমার সেখানে মন্তব্য করে লাভ কি। যদি যেতে চান পুণ্যসঞ্চয়ে, কিংবা পাপস্খালনে, কিংবা ভ্রমণে, তাহলে এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমের ঘাট থেকে দেড় কিলোমিটারের মত পথ যাবেন একটু কষ্ট করে। এলাহবাদ ষ্টেশন থেকেও পারেন টাঙ্গায়, ট্যাক্‌সীতে বা রিক্সায় যেতে। সেখানে দুর্গের ভিতর আছে পাতালপুরীর মন্দির। সেটাও দেখবেন। বেণীমাধবকে যদি ভৈরব বলে মনে করেন পূজা দেবেন। যদি না মানেন তবুও করবেন মাথা নত। এবং অবশ্যই ভুলে যাবেন না অক্ষয়বটের মূল ছুঁতে। থাকতে চান থাকবেন। তীর্থযাত্রীর পক্ষে অসুবিধে নেই এলাহবাদে কোথাও থাকতে। আছে ধর্মশালা, আছে হোটেল, আর আছে অগতির গতি ভারত সেবাশ্রম।

পীঠনির্ণয়ের মতে, একবিংশতি শাক্ত পীঠ হল জয়ন্তী বা জয়ন্তাতে। বর্ণনা আছে এই রকম :

'জয়ন্তাং বাম জঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ।'

অর্থাৎ জয়ন্তী বা জয়ন্তাতে পড়েছে সতীর বাম জঙ্ঘা। দেবীর নাম

জয়ন্তী এবং ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর।

অন্নদামঙ্গলের কবি নতুন কিছু যোগ করেন নি এবার। তিনি প্রায় বিশ্বস্ত ভাবেই প্রকাশ করেছেন পীঠনির্ণয়ের বর্ণনাকে। যেমন, তিনি লিখেছেন : জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিল কেশব।

জয়ন্তী দেবতা, ক্রমদীশ্বর ভৈরব॥

সবই বোঝা গেল। বুঝতে নেই কোন অসুবিধাই। তবু কিন্তু রয়ে গেল একটি বড় সমস্যা—আসলে জায়গাটা কোথায়? কোথায় এই জয়ন্তা বা জয়ন্তী? দেবীকে ভক্তি অর্ঘ্য জানাতে ছুটে যাব কোন্‌খানে? চাপব কোন্ গাড়ীতে? ঐতিহাসিকদের ধারণা, জয়ন্তী এখন বর্তমান বাংলাদেশে। শ্রীহট্ট জেলার কালজোর বাউরভোগ গ্রামে। জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাসের অভিধানে একান্নপীঠের যে তালিকা, তাতে আছে স্থানের নির্দেশ খাসিয়া শৈলের দক্ষিণে জয়ন্তিয়া পরগণায়। গ্রামের নাম বাউরভাগ। আসামের ইতিহাস লেখক Gait। তিনি বলেছেন তাঁর বইয়ের ১২ পৃষ্ঠাতে যে, সতীর বামপদের নিম্নাংশ পড়েছিল জয়ন্তিয়া পরগণার ফাজলুরে। ঘাড় পড়েছিল শ্রীহট্ট জেলার কোনখানে। Gait-এর মতে, নরবলি হত এখানে দুর্গাপূজার মহা-নবমীতে। বলি দিতেন রাজা প্রজা উভয়েই। রাজা দিতেন পুত্র সন্তান জন্মালে, সাধারণ মানুষ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে। মজার কথা এই যে, বলি যাবার লোক নিজেরা এসে জুটতো স্বেচ্ছায়। অবশ্য কখনও কখনও যে এজন্যে মানুষ চুরি করা না হোত তাও নয়। কিন্তু এখন যেটা সমস্যা বড়, সেটা এই : ঠিক নির্দিষ্ট জায়গা কোন্‌টা যেখানে পড়েছিল দেবীর জঙ্ঘা?

আরও মজার কথা বলছি শুনুন। ভ্রমণরাজ্যের সেই সুলতান মামুদ, যিনি সতেরবার ভারত পরিভ্রমণ করেছেন পায়ে হেঁটে, তিনি আমাকে দিয়েছেন এক ভিন্ন ধরনের নিশানা। জায়গাটা নয় আসামের জয়ন্তিয়া পরগণাতে, নয় শ্রীহট্টেও। আসল জায়গা আছে জলপাইগুড়ি জেলার ভূটান সীমান্তে। রাজাভাতখাওয়া জংসন। সেখান থেকে ১৬ কি. মিটার দূরে জয়ন্তী স্টেশন। স্টেশন থেকে নেমে হাঁটা

পথে চলে যান মাইল পাঁচেক। গিয়ে দেখবেন জয়ন্তী। তোর্ষার শাখা নদী গেছে পাশ দিয়ে। অরণ্য বেশ গভীর ঘন। তার মধ্যে পাহাড়ে উঠুন একটুখানি। তিনটি গুহা পাবেন মুখ হাঁ করে। একটি মহাকালের, একটি জয়ন্তী মহাকালীর, আর একটি হল ত্রিদেবের। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তিলে তিলে তৈরী হয়েছে শিলাঝুরির (Stalactite) প্রাকৃতিক মূর্তি, মহাকালী। আসলে এটাই হল তীর্থ, মহাতীর্থ শাক্ত-ক্ষেত্র। শিবরাত্রিতে বছরে একবার মেলা বসে। অরণ্য জমে উঠে মৌগুঞ্জনে হাটের মত। তারপরই আবার চুপচাপ। জনমানবশূন্য গুহা পড়ে থাকে মহাকালের বুকে মহাকালীর মত। জয়ন্তী সম্পর্কে আছে আর একটি মত। অনেকে মনে করেন হাওড়ার আমতায় পড়েছিল সতীর বামজঙ্ঘা। এখানে জয়ন্তীদেবী পরিচিতা মেলাইচণ্ডী নামে। ১৯৫০ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মতে সতীর হাঁটুর মালাই চাকি পড়েছিল দামোদরের অপর পাড়ে। গ্রামের নাম জয়ন্তী। মালাই চাকির জন্যই দেবীর নাম হয় মেলাই চণ্ডী। মেলাই চণ্ডীর পুরোহিত থাকতেন আমতায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও আছে এই মেলাই চণ্ডীর উল্লেখ। নদীর তীরে বড় গাছের তলায় ছিল থান। বর্ষায় জয়ন্তী যাওয়ায় হত অসুবিধা। দেবীর স্বপ্নাদেশে তখন তাঁকে স্থাপন করা হয় আমতা এনে। আপনি যে-জয়ন্তিয়ায় খুশি এবার যেতে পারেন ইচ্ছেমত। অন্তরে বিশ্বাস থাকলে তীর্থপুণ্য পাবেন সর্বত্র।

দ্বাবিংশতি শাক্ততীর্থ হচ্ছে কিরীট বা কিরীটকোণা। পীঠনির্ণয়ে লেখা আছে :

'ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরিটস্থা কিরীটতঃ
দেবতা বিমলা নাম্নী সংবর্তো ভৈরবস্তথা ॥'

গ্রামারের কিছু ভুল আছে হয়তো পীঠনির্ণয়ের স্তোত্রগুলিতে, অন্ততঃ পণ্ডিত ব্যক্তিদের তাই ধারণা। কিন্তু ব্যাকরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার প্রয়োজন নয় আমাদের। আমরা যা জানতে চাই তার ছায়া পেলেই মহা খুশি। 'সিদ্ধিরূপা' অথবা 'সিদ্ধিরূপঃ' হবে, কিংবা 'কিরীটতঃ' না 'কিরীটাক্ষে কিরীটকঃ' হবে এ নিয়ে বৈয়াকরণিকেরা মাথা

ঘামান ঘামাতে পারেন, আমাদের নেই মাথা ব্যথা। 'ক' বলতে কৃষ্ণ বুঝলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ। সুতরাং, এইটুকু আমরা বুঝতে পারছি যে, কিরীট নামক স্থানে যে দেবী, তার নাম ভূবনেশী, এবং ভৈরব হলেন সিদ্ধিরূপ। এ ব্যাপারে কোন সমস্যাই নেই। কিন্তু সমস্যা তৈরী হয়েছে অন্য পংক্তিতে, যেখানে অর্থ দাঁড়াচ্ছে ভিন্নরকম, যেমন দ্বিতীয় পংক্তির ইঙ্গিত হল এই যে, দেবীর নাম বিমলা, ভৈরবের নাম সংবর্ত। তাহলে 'কিরীট'-এ আসল দেবী আর ভৈরব কে? আরও সমস্যা যেটা, সেটা হল এই, কোথায় সেই 'কিরীট' নামে জায়গাটি যেখানে গেলে শ্রদ্ধা জানাতে পারব দেবী ভূবনেশী বা বিমলা এবং ভৈরব সিদ্ধিরূপ বা সংবর্তকে?

এ-সম্পর্কে একবার দেখা যাক ভারতচন্দ্রের ধারণা, তারপর না হয় হবে অভিযাত্রার শুরু। ভারতচন্দ্র বলেছেন:

'কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট স্বরূপ।
ভূবনেশী দেবতা, ভৈরব সিদ্ধিরূপ।'

অর্থাৎ ভারতচন্দ্র জায়গাটার নাম বলেছেন কিরীটকোণা। এবং দেবীর নাম ভূবনেশী ও ভৈরবের নাম সিদ্ধিরূপ। সুতরাং বেশ কিছু ফারাক আছে পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা থেকে ভারতচন্দ্রের। দেবীর নাম, ভৈরবের নাম, স্থানের নাম, সর্বক্ষেত্রেই সমস্যা। তবে সুরাহা হবে কি ভাবে?

একবার যদি খুঁজে বের করা যায় স্থানটি তাহলে দেবদেবীর নামের ঝঞ্ঝাটও মিটে যায় অনেকটা। সুতরাং দেখা যাক এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের মন নিয়ে যাঁদের যাত্রা শুরু তাঁদের অভিমত কি ধরনের। দীনেশচন্দ্র সরকার নামে বিরাট একজন ঐতিহাসিক, বিস্তৃত নামে হয়তো চিনবেন না তাঁকে অনেকেই, কিন্তু সংক্ষিপ্ত নামে চিনবেন ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই—ডি. সি. সরকার। সেই ডি. সি. সরকারের ধারণা, কিরীট হল আমাদের এই বঙ্গদেশেই এবং খুব একটা দূরেও নয় তেমন কিছু। একটুখানি কষ্ট করে এগিয়ে গেলে মুর্শিদাবাদ জেলাতেই পেয়ে যাবেন জায়গাটা। নবাব বাদশার কীর্তি দেখতে

মুর্শিদাবাদ যান অনেকেই, সেই সঙ্গে যদি একটু ঠাকুরদেবতার কথা মনে পড়ে,—তাহলে সামান্য একটু হাতড়ালেই পেয়ে যাবেন কিরীটকোণা। লালবাগের কাছে বটনগর গ্রাম, সেখানেই আছে কিরীটকোণা বা কিরীটেশ্বরী। এবার নির্দ্বিধায় এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন লোককে, তাহলেই জানতে পারবেন দেবী এবং ভৈরবের নাম! দেখবেন, সবাই বলবেন, দেবী হলেন বিমলা এবং ভৈরব হলেন সংবর্ত। সুতরাং ভারতচন্দ্র বাংলায় লিখলেও ভিন্ন নামে বাঙ্গালীই তাকে গ্রহণ করেনি এ-ক্ষেত্রে।

আমার কাছ থেকে বর্ণনা নিন। লালবাগ থেকে পশ্চিমে যান মাইল তিনেক পথ হেঁটে। তাহলেই পাবেন কিরীটেশ্বরী, গুপ্তমঠ, শিব ও কালীর মন্দির। এ সবেরই সংস্কার করেছেন স্থানীয় রাজা দর্পনারায়ণ। সামনেই পাবেন কালীসাগর দীঘি। পৌষ মাসে দেখবেন জমজমাট। প্রতি মঙ্গলবারে মেলা বসে জাঁক করে। গল্প আছে, নবাব মীরজাফর যখন আক্রান্ত হয়েছিলেন কুষ্ঠ রোগে তখন মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শ অনুযায়ী কিরীটেশ্বরীব চরণামৃত পান করে হয়েছিলেন রোগ মুক্ত।

কিরীটকোণার পর ত্রয়োবিংশতি শাক্তপীঠ হচ্ছে—বারানসীর মণিকর্ণিকা। পাঠনির্ণয়ে আছে :

“বারাণস্যা বিশালাক্ষি দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলং চ মম শ্রুতে॥’

অর্থাৎ বারাণসীতে পড়েছিল সতীর কর্ণকুণ্ডল। দেবীর নাম বিশালাক্ষি। ভৈরবের নাম কাল। পীঠস্থান গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকায়।

বারাণসী অর্থাৎ কাশীতে বেড়াতে না গেছেন হেন পুণ্যার্থী বা ভ্রমণবিলাসী বাংলাদেশে কম। আমি নিজে গিয়েছি তিনবার। বিশ্বনাথ দর্শন করেছি, দিয়েছি পুজো। আশ্চর্য! অথচ একবারও পাণ্ডারা বলেনি যে, এখানে আছে একান্নপীঠের একপীঠ। আওরঙ্গজেবের মসজিদ দেখিয়েছে পাণ্ডারা, কিন্তু মণিকর্ণিকার ঘাটে সতীর দেহাংশ সম্ভূত যে আছে একটি শাক্তপীঠ, এ কথা ঘুণাক্ষরেও বলেনি কেউ

একবার। কেন? শৈব তীর্থের পাণ্ডারা শাক্তদেবী সম্পর্কে নয় তেমন আগ্রহী, সেই জন্য? শুনেছি এরকম আছে একটা বিরোধও। সেইজন্য নাকি বামাক্ষেপা যেতে পারেন নি শিবধাম বারাণসীতে। পেয়েছিলেন দুর্ব্যবহার। কিন্তু শক্তি আর শিবের মধ্যে সম্পর্ক তো অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং দেবীর প্রতি পাণ্ডাদের তো থাকবার কথা নয় অনীহা!

বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্র, তিনি দেখি বারাণসীতে শাক্তপাঠ সম্পর্কে উদাসীন। বারাণসীতে যে আছে শাক্তপীঠ, সে কথা তিনিও বলেননি তেমন করে। তাহলে? তাহলে কি কাশীতে শাক্তপীঠের চিন্তা এসেছে অনেক পরে? মূল পীঠনির্ণয়ে কাশীর নাম ছিলনা শাক্তপীঠের তালিকাতে? যাঁরা বর্ণনা দিচ্ছেন তাঁদের বর্ণনার মধ্যেও নেই মিল। শিবচরিতে নেই বারাণসীর নাম মহাপীঠ হিসেবে। আছে উপপীঠ হিসেবে স্থান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে যে তালিকা আছে, তাতে লেখা, কুণ্ডল পড়েছে বারাণসীতে। এটা নয় পীঠ, উপপীঠ; দেবীর নাম বিশালাক্ষি বা অন্নপূর্ণা। বড় ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখার্জী তাঁর Nationalism in Ancient India-তে বলেছেন, সতীর বাম অঙ্গুলী পড়েছিল কাশীতে, দেবীর নাম অন্নপূর্ণা। আবার যাঁরা নিজেরা ঘুরে এসেছেন ভ্রমণে গিয়ে এবং সেই সঙ্গে তীর্থপুণ্য সঞ্চয় করতে, তাঁদের মতে, দেবী হলেন বিশালাক্ষি এবং ভৈরব হলেন মহাকাল। কালভৈরব নামে শিব আছেন চকে। মূর্তি রূপোর। মন্দিরের সামনে আছে লিঙ্গ। পীঠস্থান হল গঙ্গার ধারে মণিকর্ণিকায়। যদি অন্নপূর্ণা হন শাক্তদেবী, তাহলে আমি করেছি পুণ্য অর্জন। যদি মণিকর্ণিকায় তিনি থাকেন বিশালাক্ষি হয়ে, ভ্রান্তি বশতঃ তাঁকে দেওয়া হয়নি পূজো, তবে স্পর্শ করেছি সে পুণ্যভূমি। সঠিক পুণ্য যাঁরা অর্জন করতে চান যথার্থ দেবীকে পূজো দিয়ে, অনুরোধ, তাঁরা যেন যান কাশীর পণ্ডিতদের কাছে যথার্থ দেবীর খবর নিতে। তবে মণিকর্ণিকা না যদি হয় বারাণসীতে তাহলে এর অস্তিত্ব খুঁজতে হবে ভিন্নস্থানে। কোন কোন সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা গলায় ধারণ করেন মণিকর্ণিকা কুণ্ডের এক ধরনের মণি। আসলে এক ধরনের উপলখণ্ড।

হিমালয়ের মধ্যে কোন এক স্থানে আছে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। সেই প্রস্রবণের জলে চাল বসালে ভাত হয়ে যায় বিনা অগ্নিতেই। সেই প্রস্রবণই মণিকর্ণিকা তীর্থ। তারই উপলখণ্ড গলায় ধারণ করেন সন্ন্যাসীরা। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়ে' আছে এ বর্ণনা।

'পীঠনির্ণয়ের মতে চতুর্বিংশতি শাক্তপীঠ হচ্ছে কন্যাশ্রমে। যেমন,

কন্যাশ্রমে চ পৃষ্ঠংমে নিমেষো ভৈরবস্তথা।
সর্বাণী দেবতা তত্র........................॥

কন্যাশ্রমে পড়েছিল সতীর পৃষ্ঠদেশ। ভৈরবের নাম সেখানে 'নিমিষ' এবং দেবীর নাম 'সর্বাণী'। কিন্তু বড় সমস্যা ভক্তদের কাছে এই যে, কোথায় সেই কন্যাশ্রম, যেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে দেবী সর্বাণীকে এবং ভৈরব নিমিষকে? বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্র নীরব রয়েছেন কন্যাশ্রম সম্পর্কে। যাঁরা পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন ভারতবর্ষ তাঁরাও বলেননি এ ব্যাপারে কিছু। অথচ জায়গাটা যে নেই একেবারেই কোথাও, একথাও নয় বিশ্বাসযোগ্য। 'তন্ত্রসার' বলে একটি তন্ত্রগ্রন্থে আলোচনা আছে দীক্ষা সম্পর্কে। কোন্ কোন্ জায়গায় অনুচিত দীক্ষা নেওয়া—তন্ত্রমতে তার একটা আছে তালিকা। তাতে লেখা আছে এই ধরনের কথা:

'গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপর্বতে
চট্টলে চ মতঙ্গে তথা কন্যাশ্রমেষু চ॥'

সুতরাং যাচ্ছে দেখা যে, কন্যাশ্রম বলে একটা স্থান ছিল। কিন্তু কোথায় সেই স্থান সেটাই প্রশ্ন। ঐতিহাসিকেরা একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পান কন্যাশ্রমের সঙ্গে কন্যাকুব্জের, (কান্যকুব্জ) অর্থাৎ বর্তমানে যাকে বলে কনৌজ শহর, উত্তরপ্রদেশের কনৌজ অঞ্চলে। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে আছে যে-ধরনের বর্ণনা তাতে মনে হয় না এটা উত্তর ভারতে, কারণ, এ ধরনের বর্ণনা আছে কন্যাশ্রম সম্পর্কে, যেমন, 'কন্যাশ্রমশ্চন্দ্র-শেখরগিরিসমীপবর্তী—কুমার্যাশ্রমস্থেত কামরূপে প্রসিদ্ধঃ।' এতে বোঝা যায়, কন্যাশ্রম আছে চন্দ্রশেখর নামক পাহাড়ের কাছে। অর্থাৎ

উত্তর ভারতে নয়, পূর্বভারতে। সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম জেলার কুমারী-কুণ্ডে। তবে সত্যি সত্যিই যে কোথায় এই 'কন্যাশ্রমপীঠ' দিব্যদর্শী ছাড়া বলা অসম্ভব। বিশেষ গোল বাঁধে ভিন্ন বর্ণনাতে। যেমন, জ্ঞানেন্দ্র-মোহনের অভিধানে আছে, সতীর পৃষ্ঠদেশ পড়েছিল বৈবস্বতে (কালিকাশ্রমে)। তাহলে এই 'কালিকাশ্রম'ই কি—কন্যাশ্রম হয়েছে? জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মতে বৈবস্বতে আছেন দেবী—'ত্রিপুটা' বা 'সর্বাণী' হয়ে এবং 'শমনকর্মা' বা 'নিমিষ' ভৈরবরূপে। শিবচরিতেও আছে একই ধরনের বর্ণনা অর্থাৎ সতীর পৃষ্ঠদেশ পড়েছিল বৈবস্বতে। দেবীর নাম 'ত্রিপুটা' ও ভৈরব 'শমনকর্মা'। দিব্যদর্শী ছাড়া নেই কেউ রহস্য ভেদের। তবে বৈবস্বত অর্থ হল সূর্য-তনয়। সূর্য উঠে পূব দিকে। চট্টগ্রাম ভারতের পূর্বপ্রান্তে। সূর্যের প্রথম স্পর্শ পড়ে প্রতিদিন সেখানেই। এই জন্য কি চট্টগ্রাম লাভ করেছিল 'বৈবস্বত' আখ্যা? তাহলে কুমারী কুণ্ডই কি কন্যাশ্রম?

পীঠনির্ণয়ের মতে পঞ্চবিংশতি পীঠ হল কুরুক্ষেত্রে। বলা হয়েছে:

…কুরুক্ষেত্রে চ গুল্‌ফতঃ।
স্থাণুর্নাম্না চ সাবিত্রী দেবতা…॥'

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে পড়েছে সতীর গুল্‌ফ। ভৈরব সেখানে আছেন 'স্থাণু' নামে। এবং দেবী রয়েছেন 'সাবিত্রী'রূপে।

বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্র আবার সবাক হয়েছেন কুরুক্ষেত্রে। অন্নদামঙ্গলে বলেছেন এ পীঠ সম্পর্কে, যেমন,

'কুরুক্ষেত্রে ডানি পা'র গুল্‌ফ অনুভব।
বিমলা তাহাতে দেবী, সংবর্ত্ত ভৈরব॥'

কিন্তু বিপদ হল এই যে, বড় গোলমাল করেন ভারতচন্দ্র। কোন না কোন জায়গায় করবেনই তিনি বিরোধিতা। স্থানের নাম ঠিক থাকলেও দেবেন ভৈরব কিংবা দেবীর নাম পাল্টে। পীঠনির্ণয়ে কুরুক্ষেত্রের দেবী হলেন 'সাবিত্রী', অন্নদামঙ্গলে 'বিমলা'। পীঠনির্ণয়ে ভৈরব হলেন

'স্থাণু', অন্নদামঙ্গলে 'সংবর্ত্ত'। সত্য যে নিরূপণ করা যায় কিভাবে সেটাই এখন ভাববার।

শিবচরিতের বর্ণনামতে কুরুক্ষেত্রে পড়েছে সতীর ডান গুল্ফ। দেবীর নাম 'সম্বরী' বা 'বিমলা'। ভৈরবের নাম 'সংবর্ত্ত'। ভারতচন্দ্রের একটি মাত্র দেবীর নাম উল্লেখ করবার কারণ বোধহয় এই যে, পয়ার-ছন্দের মিলের জন্য দুটো নাম বেমানান। আবার তন্ত্রচূড়ামণি এ-ব্যাপারে করেছে পীঠনির্ণয়েকেই অনুসরণ, অর্থাৎ তন্ত্রচূড়ামণির মতে কুরুক্ষেত্রের দেবী হলেন 'সাবিত্রী' এবং ভৈরব হলেন 'স্থানু'। আচ্ছা, এ-ব্যাপারে আপনি নিজে ভাবছেন কি বলুন তো? ধরুন, গেলেন কুরুক্ষেত্রে, তখন কালিদাসের মত কি মনে হবেনা যে, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? অর্থাৎ কোন্ দেবতাকে করব পূজো? 'সম্বরী', না 'বিমলা', না 'সাবিত্রী'কে? অপর দিকে ভৈরব হিসেবে 'সংবর্ত্ত'কে না 'স্থানু'কে? বুদ্ধিমান জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, তাঁর অভিধানে একান্নপীঠের দিয়েছেন যে তালিকা তাতে সবকিছু মিলিয়েমিশিয়ে এক অদ্ভুত জিনিষ করেছেন তৈরী। তিনি বলেছেন, কুরুক্ষেত্রের দেবী হতে পারেন 'সম্বরী' বা 'বিমলা', মতান্তরে 'সাবিত্রী', এবং ভৈরব হতে পারেন 'সংবর্ত্ত' বা 'স্থানু'। এবং আপনার যাঁকে খুশি পারেন পূজা দিতে, তাতে ক্রুদ্ধ হবেন না কেউই।

ভ্রমণের সুলতান মামুদ, যাঁর কাছ থেকে পীঠের ব্যাপারে প্রচুর পেয়েছি সাহায্য, তিনি পদব্রজে দেখে এসেছেন সেই পুণ্যভূমি। পঞ্চবিংশতি পীঠের শাক্তদেবীকেও জানিয়ে এসেছেন ভক্তিশ্রদ্ধা। তাঁর মতে, সতীর দক্ষিণ গুল্ফ পড়েছে কুরুক্ষেত্রে। দেবীর নাম 'সাবিত্রী', ভৈরব 'স্থানু', কেউ কেউ অবশ্য বলেন 'থানেশ্বর'। আসলে তা নয়। শুদ্ধ নামটা হচ্ছে 'স্থানিশ্বর' বা 'স্থানেশ্বর'। সেই যে পুষ্যভূতিদের রাজধানী! বর্তমানে লোকে তাকেই ডাকে 'থানেশ্বর' নামে। আসলে ভৈরব 'স্থানু' বোধহয় স্থানেশ্বরেরই দেবতা। এক সময়ে হর্ষবর্ধন শৈব ছিলেন, সবাই জানেন সে-কথা। সেই যে কারনাল, যে কারনালের প্রান্তরে নাদির শা পরাজিত করেছিলেন মোগলবাদশা মহম্মদশাকে, তারপর দিল্লীতে এসে করেছিলেন রক্তারক্তি কাণ্ড, সেই পাঞ্জাবের

কারনাল জেলাতে হল বর্তমান 'থানেশ্বর'। আগের ভূগোলের বিচারে জায়গাটা পাঞ্জাবে। স্বাধীন ভারতের ক্রমবিভাজমান রাজ্যের হিসেবে জায়গাটা এখন হরিয়ানায়। দিল্লী থেকে ১৫৭ কিঃ মিটার উত্তর পশ্চিমে।

রেলস্টেশন থেকে নেমে কাছেই পাবেন কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ, দেখতে পাবেন গালগল্প মেশানো অনেক জায়গা; দুর্যোধন যে হ্রদে লুকিয়ে ছিলেন সেই দ্বৈপায়ন হ্রদের নব সংস্করণ; কিন্তু ৺মায়ের বড় অনাদর। ছোট একটা জীর্ণ মন্দিরের ভেতর রয়েছেন ৺মা। লাল কাপড়ে ঢাকা একখণ্ড শিলামাত্র। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে যদি যান, দেখবেন, কুরুক্ষেত্রে এগার অক্ষৌহিণী নয় পঞ্চাশ অক্ষৌহিণী মানুষ এসেছেন পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়। সেই মুহূর্তে শাক্তপীঠে সতীদেহসম্ভূতা 'ভদ্রকালী' দেখবেন চলুন, তাহলে হবেন না বিভ্রান্ত। কুরুক্ষেত্র হলেও জায়গাটা যখন 'স্থানেশ্বর', তখন হর্ষবর্ধনের নাক উঁচু প্রোফাইলটার কথাও স্মরণ করবেন এবং স্থানেশ্বরের অধিদেবতা হিসেবে ভৈরবের নাম 'স্থানু'ই হল উপযুক্ত, এই কথাটি মনে রাখবেন। এবং যদি তা হয়, তাহলে—স্থানুর সঙ্গে সাবিত্রীকেই মানায় বেশী, কারণ, পীঠনির্ণয় নির্দ্বিধায় একটি মাত্র দিয়েছে ভৈরবের নাম অর্থাৎ 'স্থানু'। এবং করেছে একটি মাত্র দেবীর নাম 'সাবিত্রী'। কেউ কেউ অবশ্য বোঝাতে চেষ্টা করবেন আপনাকে যে, পীঠনির্ণয়ে ভৈরবের নাম নয় শুধুমাত্র 'স্থানু' তিনি 'স্নায়ু'ও। আমার অনুরোধ, তর্কে যাবেন না, 'স্নায়ু'কে খোঁজ করে অপ্রয়োজনে নামবেন না স্নায়ুযুদ্ধে। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। সুতরাং স্থানুর নামে স্থানুবৎ অচল হয়ে তাঁকেই করুন নমস্কার, এবং সেই সঙ্গে দেবী হিসেবে সাবিত্রীকেও।

ষড়বিংশতি শাক্তপীঠ হল মণিবেদ, কারো মতে মণিবেদিক, কারো মতে মানবেদক। এ-বিষয়ে পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা হল এই রকম:

"...মণিবেদকে।
মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্বানন্দস্তু ভৈরবঃ ॥"

অর্থাৎ মণিবেদকে পড়েছে মণিবন্ধ (কব্জি), দেবীর নাম 'গায়ত্রী',

ভৈরবের নাম 'সর্বানন্দ'। কিন্তু বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্র আবার গোল-মাল করে দিয়েছেন সব কিছু। 'মণিবেদ' সম্পর্কে অন্নদামঙ্গলে তাঁর যে ভাষ্য আছে, তা এই রকম :

'মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার।
স্থানু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর॥'

অর্থাৎ 'মণিবেদ' নামে যে স্থান, সেখানে পড়েছে সতীর মণিবন্ধ। ভৈরবের নাম 'স্থানু', দেবীর নাম 'সাবিত্রী'। অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যে ভৈরব এবং দেবী, তাঁদেরই ঢুকিয়ে দিয়েছেন তিনি মণিবেদে।

সব ঝঞ্ঝাটই চুকে যায়, যদি 'মণিবেদক' বা 'মণিবেদ'টা কোথায় সে কথা যায় জানা। তারপর জায়গা মত গিয়ে উপস্থিত হলেই জানা যাবে, কে দেবী, কে ভৈরব। কিন্তু স্থানটাকে পাওয়া যাবে কোন্‌খানে?

মণিবেদের নামটা কিন্তু আগের পাণ্ডুলিপিতে ছিল না, এসেছে পরে। এবং শাস্ত্রকারদের এ-প্রবণতা তো অবশ্যই স্বীকার্য। যে, সুযোগ পেলেই নিজেদের ইচ্ছেমত বিশেষ বিশেষ স্থানকে তাঁরা করে তুলেছেন শাক্তপীঠ। অবশ্য নতুন পীঠ গড়ে তুলতে পুরনো কোন স্থানই হয়েছে ভিত্তি। কিন্তু 'মণিবেদক' বা মণিবেদের ভিত্তি কোথায় সেটাই হল প্রশ্ন।

ভারতচন্দ্রই বুঝি এ-ব্যাপারে আবার পারেন সাহায্য করতে, যেমন ধরুন, ভারতচন্দ্র দিয়েছেন নতুন এক পীঠের নাম—মণিবন্ধ। সেখানে বলেছেন এই কথা :—

'মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধ অভিরাম।
সর্বানন্দ ভৈরব, গায়ত্রী দেবী নাম॥'

অর্থাৎ সতীর বাম মণিবন্ধ পড়েছে মণিবন্ধে। ভৈরবের নাম 'সর্বানন্দ'। দেবীর নাম 'গায়ত্রী'। পীঠনির্ণয়ে 'মণিবন্ধ' বলে শব্দ নেই, আছে 'মণিবেদক' বা 'মণিবেদ'। ভারতচন্দ্রের মণিবন্ধের ভৈরব এবং দেবীর নামের সঙ্গে মিলে যায় পীঠনির্ণয়ের মণিবেদকের ভৈরব ও দেবীর নাম। ভাবেসাবে অনুমান, ভুল করেছেন ভারতচন্দ্রই, 'মণি-

বেদক'কে দুভাগ করে করেছেন 'মণিবেদ' ও 'মণিবন্ধ'। ভারতচন্দ্রের হিসেবে হয়তো হচ্ছিল না একান্নপীঠ, তাই নিজের ইচ্ছেমত করে নিয়েছিলেন আর একটি পীঠের নাম। নইলে মণিবন্ধ হল হাতের কব্জি সেটা কেন হবে স্থানের নাম, বলুন, শুনি ?

না হয় ধরেই নিলাম, মণিবন্ধই 'মণিবেদ' বা 'মণিবেদক'। কিন্তু সমস্যা কি তাতেই মেটে ? জায়গাটার তো হদিশ চাই ? কোথায় এই 'মণিবেদক' ? বিষয় যাঁদের ইতিহাস, তাঁরা মাথা চাপড়ে বের করেছেন সামান্য একটা নিশানা, যেমন মণিবেদকের 'মণি' আছে মণিপুরে। দুই অক্ষরে মিল, সুতরাং মণিবেদের বদলে যদি ধরি মণিপুর, হয়তো বা হতে পারে। কল্পনার ট্যাক্‌সো নেই, অনুমানেরও নেই। সুতরাং বললেই হল একটা কিছু। তাই বলে টিকিট কিনে এক্ষুনি ছুটবেন মণিপুরে, ভাবছেন নাকি তেমন কিছু ? না, না, সেরকম সিদ্ধান্ত নেবেন না চট্ করে। কারণ, 'মণিবেদ' বা মণিবেদকের সন্ধান যদি না-ও মেলে মণিবন্ধের সন্ধান গেছে পাওয়া। পুবে নয়, একেবারে পশ্চিমে, বরং সেই আজমীরের কাছে। হ্যাঁ, যাঁরা গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সত্যিকারের ভ্রমণ করেন, জাতীয় গ্রন্থাগারে বসে লেখেন না ভ্রমণ-কথা, তাঁদের কাছে শোনা—সেই যে ভ্রমণের সুলতান মামুদ ! সতেরবার যিনি পদব্রজে ভারতের নানা প্রান্তের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য করেছেন লুণ্ঠন, সম্প্রতিকালে যাঁর সেই বিরাট অভিজ্ঞতার প্রথম সঞ্চয় ২২শে আষাঢ় রথযাত্রার শুভ দিনে (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ) বের হয়েছে—'পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন' এই নাম নিয়ে, যাতে আছে ঠিকমত মেহনত করে সংগ্রহ করা নানা সংবাদ, সেই দুর্ধর্ষ ভ্রমণবিদ ৭৫ বৎসরের তরুণ যুবক ভূপতিরঞ্জন দাস, তাঁর কাছ থেকে জানা—'মণিবন্ধ' বলে একটি পীঠস্থানের অস্তিত্ব আছে বাস্তবিকই। 'মণিবন্ধ' আছে আজমীরের কাছে পুষ্কর হ্রদের এক পাড়ে। আজমীর থেকে বাস বা টাঙায় চাপুন, থামুন এসে ১৫৩৯ ফুট উঁচু পুষ্কর হ্রদের গায়ে। গায়ত্রী পর্বতের নিচেই পাবেন সে মন্দির, সেই পীঠস্থান, যার খোঁজে ইতিহাস ঘুরছে হন্যে হয়ে। পাবেন সতীর করগ্রন্থিসম্ভূত সাবিত্রীকে, আর পাবেন সর্বানন্দকে

ভৈরবরূপে। আপনার পুণ্য সঞ্চয় কানায় কানায় পূর্ণ হবে। চিন্তা করবেন না বিন্দুমাত্র। থাকার নেই কোন অসুবিধা। আছে হোটেল, বিশ্রামভবন, টুরিষ্ট লজও। তবে যখনতখন না গিয়ে যদি যান কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশীতে, তাহলে একাদশী থেকে পুর্ণিমা অবধি পুষ্কর দেখবেন উদ্ভাসিত মেলা উপলক্ষ্যে। দেবীপীঠ দেখবেন, তর্পণ করবেন। মন দেখবেন ভরে উঠেছে কানায় কানায় পবিত্র ভাবে। তবে যাঁরা 'মণিবেদ'-কে মণিপুর হিসেবেই ধরতে চান, তাঁরা এখনও করবেন খুঁত্ খুঁত্। কারণ মণিপুর কৃষ্ণলীলার ক্ষেত্র হলেও শাক্ত সাহিত্যেও অনেক জায়গাতেই আছে মণিপুরের উল্লেখ। আছে তন্ত্রসাহিত্যেও। 'প্রাণতোষণী তন্ত্র' ও 'বাচস্পত্য পীঠে' আছে মণিপুরের নাম, যেমন,

'মণিপুরং হৃষিকেশং প্রয়াগশ্চ তপোবনম।'

কুব্জিকাতন্ত্রের সপ্তম পটলে সিদ্ধপাঠ বর্ণনাতেও আছে এর উল্লেখ। ফলে মণিপুরে 'মণিবেদ'-প্রত্যাশীরা পুষ্করকে আজও মেনে নিতে পারেন না নির্বিবাদে। সুতরাং তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য, আপনারা নিজেরাই দেখুন খোঁজ করে।

সপ্তবিংশতি শাক্তপীঠ হল শ্রীশৈলে। পীঠনির্ণয়ে আছে এই ধরনের বর্ণনা:

"শ্রীশৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু দেবতা।
ভৈরব সম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ॥"

শ্রীশৈলে পড়েছে সতীর গ্রীবা। দেবীর নাম 'মহালক্ষ্মী', ভৈরবের নাম 'সম্বরানন্দ'। অবশ্য পীঠনির্ণয়েরই কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে 'মহালক্ষ্মী'র পরিবর্তে 'মহামায়া'র উল্লেখ। সে যাই হোক, তাতে কিছু নেই হেরফের। জায়গা যদি পাওয়া যায়, নামের আড়ালে দেবতা আর লুকিয়ে থাকবেন কতক্ষণ? সুতরাং আগে দেখা যাক জায়গাটা কোথায়। চলুন, ভারতচন্দ্রের কাছেই আবার যাওয়া যাক, যদিও তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির প্রচণ্ডতায় অনেক কিছুই যেতে পারে গোলমাল হয়ে, তবু, কিছু কিছু হদিশ যে পাওয়া যাবে না তা-ও নয়। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রেই মিলতে পারে শ্রীশৈলের একটা নির্দেশ। ভারতচন্দ্রের

অন্নদামঙ্গলেই আছে এই ধরনের বর্ণনা :

"শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাঁহা সেবি ॥"

পীঠনির্ণয়ের সঙ্গে কিছু না কিছু মিলের অভাব ভারতচন্দ্রের থাকছেই। সুতরাং ধারণা, 'পীঠনির্ণয়'কে পীঠ নির্ণয়ে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন নি ভারতচন্দ্র। নিয়েছিলেন অন্য কোন গ্রন্থ। শিবচরিতের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মিল আছে অন্নদামঙ্গলের। যেমন, এ-ব্যাপারে শিবচরিতের ভাষ্য হল এই রকম :—শ্রীহট্টে পড়েছে সতীর গ্রীবা। দেবীর নাম 'মহালক্ষ্মী', ভৈরবের নাম 'সর্বানন্দ'। অর্থাৎ শিবচরিত আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের বর্ণনা হল এক রকম। 'সর্বানন্দ' আর 'সম্বরানন্দ' খুব একটা নয় দূরের ব্যাপার। 'মহালক্ষ্মী' সর্বত্রই আছেন অবিকৃতা। শ্রীশৈলই শুধু হয়েছে শ্রীহট্ট। যত হট্টগোলই হোক না কেন শ্রীহট্ট নামটা শুনলে পরেই আপনি সঙ্গে সঙ্গে পারবেন একটা নিশানা করতে, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে পড়ে যাবে সিলেটের কথা। ব্রিটিশ আমলে ছিল আসামে। দেশবিভাগের সময় পূর্বপাকিস্তানে। বর্তমানে বাংলাদেশে। সিলেটের অনেক লোককে পাবেন কলকাতার আশেপাশে। ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে যদি আপনার থাকে সামান্য জ্ঞানও তাহলে উচ্চারণের ভঙ্গী দেখেই বলতে পারবেন, লোকটি সিলেট, ঢাকা না চট্টগ্রামের। কিংবা তিনি বরিশালের। সেই শ্রীহট্ট, অর্থাৎ আমাদের অত্যন্ত পরিচিত সিলেটই হল প্রাচীন কালের শ্রীশৈল পীঠ। ইতিহাসবেত্তারাও একমত হয়েছেন এ-ব্যাপারে। এবং তাঁরা খুঁজেপেতে শ্রীহট্টের সেই নির্দিষ্ট স্থানটিও পেয়ে গেছেন যেখানে আছে একান্নপীঠের একটি পীঠ। সিলেটের কাছে গোট্টিকর জৈনপুর, সেটাই হল এই পীঠস্থান। যাঁরা পদব্রজে ঘুরে এসেছেন এই মহাপীঠ তাঁদের মতে পীঠের অবস্থান হল সিলেট সহর থেকে দুই কিঃ মিটার অগ্নিকোণে, জৈনপুরে। সুরমা নদীর ধারে আছে এখানে একটি প্রাচীন মন্দির। আগে যেতে পারতেন যখন খুশি। এখন লাগে পাশপোর্ট। তবে, একবার গিয়ে পৌঁছুতে পারলে পড়বেন না

অগাধ জলে। থাকার জন্য আছে সুব্যবস্থা।

অষ্টবিংশতি শাক্তপীঠস্থান হল কাঞ্চীদেশে। পীঠনির্ণয় লিখেছে :—

"কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো ভৈরবো রুরু নামকঃ।
দেবতা দেবগর্ভাখ্যা........................॥"

অর্থাৎ কাঞ্চীদেশে পড়েছে কঙ্কাল। দেবতা হলেন 'দেবগর্ভা' (অবশ্য কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে বেদগর্ভা) এবং ভৈরব হলেন 'রুরু'। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে লিখেছেন :

"কাঞ্চীদেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম।
দেবগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম॥"

এবার ভারতচন্দ্র পীঠনির্ণয়ের বাইরে খোদার ওপর করেননি খোদ্‌গারি। কমবেশী যা আছে পীঠনির্ণয়ে, তাই দিয়েছেন রেখে। সংখ্যা প্রসঙ্গে উর্বর শিবচরিতেও কাঞ্চীদেশের আছে নাম, ৩ নম্বর পীঠে। বর্ণনা আছে একই। তবে প্রশ্ন যেটা সামনে, সেটা এই, কোথায় আছে এই কাঞ্চীদেশ? এ-ধরনের একটা গান আছে না আমাদের দেশে? সেই যে,—

'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়'!

'কাঞ্চী' শব্দটা শুনলেই মন কিন্তু হাতের কাছে না তাকিয়ে চলে যায় অনেক দূরে। যেমন, সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায় দক্ষিণ ভারতের পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চীর কথা, আজকে যার নাম কঞ্জীভেরাম,—চিংলেপুট জেলাতে, মাদ্রাজে। স্বভাবতই ঘরের কাছে কোন জিনিষে তেমন উঠে না মন। গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায়না নিজের গাঁয়ে। কিন্তু ইতিহাসের কাঞ্চীর সঙ্গে ভেদ আছে একান্নপীঠের কাঞ্চীর। ইতিহাসের কাঞ্চী হতে পারে অনেক দূরে কিন্তু শাক্তপীঠের সঙ্গে জড়িত কাঞ্চী আছে আমাদের ঘরের কাছেই। ঘরের কাছেই, হ্যাঁ, খুবই কাছে, হাত বাড়ালেই যেতে পারে পাওয়া।

বেড়াতে তো যান মাঝে মাঝেই। অন্ততঃ পূজোর ছুটিতে কোথাও বেরুতে না পারলে ছ্যা ছ্যা করে লোকে। সেই জন্য অর্থের অভাবের

কথা গোপন করে, জরুরী কাজের দোহাই দিয়ে, অর্থাৎ 'বেশী দিন সম্ভব নয় কলকাতা ছেড়ে বাইরে থাকা' এই বলে, হাতের কাছে ঘুরে আসেন বোলপুর গিয়ে। শান্তিনিকেতনের বিশ্রাম ভবনে দুদিন দেখিয়ে জমিদারী মেজাজে আবার ফেরেন কলকাতাতে। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন শান্তিনিকেতন, তাই তার শান্তি ভাঙতে মাঝে মাঝেই অনেকে যান সেখানে। যিনি কোনদিন রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতার বাইরে আর পড়েননি অন্য কিছু, রবীন্দ্রনাথ বানান ভুল করতে পারেন পাঁচবার, শুধু দাড়িগুম্ফজড়িত রবীন্দ্রনাথের ছবিটাই পারেন মনে করতে, আর পারেন ভুল সুরে কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতে, শান্তি-নিকেতনে যাওয়া সেই সব ব্যক্তিকে নিয়ে সকল লোককেই বলছি—একবার যদি ওদিকে যান, একান্নপীঠের একটি পীঠ আছে বোলপুরের ছায়াতেই, লোকে বলে 'কঙ্কালীতলা', বেঙ্গুটিয়া মৌজায়। বোলপুরও কিন্তু নয় খুব একটা আধুনিক জায়গা। বরং বেশ ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি প্রাচীন স্থান। মার্কণ্ডেয় পুরাণে গল্প আছে : রাজা সুরথ—দেবী চণ্ডীর কৃপা লাভের জন্য এখানে করেছিলেন এক লক্ষ বলিদান। বলিদান করা হয়েছিল বলেই এ স্থানের নাম হয়েছিল 'বলিপুর'। এই বলিপুরই কালক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'বোলপুর'। প্রাচীন সেই বলিপুরের কাছেই এই 'কাঞ্চীদেশ' বা 'কঙ্কালীতলা'।

বোলপুর স্টেশনে নেমে খুব একটা দূরে যেতে হবেনা আপনাকে, মাত্র মাইল চারেকের পথ। উত্তর-পূর্ব দিকে চলে যাবেন কোপাই নদীর ধারে। দেখবেন ইদানাং কালে তৈরী হয়েছে এক মন্দির। পাশেই আছে কুণ্ড। এই কুণ্ডেই মূল দেবীর অবস্থান। মন্দিরে আছে অর্বাচীন এক কালিকা মূর্তি। কাছেই আছে উঁচু ঢিবির উপর 'কাঞ্চীশ্বর' শিব আর ভৈরব-থান। একান্নপীঠের পুণ্য পারবেন অর্জন করতে চোখে দেখলে।

কাঞ্চীপীঠ দেখার পর চলুন একান্নপীঠের নতুন পীঠে, যে পীঠ হবে উনত্রিংশৎ। পীঠনির্ণয়ে আছে এ পীঠের বর্ণনা এই ভাবে :—

…নিতম্বঃ কালমাধবে ॥
ভৈরবশ্চাসিতাঙ্গশ্চ দেবী কালী সুসিদ্ধিদা ॥
দৃষ্টাদৃষ্টা নমস্কৃত্য মন্ত্রসিদ্ধির্ভবাপ্নুয়াৎ।
কুজবারে ভূততিথৌ নিশার্দ্ধমস্তুসাধকঃ ॥
নত্বা প্রদক্ষিণী কৃত্য মন্ত্রসিদ্ধির্ভবাপ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ কালমাধবে পড়েছে দেবীর নিতম্ব। দেবী 'কালী', ভৈরব হলেন 'অসিতাঙ্গ'। এ-স্থান দর্শন মাত্রেই হয় মন্ত্রসিদ্ধি। মঙ্গলবার চতুর্দশীর অর্ধরাত্রে যদি কোন সাধক করে এই পীঠ নমস্কার, তবে মন্ত্রসিদ্ধি তাঁর হবে অবশ্যই।

'পীঠনির্ণয়' থেকে যথার্থই বোঝা যাচ্ছে, 'কালমাধব' শুধু পীঠ নয় মহাপীঠ হবে। তাহলে সেইজন্যই কি ভয়ানক ভাবে আত্মগোপন করে আছে অন্তরালে? অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা যদিও পারছেন নানা স্থানের নিশানা দিতে, পারছেন না দিতে কালমাধবের। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে আছে যে পীঠস্থানের তালিকা, তাতে আছে, কালমাধব হল হল শোণনদে। নদী তো নয় তিন হাত চওড়া আর আধ হাত লম্বা একটা খেলার জিনিষ যে, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে একটা নির্দিষ্ট স্থান। নদীর নামে হয়না একটা স্থান-নির্ণয়। নিশ্চয়ই তার তীর সংলগ্ন কোন স্থান বা উৎস বা মোহনাকে দিতে হবে নির্দেশ করে। নইলে নদীর নাম আর গোটা পৃথিবীর নাম করা একই কথা। উর্বর মস্তিষ্ক ভারতচন্দ্র, তিনিও কিন্তু কালমাধবের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র পারেন নি সাহায্য করতে। স্থান নির্ণয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য পীঠনির্ণয়েরই মত অস্পষ্ট। যেমন, তিনি লিখেছেন:

'নিতম্বের অর্ধ কালমাধবে তাঁহার।
অসিতাঙ্গ ভৈরব দেবতা কালী তাঁর ॥

কিন্তু কালমাধবটি কোথায়? স্থানের নির্দেশ না হলে ভক্তেরা যাবেন কোন্‌খানে?

সামান্য একটু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ভ্রমণের সুলতান ভূপতিবাবুর কাছ থেকে, অর্থাৎ আমাকে যিনি লিখিতভাবে সাহায্য করেছেন

এ-ব্যাপারে। স্থানটা নাকি হতে পারে অমরকণ্টকের খুব কাছাকাছি, পাহাড়ের এক গুহায়, শোণনদীর তীরে। তবে নিশানাটাই দিয়েছেন শুধু, নিশ্চিত বলতে পারেন নি কিছুই। সম্ভবতঃ সাধক না হলে সেই গোপন পীঠে যাওয়া যাবেনা বলেই তা আছে অন্তরালে। আপনি যদি পুণ্যাত্মা হন, (আশা করি নিশ্চয়ই তাই), তাহলেই শুধু পেতে পারেন সেই মহাতীর্থের পথনির্দেশ। কষ্ট করে একবার ঘুরে আসুন অমরকণ্টক, এবং সেই সঙ্গে আশেপাশে এদিক ওদিক, যদি পেয়ে যান অকস্মাৎ সেই পীঠের খবর। তবে যাঁরা তন্ত্রমতে সাধনপন্থী তাঁদের কথা 'কালমাধব' নায় অমরকণ্টকে। এ পীঠ রয়েছে ওড়িশাতে পুরীর কাছে। তন্ত্রাচার্য সৌরেন মৈত্র, থাকেন ১০৮/৩ বেলেঘাটা মেন রোডে। তিনি জানিয়েছেন পত্র দিয়ে, এ পীঠ হল পুরী থেকে মাইল চারেকের ব্যবধানে। গজপতি রাজাদের শ্যামাকালী আছেন মূর্তি হয়ে। ভক্ত পাঠক ইচ্ছে হলে যে-কোন দিন পারেন সেখানে যেতে।

ত্রিংশৎ পীঠস্থান হল নর্মদা তীরে কিংবা শোণ বা শৈলতে। তবে পীঠনির্ণয়ের যে পাণ্ডুলিপি এখন খোলা রয়েছে আমার সামনে, নর্মদার কথাই তাতে লেখা আছে। বর্ণনা আছে এই ধরনের :

"শোণাখ্যা ভদ্রসেনস্তু নর্মদাখ্যে নিতম্বকঃ।

ভারতচন্দ্রের মতে সামান্য ভুল রয়েছে বর্ণনাতে, অর্থাৎ 'শোণাক্ষি' হবে 'শোণাখ্যা' না হয়ে। বর্ণনার গোলমালে পীঠস্থানটি হবে শোণে কিংবা নর্মদাতীরে সেটাই গেছে অস্পষ্ট হয়ে। তবে ভারতচন্দ্র দাঁড়িয়েছেন নর্মদার পক্ষেই। যেমন—এই কথা বলেছেন তিনি অন্নদামঙ্গলে :

'নিতম্বের আর অর্দ্ধ পড়ে নর্মদায়।
ভদ্রসেন ভৈরব শোনাক্ষি দেবী তায়॥'

অর্থাৎ পীঠনির্ণয় দিয়েছে যে বর্ণনা—অর্থাৎ নর্মদায় পড়েছে সতীর নিতম্ব, তাতে দেবী 'শোণা', ভৈরব 'ভদ্রসেন', তার বদলে হবে দেবী 'শোণাক্ষি' এবং ভৈরব 'ভদ্রসেন'। পীঠনির্ণয়ের ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে অবশ্য বর্ণনা আছে একটু অন্য ধরনের। যেমন, শোণাখ্যের বদলে লেখা আছে

'শোণভদ্রে' বা 'শৈলাখ্যে'। বর্ণনান্তর থাকুক না যতই কেন, না হয় মেনে নিলাম পীঠনির্ণয়েরই প্রথম বর্ণনা, কিন্তু তাতেই কি ব্যাপারটা সহজ হবে? অর্থাৎ আমরা স্পষ্ট পেয়ে যাব সেই পীঠের নির্দেশ?

না। আগে ঠিক করতে হবে কোথায় সেই স্থান—শোণনদ, নর্মদা বা শৈলপীঠস্থান। কোথায় রয়েছে তা মহাপীঠ হয়ে। ঐতিহাসিকরা পারেন নি নিশ্চিত বলতে। সুতরাং ভ্রমণবিদ যাঁরা চলুন তাঁদের কাছে। ভ্রমণের সুলতান ভূপতিরঞ্জন দাস, তাঁর হাতের লেখা বর্ণনা এখন আমার টেবিলে। স্বয়ং ঘুরে সব দেখে এসেছেন নিজে। তাঁর বক্তব্য, অমরকণ্টক তীর্থে নর্মদা নদীর উৎসে বিরাজ করছে এই পীঠ। দেবী 'নর্মদা', ভৈরব 'ভদ্রসেন'। পীঠনির্ণয়ে যদিও দেবীর নাম 'শোণা' তবু কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে 'নর্মদা' নামও। ফলে স্বকপোলকল্পিত বা পাণ্ডা-উদ্ভাবিত নাও হতে পারে এ দেবীর নাম। সুতরাং শুনুন ভূপতিবাবুর কথা—পেণ্ডারোড রেলস্টেশন থেকে ৪৫ কিঃ মিটার দূরে। উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৩৫০৯ ফুট। শুধুমাত্র একটা উপত্যকা। মন্দির আছে কয়েকটা, আর আছে কুণ্ড। দেবীপীঠ হল নর্মদা কুণ্ডে। কেউ কেউ অবশ্য কালমাধবেরও একটা হদিশ দেবেন আপনাকে এখানে দাঁড়িয়ে। বলবেন, পাশাপাশি আছে দুটো কুণ্ড, একটি হল উৎস নর্মদা নদীর আর একটি শোণের। অমরকণ্টক হল নর্মদা নদীর এবং কালমাধব হল পবিত্র শোণের। এখান থেকেই আপনি পুজো দিতে পারেন সতীর বাম নিতম্বসম্ভূতা 'কালিকা' কিংবা দক্ষিণ নিতম্ব সম্ভূতা 'নর্মদা', 'শোণা' বা দেবী 'শোণাক্ষি'কে। তর্কবিতর্কে লাভ নেই দূর দূরান্ত ঘুরে। বরং প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই ভাল। অমরকণ্টকে যদি যান কদাচ কখনও এই শাক্ততীর্থে ভুলবেন না অর্ঘ্য দিতে। এবার চলুন নতুন পীঠের সন্ধানে।

পীঠনির্ণয়ের মতে একত্রিংশৎ পীঠ অবস্থিত আছে রামগিরিতে। রামগিরির লোকেশন না জানা থাকলেও নামটা চেনা খুব অনেকেরই কাছে। মেঘদূতের যক্ষ এখান থেকেই অলকাপুরীতে পাঠিয়েছিলেন প্রণয়বার্তা। মেঘদূতের সেই রামগিরিই এই রামগিরি-

পীঠ,শাক্ত তীর্থ। পীঠনির্ণয়ে আছে এমন বর্ণনা :—

'রামগিরৌ স্তনান্যশ্চ শিবানী চণ্ড ভৈরবঃ ॥'

অর্থাৎ রামগিরিতে পড়েছে সতীর অন্য স্তন। দেবতা 'শিবানী' এবং ভৈরব হলেন 'চণ্ড'। যদিও স্থান আর সতীর দেহাংশ নিয়ে আছে মতান্তর, (যেমন, অনেকে রামগিরিকে বলেছেন 'রাজগিরি', কেউ সেই সঙ্গে দেবীর দেহাংশকে বলেছেন 'নাসা' ; আবার কেউ বা স্থানের উল্লেখ করেছেন 'রামাকিনি' বলে, দেবীর দেহাংশকে বলেছেন 'নলা'।) তবু দেবী আর ভৈরবের নাম আছে সর্বত্রই একই, অর্থাৎ দেবী 'শিবানী' এবং ভৈরব 'চণ্ড'। ভারতচন্দ্রও একমত এখানে পীঠনির্ণয়ের সঙ্গে। যেমন, ভারতচন্দ্র লিখেছেন অন্নদামঙ্গলে :—

"আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে।
শিবানী দেবতা চণ্ড ভৈরব সেখানে ॥

এখন ভক্তজনের কাছে যেটা বেশী প্রয়োজন, সেটা নয় নাম বা দেহাংশ বর্ণনা, বরং স্থানের নির্দিষ্টতা—কোথায় আছে এই রামগিরি পীঠ? ভূগোলে আমার জ্ঞান চিরকালই কম। কলকাতার রাস্তাতেই হারিয়ে ফেলি দিক। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া উপায় নেই কোন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, যাঁকে লোকে জানে ইতিহাস-বেত্তা ডঃ ডি. সি. সরকার বলে, তিনিও নিশ্চিত নন এর অবস্থান সম্পর্কে। তাঁর নিজের মত হল মধ্যপ্রদেশের নাগপুরের কাছে আধুনিক রামটেকই হল প্রাচীন 'রামগিরি'। কিন্তু, তবু কোথায় যেন একটা 'কিন্তু' থাকছে থেকেই। কারণ, কেউ কেউ আবার জোর দিয়েই বলেন, রামায়ণের সেই চিত্রকূট পাহাড়, যা এখন আছে বুন্দেলখণ্ডে, সেই চিত্রকূটই হচ্ছে আসল রামগিরি। হলেও হতে পারে। ছিল বানরদের গিরি, শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে হয়েছে 'রামগিরি'। কিন্তু, সামান্যও যদি মতভেদ থাকে, তাহলে আমরা যাব কোথায়, কোন্‌খানে? জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে' রামগিরিকেই বলেছেন চিত্রকূট পাহাড়। আর এখনও যিনি ৭৫ বৎসরের যৌবনে বহাল তবিয়তে আছেন ভ্রমণ জগতে, অভিজ্ঞতার ফসল নিয়ে প্রথম এসেছেন

পাঠকের কাছে ১৩৮৫ সালের ২২শে আষাঢ়, 'পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন' নামে উপহার রেখেছেন শুভ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে, তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা এই ধরনের, যেমন, চিত্রকূটই হল রামগিরি পীঠ। ঐতিহাসিক-দের ধারণা হোক না যে-ধরনেরই, দেবীর দক্ষিণ স্তন পড়েছে রামগিরি পীঠে। দেবী 'শিবানী' এবং ভৈরব 'চণ্ড'। স্বচক্ষে দেখতে চান চলুন ঝাঁসির দিকে। ঝাঁসি থেকে আছে মালিকপুর শাখারেল। টিকিট কাটুন কারভি স্টেশনের। সেখানে নেমে ধরুন বাস বা রিক্সা, কিংবা নামুন 'চিত্রকূট' স্টেশনে। নেমে পায় হেঁটে চলুন রামগিরির দিকে। সামান্য দূরত্ব মাত্র, তুমাইল! ১৯৫০ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে বি. এন. আর রেলে যেতে হবে বিলাসপুর। সেখান থেকে তিনক্রোশ বায়ু কোণে আছে এই তীর্থ। হারাবার ভয় নেই কিছুই এখানে, বরং উপরি পাওনা আছে সত্যিই অনেক। দেখুন চিত্রকূটতীর্থ, তুলসী দাসের সাধনক্ষেত্র। নিচে পুণ্যসলিলে স্নান করে যান পাহাড়ের উপরে মন্দির দর্শনে। মরুভূমিতে পড়বেন না। থাকার ব্যবস্থা আছে, আছে ধর্মশালা। সোজা চলে যান। চোখ জুড়োবে মনও ভরবে।

রামগিরি শেষ। এবার চলুন যাই দ্বাত্রিংশৎ পীঠে। সেটা কোথায় আছে এই ভাবছেন তো? পীঠনির্ণয়ের মতে সে পীঠ রয়েছে বৃন্দাবনে। হ্যাঁ, বৈষ্ণবতীর্থ বৃন্দাবনেই আছে এই শাক্তপীঠ। যিনি রাধা তিনিই তো কালী! এ-কথা অনেক গল্পেও আছে। সুতরাং—কোন দ্বিধার কারণ নেই। শুনুন পীঠনির্ণয়ের বর্ণনা। পীঠনির্ণয়ে আছে:

"বৃন্দাবনে কেশজালমুমানাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"

অর্থাৎ বৃন্দাবনে পড়েছে সতীর কেশজাল। দেবীর নাম 'উমা' এবং ভৈরব 'ভূতেশ'। সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক তিনি। কিন্তু কোথাও কোথাও আবার আছে ভিন্ন ধরনের কথা। যেমন:

'বৃন্দাবনে কেশজালে কৃষ্ণনাথস্তু ভৈরব
কাত্যায়নী তত্র দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী॥'

আবার ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে দিয়েছেন এই ধরনের বর্ণনা:

কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ।
উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ ॥'

ভারতচন্দ্র স্থান হিসেবে বৃন্দাবনের পরিবর্তে দিয়েছেন কেশজালের নাম। যেমন, মণিবেদের জায়গায় অনেকে বসিয়েছেন মণিবন্ধকে স্থান হিসেবে। কেশজাল বা কেশরাশী হতে পারেনা কোন স্থানের নাম। অবশ্য কিসে যে কি হয় বলা প্রায় অসম্ভব। জগৎ রহস্যের বোধহয় একটাই উত্তর আছে—প্রিন্স মেটারনিক যেটা বলেছিলেন পোপ নবম পিয়াসকে—There is no answering for anything.

পীঠনির্ণয় বলেছে 'বৃন্দাবন'কে অন্যতম একটি শাক্তপীঠস্থান। ভারতচন্দ্র বলেছেন—'কেশজাল'। আবার শিবচরিত বৃন্দাবনকে 'কেশজাল' বললেও পীঠের মর্যাদা না দিয়ে দিয়েছে উপপীঠের। অথচ ভৈরব ও দেবীর নামে অন্নদামঙ্গল আর শিবচরিত হচ্ছে পীঠনির্ণয়ের সঙ্গে একমত। তবে স্থানের ক্ষেত্রে কেন মতভেদ, সেকথা জানার আজ বোধহয় আর কোন রকম নেই অবকাশই।

বৃন্দাবনে যাবার সৌভাগ্য আমার নিজেরও হয়েছে বেশ ভাল ভাবেই। কিন্তু যে জন্যেই হোক, আমার অনুসন্ধিৎসার অভাব বা জ্ঞানের অভাব, পাণ্ডারা শুধু দেখিয়েছে আমাকে রাধাকৃষ্ণের লীলা কেন্দ্র। একবার ভুলেও উচ্চারণ করেনি শাক্তমহাপীঠের কোন কথা। সম্ভবতঃ জ্ঞানের অভাবের জন্য বৈষ্ণবেরা দেখে শক্তিকে পৃথক করে, সেইজন্যই দেখায়নি তেমন আগ্রহ। নইলে 'কালী' আর 'রাধা' তো একই সক্রিয়পুরুষ, অর্থাৎ প্রকৃতি। তত্ত্বজ্ঞান আর কয়জনেরই বা আছে, তথ্য-জ্ঞানই তো বেশী। সুতরাং বৃন্দাবন গিয়েও মহাশাক্তপীঠ দেখা হয়নি আমার। তবে কষ্ট করে যাঁরা ভ্রমণ করেছেন অনুসন্ধিৎসা নিয়ে, আগ্রহ করে যাঁরা ভ্রমণ করেছেন তীর্থপুণ্যের আশায়, তাঁরা বৃন্দাবনে গিয়ে শুধুমাত্র রাধাকে দেখেন নি, দেখেছেন তাঁর উমাকেও। যমুনার তীরেই আছে সেই মন্দির। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের 'কেশীঘাট'ই সেই পীঠস্থান। কারো কারো মতে উমাবনের কাছে। শক্তি-মায়ের চাইতে পয়সার শক্তি বেশী বলে নতুন মক্কেল বাগাবার উদ্দেশ্যে পাণ্ডারা

উল্লেখ করেনি উমা-মন্দিরের কথা। তাই বৃন্দাবনে গিয়ে রাধাকৃষ্ণরূপে প্রকৃতি-পুরুষ দেখেছি বটে, শিবশক্তি হিসেবে দেখিনি পুরুষ-প্রকৃতি। দেখেছি বৃন্দাবন, কিন্তু উমাবন দেখিনি। সে বঞ্চনা কতকাল বয়ে বেড়াতে হবে কে জানে। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি...সুতরাং

সুতরাং নতুন আরেক শাক্তপীঠের করা যাক সন্ধান। পীঠনির্ণয়ের মতে ত্রয়োত্রিংশৎ শাক্তপাঠ হল 'শুচি' বা 'অনলে'। যেমন,

'সংহারাখ্য উর্দ্ধদন্তো দেবী নারায়ণী শুচৌ।'

অর্থাৎ উর্দ্ধদন্ত পড়েছে 'শুচি'তে। দেবী 'নারায়ণী' এবং ভৈরব হলেন 'সংহার'। কিন্তু সমস্যা এই, কোথায় সেই 'শুচি'-দেশ যেখানে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করা যাবে দেবী এবং ভৈরবকে? ঐতিহাসিক নীরব এ-ব্যাপারে। আমাদের ভ্রমণের সুলতান মামুদ ভূপতি রঞ্জন দাস, যিনি আমাকে তথ্য সরবরাহ করেছেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, তিনিও স্বীকার করেছেন এ-ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতা। ভারতভূমি তন্ন তন্ন করে কোথাও খুঁজে পাননি তিনি 'শুচির' সন্ধান। তাহলে?

কবি তো শুনেছি ধারেন না ইতিহাসের ধার, ইতিহাস করেন তৈরী। সেইজন্য রাম জন্মাবার ষাট হাজার বছর আগে বসেই বাল্মীকি রচনা করেছিলেন রামায়ণ। দেখা যাক কবির সেই উর্বর মস্তিষ্কে মেলে কিনা এ-বিষয়ে কোন নিশানা। সতীর উর্দ্ধদন্তপাতোদ্ভূত পীঠ বর্ণনা করেছেন ভারতচন্দ্রও। দেবীর নামের সঙ্গে মিল আছে, কিন্তু ভৈরব এবং স্থানের নামের সঙ্গে নেই কোন মিল। ভারতচন্দ্র লিখেছেন এই রকম :—

'উর্দ্ধ দন্তপাঁতির অনলে হইল স্থান।
"সংক্রুর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম ॥"

'শুচির' জায়গায় ভারতচন্দ্র নাম করেছেন 'অনল'-এর। কিন্তু তাতে সমস্যা যা ছিল তাই আছে, ঘটেনি কোন হেরফের। কারণ, ভূগোল তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও দেখবেন 'অনল' বলে কোন নেই স্থানের উল্লেখ। তবে 'শুচি' এবং 'অনল' দুয়েরই একটা অর্থ আছে ভিন্নভাবে। শুচি মানে পবিত্রতা একথা জানেন শুচিবাইগ্রস্ত যে-কোন লোকই। আর

অনল অর্থ আগুন এ-কথা জ্ঞাত তরলমতি শিশুর কাছেও। এ-ধরনের কোন স্থানের নাম আসেনা কল্পনাতে। অবশ্য অধিকাংশ স্থানের নামই অসভ্য রকমে অর্থহীন। যেমন ধরুন, আপনি যদি ৭৫নং বাসে চেপে গঙ্গার ধারে রায়পুর যান ইলিশ কিনতে, পথে পাবেন 'কেত্‌লা হাট' বলে একটি স্থানের নাম। 'কেত্‌লা হাটের' অর্থ কি হবে বলুন শুনি? অবশ্য এ বিষয়ে নস্য টেনে যাঁরা অসীম ধৈর্য নিয়ে জেগে থাকতে পারেন বে-আদবের মত, শেষপর্যন্ত কিছু না কিছু তাঁরা করবেনই উল্লেখ। যেমন আমার এক অধ্যাপক বন্ধু—রজত রায় চৌধুরী 'কেত্‌লাহাটে'র রহস্যভেদ করে শেষপর্যন্ত করেছেন এক অর্থ উদ্ধার। 'কেত্‌লাহাট' কেত্‌লাহাট নয়, আগে ছিল 'কেঁয়াতলা হাট'। দ্রুত উচ্চারণে, (সম্ভবত বাস কণ্ডাকটরদেরই) কেঁয়াতলার 'আ'-কার গেছে দাঁতের মতন খসে পড়ে। কেঁয়াতলা 'আ'-কার হারিয়ে হয়েছে কেতলা। কিন্তু 'শুচি' এবং 'অনল' সম্পর্কে এমন কোন বৈয়াকরণিক উদ্ভাবনাও নয় সম্ভব। সুনীতি চাটুয্যের ধৈর্য নেই আমার। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে হিমালয় অভিযানের কাহিনী লেখবার সাহসও নেই বর্তমান লেখকের। সুতরাং...। যা-হোক করে একটা পরিসমাপ্তি না দিলে লেখা অচল। ফলে—আমার নিজস্ব একটা আছে বক্তব্য, শুনুন। রহস্যের মধ্যেই অতীন্দ্রিয় সত্য আছে লুকিয়ে। সবটুকুই যদি প্রকাশ পায় তবে অতীন্দ্রিয়তা থাকে কোথায়? কিছুটা তাই দেবী লুকিয়ে রেখেছেন তাঁদের জন্যে যাঁরা শুচিশুভ্র হয়ে তবেই পাবেন তা দেখতে। মনে কলঙ্ক নিয়ে, বাঁ হাতে নিয়ে অপযশ, শনি-মঙ্গলে কালীঘাটে পাণ্ডাকে ঘুষ দিয়ে ছুঁয়ে আসবেন ৺মা কালী, তা হবেনা। শুচি আছে আপনারই কাছে, আপনারই হৃদয়ে। সত্যি সত্যি যদি আপনি নিজের মনেই শুচি হন, বলবেন, 'অনল' কথাটা কেন তাহলে? অনলে আর শুচিতে পার্থক্য নেই বিন্দুমাত্র একথা জানে অর্বাচীনেও। অগ্নি হল শুচিতার প্রতীক। অগ্নিতে পরিশুদ্ধা হলে সীতাকে গ্রহণ করেন রামচন্দ্র। অগ্নিতে পরিশুদ্ধ করে বহিরাগতদের ভারতভুক্ত ক'রে 'রাজপুত' আখ্যা দিয়েছেন ভারতীয়েরা। অগ্নির চাইতে আর

শুচি আছে কি? সুতরাং, অগ্নির স্থান আপনার পবিত্র বুকে। আপনার বুক যদি পবিত্র হয়, সেখানেই আছেন 'নারায়ণী'। নাহলে ভৈরব রূপে একা আছেন 'সংহার'। শুচিতীর্থ বড় তীর্থ সেখানেই করুন দেবী দর্শন। তবে যদি মানেন পাঁজিওয়ালাদের, তাহলে সামান্য একটা হদিশ পেতে পারেন এ-ব্যাপারে। ১৯৫০ সালের গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা, তাতে দেওয়া আছে শুচির নির্দেশ। শুচির বামভাগে আছে যমুনা নদী, দক্ষিণ দিকে আরেক স্রোতস্বিনী। কেউ কেউ বলেন এ স্রোতস্বিনী হল মেঘনা নদী। শুচিদেশ হল পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার ধারে কাছে, ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে। হাসনাবাদ থেকে নৌকো-যোগে দশক্রোশ দূরে মুকুন্দপুর, আছে শিববাড়ি ও নূরনগরের বড় বাজার, যেতে হয় সেখান থেকে। আর শুচিদেশকে যদি ধরে নেন 'অনল' বলে তাহলে ইতিহাসের কাছে পাবেন আর এক নির্দেশ। পশ্চিম ভারতের আহ্‌মেদাবাদ অঞ্চলে আছে নলহ্রদ। এখানেই হল 'অনল' পীঠ। পাঁজি বিশ্বাস করলে যান খুলনা জেলায়, ইতিহাস বিশ্বাস করলে আহ্‌মেদাবাদ! আমাকে যেতে দিন পীঠান্তরে।

আসুন, এবার ঘুরে আসি চতুস্ত্রিংশৎ পীঠস্থানে, সতীর দেহাংশ-পাতে যা নাকি তৈরি করেছে আর এক পুণ্যক্ষেত্র। পীঠনির্ণয়ে আছে :—

'অধোদন্তো মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চসাগরে ॥'

অর্থাৎ অধোদন্ত পড়েছে পঞ্চসাগরে। দেবীর নাম 'বারাহী' এবং ভৈরবের নাম 'মহারুদ্র'। কিন্তু…

অর্থাৎ পঞ্চসাগরেরও শুচির মত আছে নাকি কোন ইঙ্গিতার্থ? পঞ্চ-আত্মার কথা জানি বটে, খাবার আগে তাঁদের উদ্দেশ্যে গুনে গুনে ভাত দান করতে হয় পাঁচটি। কিন্তু পঞ্চসাগর? পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা জানি, কিন্তু পঞ্চসাগরের কথা শুনিনি অদ্যাবধি। শুনেছি প্রাচীন কালে লোকে জানতো চার সাগর, পরে হয়েছে সপ্তসাগর, কিন্তু পঞ্চসাগরের কথা শুনিনি কোনখানে। রামায়ণে শুনেছি পঞ্চবটি বনের কথা, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সে বন দেখেছি। মহাভারতে শুনেছি

পঞ্চপাণ্ডবের নাম, ছোটবেলায় কাশীরামদাসে পড়েছি। মহাসাগর দেখিনি একটিও চোখে। সাগর দেখেছি একটি মাত্র, আরব সাগর, আর যা দেখেছি সেটা উপসাগর'—Bay of Bengal। 'পঞ্চসাগর' সত্যি সত্যিই অপার বিস্ময়।

দুর্ধর্ষ পদব্রজী ভূপতিরঞ্জন দাস শুধু লিখে দিয়েছেন একটি কথা, —'পঞ্চসাগর'—গন্ধহীন এক কাঠটগরের মতো। অনুরোধ করলে বোধহয় অনায়াসে ঘুরে আসতে পারেন তিনি কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর, লোহিতসাগর, আরবসাগর এবং উত্তরসাগরের মত পঞ্চসমুদ্র, কিন্তু উপমহাদেশ ভারতবর্ষে পারেননা পঞ্চসাগরের স্থান করে দিতে। প্রয়োজন হলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন তিনি প্রশান্ত বা ভারত মহাসাগরে। কিন্তু পঞ্চসাগরের অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করার রসদ নেই তাঁরও কাছে। তাহলে ?

অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্রও দিতে পারেননি কোন নতুন ইঙ্গিত। সমস্ত জারিজুরি বাদ দিয়ে, মাষ্টার সা'বের গুড বয় হয়ে, বোধ হয় এই প্রথম তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস সহকারে অনুবাদ করে গেছেন পাঠনির্ণয়ের। যেমন, অন্নদামঙ্গলে বলেছেন ভারতচন্দ্র :

'পঞ্চসাগরেতে পড়ে অধোদন্তসার।
মহারুদ্র ভৈরব বারাহী দেবী তাঁর।।'

অর্থাৎ যাকে বলে কার্বন কপি। সুতরাং···

সুতরাং তীর্থপুণ্য যদি সঞ্চয় করতেই হয়, খুঁজে বের করতে হবে পঞ্চসাগরকে। কিন্তু পাব কোথায় এর সন্ধান? একমাত্র নিজের অন্তরের মধ্য ডুব দিলেই মিলতে পারে গোপন খবর। শুনেছি, সমস্ত চেতনা যখন লীন হয়ে যায় আত্মনেতে তখন বিশ্বরহস্যের কিছুই থাকেনা আর অজ্ঞাত। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সবই তখন স্পষ্ট হয়ে যায় দিনের আলোয়। কিন্তু আমার নেই সে ক্ষমতা। জাগ্রত চেতনায় সমাধিস্থ হওয়া? নৈব নৈব চ। নিবিড় নিদ্রাই আমার কপালে কদাচিৎ জুটে, তার উপর জেগে থেকে সমাধিস্থ হওয়া! সে দিল্লী দূর অস্ত্! অনেক দূরে। ভগবানকে বা ভগবৎলীলাকে কেন্দ্র করে কোন

তীর্থক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব আমার নিজের এলেমে। একমাত্র বইই ভরসা। পুস্তকম কেবলম। সুতরাং প্রাচীন ভূগোল নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন দেখা যাক এ-বিষয়ে তাঁদের অভিমত। পূর্ণ নামে যার পরিচয় অপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত নামে প্রতিভার প্রকাশ, তেমন এক ইতিহাসবেত্তা ডঃ ডি. সি. সরকার। তাঁর ধারণা—পঞ্চসাগর বাস্তবিকই নয় কোন সাগর। পাঁচটি আছে ছোট ছোট কুণ্ড পবিত্র তীর্থ হরিদ্বারের কাছে। এগুলিই সম্ভবতঃ 'পঞ্চসাগর'। কিন্তু তাতেও যে দেখা দিচ্ছে প্রশ্ন। পাঁচকুণ্ডে এক দন্তপাটি পড়বে কেমন করে? কিংবা উর্ধ ও অধোদন্ত পাটির দাঁতগুলো সব খুলে খুলে পড়েছিল ভাগ ভাগ হয়ে? কিংবা কোনকালের পাঁচটি কুণ্ড মিলেমিশে এখন গেছে একাকার হয়ে? আয়তন বেড়ে যাবার জন্য কুণ্ডকে এখন সাগর বলে? পাঁচকুণ্ড মিলে এই যে সাগর একেই বলে 'পঞ্চসাগর'? জানিনা সেকথা অদ্যাবধি। হরিদ্বার গিয়েছি পরপর তিনবার। কিন্তু 'পঞ্চসাগর' খুঁজবার সুযোগ হয়নি অজ্ঞতাবশতঃ। ভবিষ্যতে যদি কেউ যান, খবরটা রইল, খুঁজে দেখবেন। অবশ্যই খোঁজ করবেন পঞ্চসাগরের। সাত পাঁচ ভাববেন না, শুধুই ভাববেন পাঁচ, বৃহৎ অক্ষরে 'পঞ্চসাগর'।

তবে ইতিহাস যেখানে ব্যর্থ হয়েছে তন্ত্র দিয়েছে নতুন সন্ধান। তন্ত্রাচার্য সৌরেন্দ্র নাথ মৈত্র, থাকেন ১০৮।৩ বেলেঘাটা মেন রোডে, তিনি জানিয়েছেন যে, এ পীঠ আছে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে। গৌরীতন্ত্রের পরিশিষ্ট খণ্ডে উল্লেখ আছে পঞ্চসাগরের। গল্প আছে এই ধরনের:— বিরাট নাম্নী এক অভিশপ্তা দেবী 'দেবহ্রদতীর্থ' পরিবেষ্টন করে পূবদিকে আছেন বিরাজিতা। দিনরাত শোনা যায় এখানে সমুদ্র গর্জন। সেই জন্য পঞ্চহ্রদাকার এই তীর্থের নাম লোকে বলে 'পঞ্চসাগর'। এখানে ভূদারকুণ্ডের উপরে থাকেন 'বারাহী দেবী'। সুতরাং পঞ্চসাগর হল ওড়িশাতে।

পীঠনির্ণয়ের মতে পঞ্চত্রিংশৎ পীঠস্থান হচ্ছে করতোয়াতটে। উত্তরভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে যেমন গঙ্গা, তেমনই উত্তরবঙ্গে একদা পুণ্য-সলিলা ছিল করতোয়া। তিস্তা, কোশী আর মহানন্দা একদিন

ঘুমিয়ে ছিল এই করতোয়ার বুকেই। যদিও গায়ত্রী মন্ত্রে করতোয়ার নাম নেই, তবু করতোয়া পুণ্যতোয়া ছিল অনেক নদী থেকেই। মৎস্যনারী সদৃশ নদীদেবী কৌশিকী—একদা পূজা পেতেন সমগ্র দেশে, অর্থাৎ করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যাঞ্চলে সমস্ত ভূ-ভাগে। গল্পে আছে, দেবাদিদেব মহাদেবের করবারি ভূপাতিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল করতোয়া নদী। দেবাদিদেবের করবারি থেকে জন্ম বলেই ব্রহ্মা নাম রেখেছিলেন করতোয়া। স্কন্দপুরাণে করতোয়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে :

"করতোয়ে! সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠেতি বিশ্রুতে।"
হে করতোয়ে, তুমি সরিৎশ্রেষ্ঠা বলে বিশ্রুতা।
'পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে।'
'হর করোদ্ভবে তুমি প্রতিনিয়ত পৌণ্ড্রদেশকে প্লাবিত করছ, পাপ হরণ করছ।
'তত্তুল্য রূপসি নদী ন কাচিৎ।'
'তোমার তুল্য রূপবতী নদী নেই।'
'রজোবিহীনা তরুণী যতোসি, ধন্যাসি সবিদ্বরাসি।'
যেহেতু তুমি তরুণী হয়েও রজোবিহীনা, অতয়েব তুমি ' ধন্যা এবং পুণ্যা।
'শ্রীকণ্ঠ পাণি প্রভবে নমস্তে॥'
তোমাকে নমস্কার করি।

পীঠনির্ণয়ের মতে এই পুণ্যতোয়া করতোয়াতটেই কোথাও পড়েছিল সতীর বামকর্ণ, তল্প অথবা গুল্‌ফ। বলা হয়েছে :

"করতোয়াতটে তল্পং (কর্ণো) বামে বামন ভৈরব।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥"

অর্থাৎ পুণ্যতোয়া করতোয়াতটে যেখানে পড়েছে সতীর তল্প, (পৃষ্ঠদেশের মাংস) সেখানে দেবী হলেন 'অপর্ণা'। তাঁর বামে হলেন ভৈরব 'বামেশ'। স্রোতস্বিনী করতোয়া ব্রহ্মরূপিণী, মাহাত্ম্য প্রচার করছেন এই দেবীর।

করতোয়াতটের যে অংশে পড়েছে সতীর তল্প, গুল্‌ফ কিংবা বামকর্ণ, একদা নিবিড় অরণ্যাবৃত ছিল সে-অঞ্চল—পাবনা জেলার উত্তরে এবং বগুড়া জেলার দক্ষিণে, প্রায় একশত বর্গমাইল জুড়ে। স্বভাবতই অনুমান করা যেতে পারে—অরণ্যচারী অনার্য মানুষই ছিল এর অধিবাসী, সম্ভবতঃ নগ্ন জাতি। এবং তাদেরই উলঙ্গিনী দেবী হলেন—পর্ণদ্বারাও যিনি নন আচ্ছাদিতা, সেই অপর্ণা দেবী। অদ্যাবধি সেখানে দেবীর যা ভোগ, তা দেখে ধারণা, কালকেতু ব্যাধদেরই আরাধ্যা তিনি, নইলে প্রতিদিন ছাগমাংস আর তালবড়া খাবার সখ হবার কথা নয় কোন আর্যদেবীর এবং সেই জন্যই মনে হয়, সতীকে কেন্দ্র করে একীকরণ গল্পে—অনার্য অপর্ণাদেবী হয়েছেন আদ্যাশক্তি। অনার্য মৎস্যদেশ আজ হয়েছে আর্য শাক্তদের পুণ্যভূমি, পীঠক্ষেত্র। পুণ্যক্ষেত্র নির্ণয় যেমন হয়েছে তেমনই হয়েছে নির্দিষ্ট স্থাননির্দেশও অপর্ণা দেবীর। একদা অরণ্যাবৃত এই পুণ্যভুমি আজ পড়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের বগুড়া জেলার ভবানীপুর গ্রামে। সেই কারণেই অপর্ণা এখানে পরিচিতা সাধারণত 'ভবানী' নামে। দেবীর দেহাংশ তো শিলীভুত। নিজের কোন মূর্তি নেই। তবু অর্বাচীন কোন মূর্তি না থাকলে ভক্তজনের হয় না ভিড়। তাই আছে হাত দেড়েক এক কালী মূর্তি। সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত বস্ত্রে বস্ত্রে। শুধু সোনার তৈরী মুখ দর্শনীয়। তবে লোকের বিশ্বাস, যিনি যেমন ভাবে দেখতে চান তেমন ভাবেই দর্শন পান এ ৺মায়ের।

লোকের বিশ্বাস, এ-মহাপীঠের উৎপত্তি হল সত্যযুগে। আপনার যদি বিশ্বাস থাকে শাস্ত্রবাক্যে, শাস্ত্রে যা আছে তাই মেনে নেবার থাকে মানসিকতা, তাহলে ধরে নিতে পারেন, অপর্ণাও আছেন এ অঞ্চলে সেই প্রথম থেকেই। তবে ছিলেন না ভবানীপুরে, সর্বপ্রথম ছিলেন গুল্‌ফাপুরীতে।

কা'রো মতে সতীর গুল্‌ফ পড়েছিল করতোয়াতটের অরণ্য অঞ্চলে। সেজন্য এর নাম ছিল এক সময়ে গুল্‌ফাপুরী। মহাভারতেও ইঙ্গিত আছে গুল্‌ফাপুরীর। দ্বাপরের শেষে গুল্‌ফাপুরীর শ্রীবৃদ্ধি

ঘটিয়েছিলেন শক্তি উপাসক পৌণ্ড্রপতি বাসুদেব। করতোয়াতটে একসময় কমলপুর নামে গড়ে উঠেছিল এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। বঙ্গদেশের সেন রাজাদের এক জ্ঞাতিবংশ শাসন করতেন এখানে। ভাগ্যবিপাকে যবনদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায় এ জনপদ। কোন এক মহাপুরুষ ৺মাকে তখন লুকিয়ে রেখেছিলেন মাটির গহ্বরে। সেখান থেকে তুলে এনে দেবীকে বসানো হয় ভবানীপুরে। সেও প্রায় ছ'শ বছর আগের কথা। ভবানীপুরের নৈঋ'ত কোণে, মাইল পাঁচেক দূরে, আজো আছে সেই গুল্‌ফাপুরীর ভগ্নাবশেষ। দেবীকে নতুন করে স্থাপন করা হয় ভবানীপুরে, সে-জন্যই শাস্ত্র বর্ণনার সঙ্গে দেবীর অধিষ্ঠানের মিল নেই বর্তমানে। শাস্ত্রে আছে, ভৈরব 'বামেশ' থাকবেন দেবীর বামে, কিন্তু এখানে তা ভিন্নরকম।

নানা গল্প আছে অপর্ণাকে নিয়ে। প্রায় দেড়শ বছর অন্তরালে থাকার পর যে-ভাবে তিনি আবার এসেছিলেন লোকচক্ষুর গোচরে, সে সবই হল মনোরম কাহিনীর প্রসাদপুষ্ট। করতোয়াতটে শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা নিয়ে দেবী ভক্তজনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অস্তিত্বের কথা। করতোয়ার বুক থেকে হাত তুলে ভক্তজনকে দেখিয়েছিলেন যে, তিনি আছেন। একটা গাভীন গরু অরণ্যের ভিতর মৃত্তিকাতে বর্ষণ করতো দুধ। তা দেখেই ভূগর্ভে নতুন করে আবিষ্কার করা হয় সতীর অঙ্গ।

জগজ্জননী যেখানে তাঁর শাঁখা দেখিয়েছিলেন ভক্তজনকে, আজ সেই পুণ্যতোয়া করতোয়া নেই সেখানে। করতোয়া মজে গেছে। সেই শাঁখার চিহ্ন বহন করবার জন্য সেখানে শুধু খনন করে রাখা হয়েছে একটি পুষ্করিণী। মন্দির প্রাঙ্গনে গেলে পরে আজো ভক্তজনেরা সেই পুষ্করিণী দেখাবেন আপনাকে।

অপর্ণাকে দেখতে গেলে আজ দেখবেন ভবানীকে। 'অপর্ণা' আজ রূপান্তরিতা হয়েছেন 'ভবানীতে'। তার পেছনেও আছে ইতিহাস। আকবর তখন দিল্লীশ্বর। টোডরমল আর মানসিংহ বাংলাদেশে আনলেন শান্তি। রাজশাহী জেলার সাঁতৈল গ্রামের রামকৃষ্ণ রায়,

আপন শ্রম আর অধ্যবসায়ে সে সময় হলেন ভাতুরিয়া ইত্যাদি আটটি বড় বড় পরগণার অধিপতি। আকবরের কাছ থেকে পেলেন 'রাজা' উপাধি। দেবী অপর্ণার মন্দির তৈরি করার জন্য বাদশার কাছ থেকে পেলেন সনদ। সেই সনদে দেবীর থানের উল্লেখ হল 'ভবানী থান' নামে। নতুন করে অধিষ্ঠিতা হলেন দেবী, 'ভবানী' নামে। দেবীর জন্য রামকৃষ্ণ রায় যে নতুন মন্দির তৈরি করেছিলেন, এখন নেই সে মন্দির। ভেঙ্গে পড়ে ১২৯২ বঙ্গাব্দের ভূমিকম্পে। গল্প আছে, নতুন বাঙ্গালা হয়েছিল এত মনোরম যে, লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো সেই বাঙ্গালাকে। ৺মায়ের তাতে বড় দুঃখ। রাজাকে স্বপ্ন দিয়ে বললেন, 'তোর নক্সার বাঙ্গালাতে লোকে আমাকে দেখেনা, দেখে তোর নক্সাকে। আমাকে পুরানো জোড়বাঙ্গালায় রেখে আয়।' স্বপ্ন পেয়ে রাজা তাঁকে রেখে আসেন পুরানো বাঙ্গালায়।

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই অজস্র শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন জগন্মাতা সেই মোগলআমল থেকে। আজ একটি পাকা মন্দিরে ভবানী মা অধিষ্ঠিতা। মন্দিরের সামনে আটচালা এক নাটমন্দির। তার পশ্চিমে ভৈরব বামেশের পাকা মন্দির। আরো কিছু মন্দির আছে আশেপাশে। যেমন, ভবানীশ্বর শিবের মন্দির, ইত্যাদি। অবশ্য সবই প্রায় ভগ্ন বা অর্ধভগ্ন। কাছেই আছে দু-একটা সাধনপীঠ। সব মিলিয়ে এখনও আছে একটা অতীন্দ্রিয় পরিবেশ। কাছে গেলে শুনতে পাবেন মধ্য যুগ থেকে বয়ে আসা অলৌকিক নানা গল্প। তখন সত্যি সত্যিই মনে হবে, সতীর কাহিনী মিথ্যে নয়। জগজ্জননী দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হয়ে।

সর্ব ঐশ্বর্যময়ী এই জগন্মাতা, দান করেন চতুর্বর্গ ফল। মোক্ষদাত্রীও বটেন তিনি। সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য এবং কৈবল্য, এই হল পাঁচ রকমের মোক্ষ। দেবীর সঙ্গে একই লোকে বাস করলে হয় 'সালোক্য'। তাঁর তুল্য রূপ হলে হয় 'সারূপ্য'। তাঁর তুল্য ঐশ্বর্যশালী হলে হয় 'সার্ষ্টি'। দেবীর দেহে প্রবেশ করে বিষয় ভোগ করার নাম 'সাযুজ্য'। মহামুক্তির নাম হল 'কৈবল্য'। যে যেরকম প্রার্থনা করেন

এই দেবীর কাছে, দেবী তাকে দান করেন সেইরকম। সিদ্ধিপ্রদায়িনী এই দেবীর কাছে আপনার যদি হয় যাবার ইচ্ছে, তাহলে অনুমোদন পত্র নিন বাংলাদেশ সরকারের। বগুড়া স্টেশন থেকে শেরপুরের মধ্য দিয়ে ২৮ কিলোমিটার দূরে হল ভবানীপুর। একদিন ছিল আমাদের অত্যন্ত আপন এবং খুবই কাছের। আজও নয় বহু দূরে, শুধু রাজনীতি একটা পার্থক্যের দেয়াল তুলে দিয়েছে, এই যা। ইচ্ছে করলে আপনি এখনও যেতে পারেন পুণ্যের কোঠা ভারি করতে।

ষট্‌ত্রিংশৎ শাক্তপীঠ হল শ্রীপর্বতে। পীঠনির্ণয়ে বর্ণনা আছে এই ধরনের :

'শ্রীপর্বতে দক্ষগুল্‌ফ স্তত্র শ্রীসুন্দরীপরা।
সর্বসিদ্ধিশ্বরী সর্বা সুন্দরানন্দ ভৈরবঃ ॥'

অর্থাৎ শ্রীপর্বতে পড়েছে দক্ষিণ পায়ের গোড়ালি। দেবীর নাম সেখানে 'শ্রীসুন্দরী'। তিনি হলেন সর্বসিদ্ধিশ্বরী, অর্থাৎ সর্বসিদ্ধি দান-কর্ত্রী। ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ আছে 'সিদ্ধেশ্বরী' বা 'সিদ্ধিকরী' বলে। মনে হয় পরের উচ্চারণই ব্যাকরণের দিক থেকে শুদ্ধ। সে যাই হোক, অর্থ স্পষ্ট সর্বত্রই। অর্থাৎ শ্রীপর্বতের দেবী 'শ্রীসুন্দরী,' তিনি হলেন সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িণী, আর তাঁর ভৈরব হলেন 'সুন্দরানন্দ'।

ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে দিয়েছেন একটু ভিন্নধরনের বর্ণনা। তাতে ভৈরব এবং দেবীর নাম প্রায় একই। স্থানের নামও সমান। শুধু দেবীর দেহের অংশ একটু ভিন্নরকম। যেমন, ভারতচন্দ্র দিয়েছেন এই ধরনের বর্ণনা :

"শ্রীপর্বতে ডানিকর্ণ ফেলিলেন হরি।
ভৈরব সুন্দরানন্দ দেবতা সুন্দরী ।।

কর্ণই পড়ুক আর গুল্‌ফই পড়ুক সেটা নয় বড় কথা, সমস্যা যেটা বড় সেটা হল স্থান নিয়ে। কোথায় সেই শ্রীপর্বত, যেখানে যেতে পারেন ভক্তেরা ? পূজা দিতে পারেন দেবীকে, ভক্তি জানাতে পারেন ভৈরবকে ? দক্ষিণ-ভারতে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে আছে নল্লমলুর পর্বতশ্রেণী। সেখানে আছে শ্রীশৈল বলে একটি পর্বত, অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলম। কিন্তু

শিবের নাম সেখানে 'মল্লিকার্জ্জুন' আর দেবীর নাম 'ভ্রমরাম্বা'। পীঠনির্ণয়ে মল্লিকার্জ্জুনের পরিবর্তে আছে 'সুন্দরানন্দে'র নাম আর 'ভ্রমরাম্বা'র পরিবর্তে 'শ্রীসুন্দরীর'। সুতরাং শ্রীপর্বত সম্ভবতঃ নয় শ্রীশৈলম। অবশ্য শ্রীশৈলম যে একটি শাক্তপীঠ সে বিষয়ে নেই সন্দেহ। কারণ, ভ্রমণবিদ্ বীরেন্দ্রনাথ সরকার, যিনি 'রহস্যময় রূপকুণ্ডে'র লেখক হিসেবে ইতিমধ্যেই করেছেন খ্যাতি অর্জন, তিনি দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়ে ভ্রমরাম্বার মন্দিরের সামনে দেখে এসেছেন তন্ত্রের যন্ত্র। সেই যন্ত্রে সাধনরত দু'জন তান্ত্রিককে জিজ্ঞেস করে পেরেছেন জানতে যে, শ্রীশৈলম হল একান্নপীঠের এক পীঠ। কিন্তু পীঠনির্ণয়ের দেবী ও ভৈরবের সঙ্গে শ্রাশৈলমের দেবী ও ভৈরবের নামের নেই মিল। তাহলে? কোন্ শাস্ত্রগ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীশৈলম একান্নপীঠের এক পীঠ? সমস্যা সত্যি সত্যি গুরুতর।

ভ্রমণে অভিজ্ঞ ভূপতিরঞ্জন দাস, তিনি আমাকে দিয়েছেন পরিবর্ত একটি নাম। শ্রীপর্বত হল হিমালয়ের উপরে লাডাকে। প্রবাদ আছে, সেখানেও পড়েছে দেবীর দক্ষিণ গুল্‌ফ। দেবীর নান 'শ্রীসুন্দরী' বা 'সুনন্দা'। ভৈরবের নাম 'নন্দ'। মানালী থেকে লেহ রোড ধরে যান কেলং-এ। সেখান থেকে যেতে পারেন শ্রীপর্বতে। কিংবা কাশ্মীর গিয়ে শ্রীনগর, সেখান থেকে লাডাক হয়ে শ্রীপর্বত। যদি আপনার বিশ্বাস হয়—লাডাক নয়, শ্রীপর্বত হল অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলম্, তাহলে চলে যান গুণ্টুরে। সেখান থেকে বাসে করে শ্রীপর্বতে। তন্ত্রচার্য সৌরেন মৈত্র, যাঁর কথা বলেছি আরও দু'বার, তিনি দিয়েছেন ভিন্ন রকম স্থাননির্দেশ। তাঁর মতে ওড়িশায় ময়ূরভঞ্জের সিমলিপাল পর্বতের মধ্যে সুন্দরীকুণ্ডে আছে এই স্থান। গৌরীতন্ত্রেও আছে এর উল্লেখ, যেমন: 'উড্ডীয়ান মহাপীঠে দেবী ত্রিপুরসুন্দরী, কুণ্ডাকৃতি-মহারণ্যে পরমামৃত বিগ্রহা'॥ ইত্যাদি। ইচ্ছা হলে যেতে পারেন ওড়িশার ময়ুরভঞ্জেও।

পীঠনির্ণয়ের মতে সপ্তত্রিংশৎ শাক্তপীঠ হল বিভাষ-এ। পীঠনির্ণয়ে আছে এই ধরনের বর্ণনা:

"কপালিনী ভীমরূপা বামগুল্‌ফো বিভাষকে।
ভৈরবশ্চ মহাদেব সর্বানন্দঃ শুভপ্রদঃ।"

অর্থাৎ দেবীর বামগুল্‌ফ পড়েছে বিভাষ-এ। দেবীর নাম 'ভীমরূপা' বা 'কপালিনী'। ভৈরবের নাম 'সর্বানন্দ'। ভিন্নমতে দেবীর আর এক নাম 'চন্দ্রভাগা,' ভৈরবের নাম 'কপালী' বা 'বক্রতুণ্ড'।

ভারতচন্দ্র দিয়েছেন এই ধরনের বর্ণনা, যেমন:

"বিভাষেতে বামগুল্‌ফ ফেলিলা কেশব।
ভীমরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব।।"

পীঠনির্ণয়ের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বর্ণনার এবার প্রায় সবটাতেই আছে মিল। শুধু পীঠনির্ণয়ে ভৈরবের নাম 'সর্বানন্দ' আর ভারতচন্দ্রে 'কপালী'। এবারও প্রশ্ন দেবী বা ভৈরবের নাম নিয়ে নয়, বা নয় সতীর দেহাংশ নিয়েও, প্রশ্ন শুধু স্থান নিয়ে। কোথায় সেই বিভাষ, যেখানে গেলে দেবী বা ভৈরবকে জানাতে পারি শ্রদ্ধা?

যিনি ইতিহাসবেত্তা, তাঁর ধারণা, বিভাষ হল আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই। মেদিনীপুর জেলার তমলুকে, অর্থাৎ তমলুকের কাছে। যিনি স্বয়ং ঘুরে এসেছেন পদব্রজে, সেই ভ্রমণের সুলতান মামুদেরও অভিমত একই, অর্থাৎ বিভাষ পীঠ হল তমলুকে। তবে দেবীর নাম 'ভীমরূপা' হলেও অনেকেই বলে, 'বর্গভীমা'। যদি যাবার ইচ্ছা থাকে বিভাষে, ইচ্ছা থাকে পুণ্য সঞ্চয়ের, তাহলে হাওড়া থেকে ট্রেনে যান মেচেদা, সেখান থেকে বাসে করে লক্ষ্যস্থলে, কিংবা পাঁশকুড়া থেকে ট্রেনে চলে যান বরাবর তমলুক। উঁচু একটা ভিতের উপর মন্দির। এক সময় মন্দিরের পেছনে প্রবাহিত ছিল খরস্রোত রূপনারায়ণ। এখন নদী সরে গেছে বহুদূরে। নদীর বদলে রয়েছে আধমাইল বিস্তৃত জলাভূমি। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে সতীর বাঁ পায়ের গোড়ালী পড়েছিল এখানে। দেবীর উপস্থিতি যে এখানে কতকাল ধরে কেউ পারে না তা বলতে। প্রাচীন কালের বণিকেরা সমুদ্রযাত্রা করবার আগে এই দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে তবে বাণিজ্য তরী ভাসাতেন কূল কিনারাহীন সমুদ্রে। মন্দিরের দেবীকে কেউ বলেছেন

'ভীমরূপা' কেউবা 'বর্গভীমা'। লোকপ্রবাদ, বাংলার সুলতান সুলেমান কর্‌রানীর সেনাপতি কালাপাহাড় কলিঙ্গ আক্রমণ করার পথে এসেছিলেন তাম্রলিপ্ত। তাঁকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যায় হিন্দুরা। মন্দিরের দরজা খোলা রেখেই পলায়ন করে পুরোহিতেরা। কালাপাহাড় মন্দিরে ঢুকে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করেন মূর্তিটিকে। কিন্তু আশ্চর্য দৃশ্য দেখে থম্‌কে দাঁড়ান তিনি। দেখেন, মন্দিরের বেদীতে দাঁড়িয়ে দেবী নন রয়েছেন তাঁর গর্ভধারিনী মা। তিনি বলেন, রাজু ফিরে যা। কালাপাহাড়ের ডাকনাম ছিল রাজু। মায়ের কথা শিরোধার্য করে ফিরে যান কালাপাহাড়। কালোপাথরের গড়া অষ্টভূজা দেবী মূর্তি। এক জেলের ঘরে নাকি পাওয়া গিয়েছিল এই মূর্তি। পণ্ডিতদের ধারণা, তমলুকের আদি জনগোষ্ঠীর আরাধ্যা দেবী এই বর্গভীমা। মূর্তিতে আছে বৌদ্ধ উগ্রতারার ছাপ। বৌদ্ধধর্মে মূর্তি এসেছে আদি তন্ত্রমতের প্রভাবের ফলে। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মাতৃপূজার এসেছিল এক নতুন পদ্ধতি। উর্বরা শক্তির সঙ্গে যুক্ত মাতৃপূজা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু তুকৃতাক্, যাকে পরবর্তীকালে বলা হত তন্ত্র। সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত হয়েছিল এই তন্ত্রদ্বারা। এ থেকেই সৃষ্টি পূর্বভারতের বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মই গৌতমবুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করেছে স্ত্রীমূর্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই স্ত্রীমূর্তি পরিচিত 'তারা' নামে। 'তারা', এর অর্থ যিনি তারণ করেন। সেই আদি জনগোষ্ঠীর তুকৃতাক্ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মেও পড়েছে তন্ত্রের প্রভাব। এই তন্ত্র থেকেই এসেছে শাক্ত মতবাদ, শক্তি পূজার ব্যবস্থা। হিন্দু পুরুষদেবতাও এর প্রভাবে যুক্ত হয়েছেন স্ত্রীদেবতার সঙ্গে। এ-সময় মুখ্যতঃ বিষ্ণু ও শিব ছিলেন হিন্দুদের দুই প্রধান দেবতা। বিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন লক্ষ্মী এবং শিবের সঙ্গে পার্বতী, কালী, দুর্গা ইত্যাদি। 'বর্গভীমা' আদি জনগোষ্ঠীর উর্বরা শক্তির দেবী, না বৌদ্ধ-তন্ত্রের উগ্রতারা বা হিন্দুদের কালী-দুর্গার কেউ, সেটা এখন বিচার্য পণ্ডিতদের। তবে ভক্তজনের কাছে তিনি এখন অলৌকিক ক্ষমতার

অধিশ্বরী ৺মা। আদি জনগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে এখনও এ দেবীর মধ্যে। দেবীর ভোগে নিত্যদিন প্রয়োজন মাছের। সোল মাছই প্রশস্ত। মন্দিরের ডান দিকে আছে পুকুর। খেপ্‌লা জাল ফেলে দেবীর জন্য রোজ মাছ ধরা হয় এখানে থেকে।

পীঠনির্ণয়ের মতে অষ্টত্রিংশৎ পীঠস্থান হল প্রভাসে। এ-সম্পর্কে পীঠনির্ণয়ের যে বর্ণনা, তা-হল এই রকম, যেমন:

উদরশ্চ (-বা অধরশ্চ) প্রভাসে মে (বা প্রভাস মে)
চন্দ্রভাগা যশস্বিণী।
বক্রতুণ্ডো ভৈরব...”

অর্থাৎ উদর বা অধর পড়েছে প্রভাসে। দেবীর নাম 'চন্দ্রভাগা,' ভৈরবের নাম 'বক্রতুণ্ড'। ভারতচন্দ্রও দিয়েছেন প্রায় একই ধরনের বর্ণনা। শুধু দেবীর দেহাংশ বর্ণনা সম্পর্কে ভিন্নমত, যেমন, 'উদর' না বলে তিনি বলেছেন শুধু 'অধর'। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা এই রকম:

প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে।
বক্রতুণ্ড ভৈরব, প্রত্যক্ষ রূপ যাহে॥”

সুতরাং খুব একটা সমস্যা নেই অষ্টত্রিংশৎ পীঠ নিয়ে। স্থান নির্ণয় হলে—আপনি বা আমি যে-কোন সময় পারি যেতে। শাক্তপীঠের পুণ্য সঞ্চয় হতে পারে যখন তখন। কিন্তু কোথায় প্রভাস, সেটাই হল বড় কথা।

'গয়া-গঙ্গা প্রভাসাদি' গানের কলিতেই এদের সঙ্গে পরিচয়। হিন্দুর জীবনের সঙ্গে গয়া-গঙ্গার মত প্রভাসেরও একটা নাড়ির যোগ। সুতরাং প্রভাস নিয়ে সমস্যা নেই। সবাই জানে প্রভাসের কথা। 'প্রভাসখণ্ড' পাঠ করে গ্রাম গঞ্জের মানুষেরা আজ পর্যন্ত। তরজার লড়াইয়ে প্রভাসের নাম শোনা যায় বহুবার। প্রভাসই হল সেই বিখ্যাত সোমনাথ, যেখানে শিবমন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন সুলতান মামুদ। 'সোমনাথ' নাম বললেই সেখানে যায় যাওয়া। ভূগোলের ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই যে, দক্ষিণ কাথিয়াবারে আছে সোমনাথ। কাথিয়াবারের ভেরাবল রেলষ্টেশন থেকে মাত্র চার কিলোমিটার পথ।

এগিয়ে গেলেই পাবেন প্রভাসপত্তন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানেই দেহত্যাগ করে স্থানের মাহাত্ম্য গেছেন বাড়িয়ে। তিনটি নদীর সঙ্গমে, এখানেই সেই দেবীর মন্দির, চন্দ্রভাগার। গিয়ে পড়লে থাকার ভাবনা নেই তেমন। সোমনাথ বা ভেরাবলে আছে ধর্মশালা। যদি ইচ্ছে হয় হোটেলে গিয়েও উঠতে পারেন, পুণ্যার্থীদের জন্ম হোটেলের ব্যবস্থাও আছে এখানে। তবে ১৯৫০ সালের গুপ্তপ্রেস পাঁজির মতে প্রভাস হল মথুরাতীর্থে। বৃন্দাবন পরিভ্রমণকালে ভক্তজনেরা করেন পরিদর্শন। ভক্তজন যদি মানতে চান পাঁজির নির্দেশ, তাহলে তাঁরা যেতে পারেন মথুরাতেও।

পীঠনির্ণয়ের মতে উনচত্বারিংশৎ শাক্তপীঠ হল ভৈরব পর্বতে। বলা হয়েছে :

'…ঔর্দ্ধোষ্ঠো ভৈরব পর্বতে।
অবন্তী চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ॥"

অর্থাৎ উর্ধ ওষ্ঠ পড়েছে ভৈরব পর্বতে। দেবীর নাম অবন্তী, ভৈরবের নাম লম্বকর্ণ। ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে অবশ্য আছে বর্ণনার একটু ব্যতিক্রম। যেমন, কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে 'ওষ্ঠো ভৈরবপর্বতে', কোথাও 'ওর্দ্ধোষ্ঠং ভীরূপর্বতে', কোথাও বা আছে 'তুণ্ড ভৈরবপর্বতে', কোথাও বা 'তুণ্ডো ভৈরব' ইত্যাদি। কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি প্রথম বর্ণনাই। ভারতচন্দ্রেও আছে সামান্য বর্ণনান্তর। যেমন, অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র বলেছেন—

"ভৈরব পর্বতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রঘায়।
নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায়॥"

অর্থাৎ, ভারতচন্দ্র বলতে চান, পীঠবর্ণনায় যেখানে আছে 'লম্বকর্ণস্তু ভৈরব' সেখানে হবে 'নম্রকর্ণস্তু ভৈরব'। কিন্তু বর্ণনান্তর যা-ই হোক না কেন, সমস্যা নয় তাতে। সমস্যা হল স্থান নির্ণয়ে। ভৈরব পর্বত কোথায়? দেবীর নাম 'অবন্তা'—তা দেখে মনে হয়, মালবের কোথাও হবে ভৈরব পর্বত। কারণ অবন্তী আছে মালবে। এ-বিষয়ে পদব্রজে ভ্রমণে যাঁর অভিজ্ঞতা বেশী সেই ভূপতিরঞ্জন দাস, তিনি নিজে হাতে

লিখে জানিয়েছেন আমাকে, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরে শিপ্রা নদীর তীরে আছে ভৈরব পর্বত। সেই পর্বতের উপরে আছে দেবীর পীঠ। প্রাচীন নাম 'অবন্তী'। তবে পীঠনির্ণয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীর সামান্য আছে বর্ণনাভেদ। দেবীর নাম 'অবন্তী' না বলে তিনি বলেছেন 'মহাদেবী'। তবে ভৈরবের নাম যথাযথ, 'লম্বকর্ণ'। উজ্জয়িনীর নাম করে গাড়িতে চাপুন। ভৈরব পর্বতে যাওয়ায় কষ্ট নেই। শহরে আছে নানা হোটেল। ধর্মশালাও আছে বেশ কিছু। সুতরাং যদি ইচ্ছে থাকে পুণ্যসঞ্চয়ে, তাহলে বেরিয়ে পড়তে পারেন নির্দ্বিধায়।

এবার চলুন নতুন পীঠে, চত্বারিংশৎ পীঠস্থানে। পীঠনির্ণয়ের মতে নতুন পীঠ হল 'জলেস্থলে' বা 'জনস্থানে'। এ-পীঠ সম্পর্কে বর্ণনা হল এই রকম :

"চিবুকে ভ্রামরী দেবী বিকৃতাক্ষো জলেস্থলে।"

অর্থাৎ 'জলেস্থলে' পড়েছে সতীর চিবুক। দেবীর নাম 'ভ্রামরী', ভৈরবের নাম 'বিকৃতাক্ষ'। তবে পাণ্ডুলিপিভেদে আবার আছে বর্ণনান্তরও। ভারতচন্দ্রেও সামান্য ভেদ আছে বর্ণনায়। যেমন, অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র বলেছেন এই কথা :

"জনস্থানে চিবুক পড়িল অভিরাম।
বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবী নাম॥"

অর্থাৎ 'জলেস্থলে' না বলে ভারতচন্দ্র স্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'জনস্থানের'। অন্ততঃ ভেবেচিন্তে মনে হয়, 'জলেস্থলে' হতে পারে না কোন নাম, স্থানের নাম 'জনস্থান'। কিন্তু ভৌগোলিক স্থাননির্দেশ না হলে জনস্থানেই বা কোথায় যাবেন? জনস্থানেরও চাই স্থান নির্ণয়।

মনে করুন বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর সেই পাঠশালা। অপু পড়ছে গুরুমশায়ের কাছে। ছন্দোবদ্ধ বাক্য একটি—: এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি'···ইত্যাদি। অপুর মন উড়ে চলেছে নতুন দেশে—যে দেশের সে ঠিকানা জানেনা কোন ভূগোলে। শুধু মনের চক্ষে দেখতে পাচ্ছে অপূর্ব এক নিসর্গরূপ, যে নিসর্গ তুলনাহীন। অপুর চোখে যা অনির্দিষ্ট, ইতিহাস আর ভূগোলের চোখে সে 'জনস্থান'

আজ নির্দেশিত। ঊর্ধ্ব গোদাবরী উপত্যকায়, যে-স্থানে আজ নাসিক অঞ্চল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে, সেখানেই হল জনস্থান। আমাদের পদব্রজী ভ্রমণবিদ হদিশ পাননি এ-শাক্তপীঠের। তবে লোকের মুখে শুনে তাঁর ধারণা, 'জলেস্থলে' হল ত্রিস্রোতা, যার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করেছি অনেক আগেই। আমার ধারণা, অপুর চোখের সেই রোমাঞ্চময় দেশেই আছেন 'ভ্রামরী' দেবী। 'বিকৃতাক্ষ' ভৈরবও আছেন সেখানেই। সুতরাং জনস্থানের সেই প্রকৃতিতে, যেখানে সীতা পেয়েছিলেন অপার বিস্ময়, ইদানিংকালে অপু পেয়েছিল রোমাঞ্চ, সেখানে আপনিও পাবেন অনেক কিছু। এবং সেই সঙ্গে তীর্থ-পুণ্য। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, ১৯৫০ সাল, সেখানে জনস্থানের বর্ণনা আছে এইরকম, যেমন, খান্দেশ প্রদেশের অন্তর্গত হল জনস্থান। হাওড়া থেকে নাইনি হয়ে যান খাণ্ডোয়া, সেখান থেকে জলগাঁও স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে—দক্ষিণে। লাইন থেকে দুতিন মাইল হেঁটে নদীতীরে তীর্থস্থান।

পীঠনির্ণয়ের মতে একচত্বারিংশৎ শাক্তপীঠ হল গোদাবরী তীরে। এ সম্পর্কে তার নিজের বর্ণনা হল এই রকম :

'গণ্ড গোদাবরী তীরে বিশ্বেশী বিশ্বমাতৃকা।
দণ্ডপাণি ভৈরবস্তু··· ॥"

অর্থাৎ গোদাবরী তীরে পড়েছে সতীর গণ্ড। দেবী 'বিশ্বেশী', ভৈরবের নাম 'দণ্ডপাণি'। এ প্রসঙ্গে আর একটু বেশীও বলা আছে পীঠনির্ণয়ে যেমন :

'···বামগণ্ডে তু রাকিণী।
ভৈরবো বৎস্যনাভস্তু তত্র সিদ্ধির্নসংশয়ঃ!"

অর্থাৎ এখানে পড়েছিলো সতীর বামগণ্ড। দেবীর নাম 'রাকিণী', ভৈরবের নাম 'বৎস্যনাভ'।

গোদাবরী শাক্ততীর্থ সম্পর্কে ভারতচন্দ্র নীরব একেবারে। কোন বর্ণনান্তর মন্তব্যও করেননি তিনি এখানে। তবে গোদাবরীর নাম আমাদের পরিচিত। সুতরাং স্থাননির্ণয়ে নেই সমস্যা। শুধুমাত্র

যথাযথ স্থান নিয়েই যা প্রশ্ন। হারা উদ্দেশ্যে খোঁজা যায় না সমস্ত গোদাবরী তীর। নির্দিষ্ট স্থান প্রয়োজন। এ-সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া গেছে ভূপতিরঞ্জন দাসের কাছ থেকে। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহেন্দ্রী জেলায় পাবেন এ-পীঠের সন্ধান। রাজমহেন্দ্রী স্টেশনে নেমে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন নির্দিষ্ট স্থান। সেখান থেকে আঞ্চলিক যান-বাহনে চলে যান স্থানীয় লোকের নির্দেশে। এগিয়ে গেলেই পাবেন দেবী 'বিশ্বমাতৃকা' এবং ভৈরব 'দণ্ডপাণিকে'। ১৯৫০ সালের গুপ্তপ্রেস পাঁজিতেও এ পীঠে যাবার নির্দেশ আছে স্পষ্ট করে। বি. বিন. আর লাইনে হাওড়া থেকে ৬৭৭ মাইল। স্টেশন হল গোদাবরী। এখানে আছে দুটি পীঠ ও পীঠদেবী। পাঁজির নির্দেশও পারেন অনুসরণ করতে।

এর পর নতুন তীর্থের দিকে এগিয়ে চলুন, নতুন শাক্তপীঠের সন্ধানে। পীঠনির্ণয়ে নতুন শাক্তপীঠ হল রত্নাবলী। দ্বাচত্বারিংশৎ শাক্তপীঠ। এ-সম্পর্কে বর্ণনা হল এই রকম :

'রত্নবল্যাং (রত্নবত্যাং) দক্ষস্কন্ধ কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ।'

অর্থাৎ রত্নাবলীতে পড়েছে সতীর দক্ষিণ স্কন্ধ। দেবীর নাম 'কুমারী' এবং ভৈরবের নাম 'শিব'। মতান্তরে কেউ বা বলেছেন স্থানের নাম 'রত্নাবতী', দেবীর নাম 'শিবা' এবং ভৈরবের নাম 'কুমার'।

ভারতচন্দ্র আবার মুখ খুলেছেন রত্নাবলীর ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন :

"রত্নাবলী স্থানে ডানিস্কন্ধ অভিরাম।
কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম॥"

ভারতচন্দ্র স্থান বর্ণনায় পীঠনির্ণয়ের সঙ্গে একমত হলেও দেবীর নাম ও ভৈরবের নাম বর্ণনায় ভিন্নমত। তবে সেটা কোন সমস্যা নয়, যদি পাওয়া যায় স্থানের নিশানা। নির্দিষ্ট স্থানে গেলেই জানা যাবে, কে ভৈরব আর কেইবা দেবী। সুতরাং রত্নাবলী কোথায় আগে দেখা যাক তাই।

ঐতিহাসিকের ধারণা, রত্নাবলী আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই। কাব্য

মীমাংসাতে 'রাত্নাবতী' নামে আছেএকটি শহরের নাম। সম্ভবতঃ হুগলী জেলায় রত্নাকর নদীর ধারে। খানাকুল কৃষ্ণনগরই হল সেই স্থান। এখানে আছে বিখ্যাত এক শিবের মন্দির। যার নাম 'ঘণ্টেশ্বর শিব'। তবে রত্নাবলীতে শুধু শিব নন, আছেন দেবীও। সুতরাং সেই জন্যই ঝঞ্ঝাট। সতেরবার পদব্রজী ভুপতিরঞ্জন দাসের মতে হুগলী জেলার রত্নাকর নদীতটেই হবে এ-স্থান। এখানে ঘণ্টেশ্বর শিবের মহালিঙ্গাষ্টক তন্ত্রে আছে এই ধরনের বন্দনা :

'ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশী রত্নাকর নদীতটে···' ইত্যাদি।

এখানে যে দেবী আছেন, তিনি শ্মশানবাসিনী। তাঁরই পাশে ঘণ্টেশ্বরের শিব মন্দির। ভাব দেখে মনে হয় দেবী ও ভৈরব হিসেবেই তাঁদের অবস্থান। কিন্তু পীঠনির্ণয় অনুসারে দেবী এবং ভৈরবের নামের সঙ্গে কোন মিল নেই। সুতরাং—গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ১৯৫০ সন, সেখানে আছে ভিন্ন নির্দেশ। তবে নির্দেশে নেই কোন স্পষ্টতা। পাঁজির মতে 'রত্নাবলী' হল মাদ্রাজে। কিন্তু মাদ্রাজে কোন্ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার নেই উল্লেখ।

সুতরাং ঐতিহাসিকেরা ভিন্নভাবেও চিন্তা করেছেন একটু। নেপালে বাগমতী ও রত্নাবলী নদীর সঙ্গমে আছে এক পরমতীর্থ, যার নাম প্রমোদাতীর্থ। হতে পারে, রত্নাবলী বলতে পাঠনির্ণয়কারী বুঝিয়েছেন এই স্থানকেই। কিন্তু? কিন্তু সবকিছু স্পষ্ট না হলেই সমস্যা। সুতরাং দেবী যদি করুণা না করেন, এবং ভৈরব, তাহলে মহার্ঘ্যরত্নের মতই রত্নাবলী থাকবে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। একমাত্র দেবীই ভরসা।

রত্নাবলী বাদ দিয়ে এবার যাওয়া যাক নতুন তীর্থে, নতুন শাক্তপীঠ মিথিলাতে, পীঠনির্ণয়ের মতে যে শাক্তপীঠ হল ত্রিচত্বারিংশৎ। বলা হয়েছে :

"মিথিলায়ামুমাদেবী বামস্কন্ধো মহোদরঃ।

অর্থাৎ মিথিলায় পড়েছে সতীর বামস্কন্ধ। দেবীর নাম 'উমা' এবং ভৈরবের নাম 'মহোদর'। বর্ণনান্তরে উমার নাম 'মহাদেবী' বলেও

বলেছেন অনেকেই। ভারতচন্দ্র এ-সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন এই ধরনের। যেমন :

"মিথিলায় বামস্কন্ধ, দেবী মহাদেবী।
মহোদর ভৈরব সর্বার্থ যাঁরে সেবি ॥"

সবই ঠিক আছে, শুধু দেবীর নাম 'উমার' পরিবর্তে 'মহাদেবী' বলেছেন ভারতচন্দ্র। সুতরাং অসুবিধা বিশেষ নেই। অসুবিধা শুধু স্থান-নির্ণয়ে। উত্তরভারতের মানুষের কাছে স্থানের নাম যদি সব চাইতে পরিচিত হয় কোনটা, তবে তা মিথিলা। এই মিথিলার রাজা হলেন ঋষি জনক, যাঁর কন্যা সীতাদেবী। যে-জন্য তাঁর আর এক নাম হল মৈথিলী। কিন্তু প্রশ্ন হল, সারা দেশ জুড়ে তো হতে পারেনা একটি পীঠস্থান, নির্দিষ্ট কোন জায়গা চাই। সুতরাং সে-স্থান কোথায়, যেখানে আছে পীঠস্থান? শাক্তপীঠের অবস্থান যাঁরা চর্চা করেছেন ঐতিহাসিক ভাবে, তাঁদের ধারণা, নেপালের তরাই অঞ্চলে বর্তমান জনকপুরই হল সেই স্থান। যাঁরা ভ্রমণের জন্য এ-দেশের সারা অঙ্গ বেরিয়েছেন চষে তাঁদেরও তাই ধারণা। ভূপতিরঞ্জন দাস বলেছেন, নেপাল সীমান্তের জনকপুরই হচ্ছে সেই স্থান। আপনার যদি অভিলাস থাকে সেখানে যাবার, তাহলে রওনা হয়ে যান বিহারের দ্বারভাঙ্গাতে। সেখান থেকে বাসে করে সহজেই যেতে পারেন জনকপুর। আদ্যাস্তোত্রে সীতা হলেন শক্তিদেবী। তাই বলা হয়েছে—'রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিণী।' সুতরাং অসম্ভব নয় যে, সতীর বাম স্কন্ধ পড়েছিল এখানেই।

পীঠনির্ণয়ের প্রথম দিকের পাণ্ডুলিপিতে এই ত্রিচত্বারিংশৎ পীঠ পর্যন্তই ছিল বর্ণনা। বাকী পীঠগুলোর স্থাননির্ণয় ছিল কামরূপেই। পরে কামরূপমুক্ত হয়ে আটটি পীঠ স্থান করে নিয়েছে অন্যত্র, যার অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে। বাকী একটি বাইরে। কি করে হল, কেমন করে হল, তা বলার সাধ্য আমার নেই। সে ব্যাখ্যা দিতে পারেন পীঠনির্ণয় করেছেন যাঁরা কেবল তাঁরাই মাত্র, কিংবা স্বয়ং দেবী নিজে, যিনি নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছেন নতুন নতুন অঞ্চলে। যে যে নতুন

অঞ্চলে দেবীর পরবর্তীকালে অধিষ্ঠান, আমি শুধু বর্ণনা করতে পারি সেই সেই অঞ্চলগুলিই, অন্য কিছু বলার নেই আমার অধিকার।

পীঠনির্ণয়ের প্রথম সঙ্কোচ কাটিয়ে দেবী যখন ছড়িয়ে পড়েছেন নতুন অঞ্চলে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে, তখন তাঁর যে সকল অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, যা পুরণ করেছে একান্নপীঠের তালিকা, সে সবের কথাই বলছি আমি এবার।

বর্ধিতকলেবর পীঠনির্ণয়ের বর্ণনাতে চতুশ্চত্বারিংশৎ শাক্তপীঠ হল নলহাটীতে। এক্ষেত্রে পীঠনির্ণয়ের যা বর্ণনা, তা হল এই রকম :

"নলহাট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥"

অর্থাৎ নলহাটীতে পড়েছে সতীর নলা। দেবীর নাম 'কালী'। ভৈরবের নাম 'যোগীশ'। বীরভুম জেলার নলহাটীতে এই পীঠস্থান। সংস্কৃত শব্দ 'নলক' যার অর্থ দীর্ঘ অস্থি, বাংলায় তারই ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ হল নলা। এই নলক বা দীর্ঘ অস্থি পড়েছে এখানে।

রামপুরহাট মহকুমায় এই নলহাটী। হাওড়া থেকে বড়জোর দূরত্ব ২২১ মিটার। নলহাটী স্টেশন, থেকে এগিয়ে যান মাইল খানেক পশ্চিমে। টিলার উপর দেবীর মন্দির। পাহাড়ের যে অংশ মন্দিরের মেঝে, সেখানেই খোদাই করা রয়েছে কালীর মুখ। স্থানীয় লোকদের বলুন, তারা দেখবেন গড গড় করে বলে যাবে সমস্ত কাহিনী। দেবীর নাম 'কালী' না বলে বলবে 'ললাটেশ্বরী'। ভৈরবের নাম ঠিকই। কারণ, স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এখানে পড়েছিল সতীর ললাট। সেই থেকে দেবীর নাম 'ললাটেশ্বরী'। তবে ঐতিহাসিকদের ধারণা, নলহাটির দেবী 'নলহাটেশ্বরী' থেকে এসেছে 'ললাটেশ্বরী' নাম। ললাটেশ্বরীর পূজারীরা বলেন, চৌদ্দপুরুষ আগে তাঁদের এক পূর্বপুরুষ স্মরনাথ শর্মা স্বপ্নে পেয়েছিলেন ললাটেশ্বরীকে। এক সাহা জমিদার তৈরি করে দেন মন্দিরটি। বৈষ্ণব জমিদার রাজা উদয়নারায়ণ মন্দিরের জন্য দান করেছিলেন প্রচুর জমি। দেবীর ভৈরব যোগেশের মন্দিরের ভিত্

খুঁড়বার সময় পাওয়া গিয়েছিল একটি পাথর। পাথরে আঁকা নারায়ণের পদচিহ্ন। দৈবনির্দেশ মনে করে সেই পাথরটিকে রাখা হয়েছে মন্দিরে গেঁথে। সেইজন্ত নারায়ণ শিলারও চলছে পূজো। ধর্মসমন্বয়ের এক আশ্চর্য নিদর্শন এই নলহাটী। ললাটেশ্বরীর মন্দিরের পশ্চিমদিকে টিলার উপর আছে এক পীরের সমাধি। সেখানেও শ্রদ্ধা জানায় দলে দলে লোক। সে যা-ই হোক নলহাটীর দেবীর স্থানীয় নাম পীঠনির্ণয় অনুসারে না হলেও তাতে বিভ্রান্ত হবার কারণ নেই। আপনি যদি কাহিনীতে বিশ্বাস করেন, ঘটনাতে, তাহলে সৎবিশ্বাসের যে পুণ্যফল, তা অবশ্যই লাভ করবেন এখানে পূজো দিলে। আমার হাতের কাছে যে পুরানো অন্নদামঙ্গলের পাণ্ডুলিপি, তাতে দেখছি নাম নেই নলহাটীর। সে জন্ত চিন্তার কোন কারণ নেই। নানা মত আছে নানা গ্রন্থে। তাতে বিভ্রান্ত হলে এ-জন্মে খুঁজে পাওয়া যাবেনা একান্নপীঠ। যেমন ধরুন—দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতেও আছে একটি স্থান। স্থানীয় লোকেরা বলে ছত্রভোগ। সতীর বুকের ছাতা পড়েছিল এখানে। দেবীর নাম নাকি 'ত্রিপুরসুন্দরী'। রায় দীঘি লাইনে ডায়মণ্ডহারবার থেকে বাস রুটে যাওয়া চলে। রেল লাইনে লক্ষ্মীকান্তপুরের পথে মথুরাপুর স্টেশনে নেমে রায়দীঘির বাসে চেপে কৃষ্ণচন্দ্রপুর থেকেও যাওয়া যায়। আদি গঙ্গার বা খাড়ির ধারে এ মন্দির। ছত্রভোগের বিশ্বাসের ছাতা ধরে বসে আছেন অনেক লোক। তাদের আপনি হঠাতে পারবেন না কোন মতেই। সে-জন্যে যদি ছত্রভোগকেই গ্রহণ করেন সতীর অঙ্গোদ্ভূত পীঠ হিসাবে, তাহলে আপনার পীঠ সংখ্যা যাবে আরও বেড়ে, একান্নকে ধরে রাখতে পারবেন না নির্দিষ্ট সংখ্যায়। সুতরাং বিশ্বাস করুন একটিতে—পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠনিরূপণ গ্রন্থে, তবেই পাবেন যা চান—সেই একান্নপীঠ। সুতরাং নলহাটীতে নির্ভয়ে যান। দেবী 'কালী' না হয়ে যদি হন 'ললাটেশ্বরী' তাতে ঈশ্বরী হবেন না আপনার প্রতি কখনও বিরূপ। ভক্তিনম্র চিত্ত নিয়ে এগিয়ে যান। সেখানে মন্দিরের কাছেই পাবেন ধর্মশালা। থাকতে পারেন দু-এক দিন। বাজার আছে, হোটেল আছে, আর আছে ডাকবাংলো।

ভক্তিনম্র চিত্তে থাকতে পারেন, সাহেবী মেজাজেও। যেমন খুশি।

নলহাটীতে নয় পরিক্রমা শেষ। আবার বেরিয়ে পড়ুন নতুন পীঠে। নতুন পীঠ আছে পশ্চিমবঙ্গেই—যার নাম 'কালীঘাট'। অবশ্য এ কালীঘাট নয় কলকাতায়, এ হল বর্ধমান জেলায়। কালীঘাট বললে যদি না চেনেন, 'কালীপীঠ' বললে চিনবেন সকলেই। পীঠ-নির্ণয়ের বর্ণনাক্রমে এই নতুন পীঠ হল কালীপীঠেই। পঞ্চচত্বারিশৎ শাক্তপীঠ। এ সম্পর্কে বর্ণনা আছে এই রকম :

"কালীঘাটে মুক্তপাতঃ ক্রোধীশো ভৈরবস্তথা।
দেবতা জয়ন্থর্গাস্থা নানা ভোগ প্রদায়িনী ॥"

অর্থাৎ কালীঘাটে পড়েছে দেবীর মুণ্ড। সেখানে ভৈরবের নাম 'ক্রোধীশ' এবং দেবীর নাম 'জয়ন্থর্গা'। তিনি করে থাকেন নানা ভোগ প্রদান। অবশ্য এ-ভোগ শুধু যে জয়ন্থর্গাই দান করেন তা নয়। যে-কোন শাক্তপীঠে গিয়ে দেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করার অর্থ ই হল, নানা অভিলাস পূর্ণ হওয়া। প্রশ্ন হল, কোথায় এই 'কালীঘাট' যে-কালীঘাট নয় কলকাতার উপরে? ভারতচন্দ্র এই কালীঘাট সম্পর্কে একেবারে নীরব। সুতরাং তাঁর কাছ থেকেও যে এ-বিষয়ে পাব কোন ইঙ্গিত নেই সে সম্ভাবনা। অথচ স্থান নির্ণয় না হলে পীঠের নাম জানা না-জানা হবে সমান। কোথায় আছে এই কালীঘাট?

ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে কালীঘাটের উল্লেখ নেই, সেখানে আছে এই ধরনের বর্ণনা :

'কর্ণাটে চৈব কর্ণো মে অভীর নাম ভৈরবঃ।'

অর্থাৎ কর্ণাটে পড়েছিল সতীর কর্ণ। ভৈরবের নাম 'অভীরু' এবং দেবীর নাম 'জয়ন্থর্গা'। কিন্তু এ-পীঠ নির্ণয়ে ঐতিহাসিকেরা করেছেন যে স্থান নির্ণয় তা নয় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। তবে এই কালীঘাট, কালীঘাট নয়, এর নাম কালীপীঠ। এর সন্ধান পাবেন আপনারা বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার কাছে জুরাণপুরে, সেখানেই আছে এই পীঠ। সেখানেই পাবেন আপনারা 'জয়ন্থর্গা' এবং 'ক্রোধীশকে'। 'শিবচরিত্র'

নামে একটি পীঠনির্ণয়ক গ্রন্থ এখানকার দেবীকে বলেছেন 'চণ্ডেশ্বরী' এবং ভৈরবকে 'চণ্ডেশ্বর'। নামের এই পরিবর্তন হলেও মূল অর্থের হয়নি বোধহয় কোন হেরফের। ডঃ নিহাররঞ্জন রায়ের মতে 'দুর্গা'র মূল অর্থ থাকে যায় না ভেদ করা। কিন্তু আমাদের দেশে দুর্গা পরিচিত মহিষমর্দিনীরূপেই বেশী। আর এই মহিষ মর্দিনীরূপ হল উগ্রচণ্ডীর রূপ। কালী, তারা, দুর্গা সবই হল উগ্র-চণ্ডী মূর্তি। সুতরাং 'জয়দুর্গা' যদি উগ্রচণ্ডী হয়ে থাকেন শিবচরিতে, এবং 'ক্রোধীশ' 'চণ্ডেশ' তাতে অর্থের হয়না হেরফের। ফলে যে কালীঘাটে সতীর মুণ্ডপাত ঘটেছে সেখানে দেবীর নাম 'জয়দুর্গা' বা 'চণ্ডেশ্বরী,' বা ভৈরবের নাম 'ক্রোধীশ' বা 'চণ্ডেশ' যাই হোকনা কেন, এ কালীঘাট হল কাটোয়ার কাছে জুড়াণপুর। এ-পীঠের নাম ছিলনা প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিতে। কিন্তু সেজন্য যদি প্রশ্ন তোলেন, তাহলে হাজার প্রশ্ন এসে যাবে পাঠনির্ণয় প্রসঙ্গেই। এবং তা হলে······

এবং তাহলে, বিশ্বাসই হল বড় কথা, তর্ক নয়। ফলে, আসুন, যা পাওয়া গেছে তাকেই ধরে এগিয়ে যাই নতুন পীঠে—ষট্‌চত্বারিংশৎ শাক্তপীঠে, পীঠনির্ণয়ে যে পীঠ সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে এই ধরনের বর্ণনা :

"বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষমৰ্দ্দিনী ॥"

অর্থাৎ বক্রেশ্বরে পড়েছে সতীর মন। এখানে ভৈরবের নাম 'বক্রনাথ' এবং দেবীর নাম 'মহিষমর্দিনী'।

প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিতে এ-পীঠের ছিলনা কোন উল্লেখ। এসেছে পরে। শিবচরিতে বক্রেশ্বরের নাম করেই করা হয়েছে পীঠবর্ণনা। আসলে বক্রেশ্বর হল শৈবস্থান, দেবীর অঙ্গপাতনে হয়েছে শাক্তপীঠ। পীঠনির্ণয়ের মতে দেবীর মন পড়েছে এখানে। ধারণা কিছুটা হাস্যকর। মনের কি আছে কোন বাস্তব অস্তিত্ব যে, সে পড়বে কোথাও? সুতরাং যদি উষ্ণপ্রস্রবণের এই বক্রেশ্বরে আপনি কখনও যান বেড়াতে কিংবা স্বাস্থ্যোদ্ধারে তাহলেই স্থানীয় পাণ্ডাদের কাছে

এ বিষয়ে পাবেন একটু ভিন্ন বর্ণনা। যেমন, তারা বলবে, মন নয়, পড়েছিল সতীর ভ্রূ-মধ্য। ভ্রূ-মধ্যস্থ অংশে যদি আপনি যোগপ্রথায় করেন মনোনিবেশ, তাহলে দেখবেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে গেছে মনোময়। মন ছাড়া আর কোন কিছুরই নেই অস্তিত্ব। এক নির্বিকল্প প্রশান্ত-বিস্তার বিরাট মন। সুতরাং সেই অর্থে হয়তো 'মনঃপাত'ই হবে সম্ভব। সুতরাং, লৌকিক মানস দ্বারা বিচার করবেন না কখনও। শুধু বিশ্বাস করে এগিয়ে যান, সিদ্ধি তাহলে সুনিশ্চয়। বিশ্বাস করুন বক্রেশ্বরকে শাক্তপীঠের আসনে বসিয়ে। স্বাস্থ্যোদ্ধার, মনোদ্ধার দুয়ের জন্যই সুযোগ পেলে একবার ঘুরে আসুন বক্রেশ্বরে। হাঁফানি থাকলে করুন উষ্ণকুণ্ডে স্নান, বাত থাকলে উষ্ণ জলে অঙ্গ ডুবিয়ে তা করুন দূর। আর মনের ব্যাধি থাকলে প্রার্থনা করুন মহাদেবী মহিষমর্দিনীর কাছে, তিনি দূর করবেন আপনারা মনের অশান্তি।

মন্দিরে আছে অষ্টধাতুর মহিষমর্দিনী দেবী এখন। ভক্তিভরে সেখানে গিয়ে পূজো দিন। যদি কৌতূহল থাকে প্রাচীন মহিষমর্দিনী মূর্তি দেখবার—তাহলে ডিহি বক্রেশ্বর গ্রামে পাণ্ডার বাড়িতে আছে সে মূর্তি, তাঁকে দেখুন। মূর্তি দুরকম হবার পেছনে আছে গল্প। গৌড়ের সুলতানের সেনাপতি কালাপাহাড় নাকি একবার রাজনগরের পথে পশ্চিম দিকে এসেছিলেন এগিয়ে। মূর্তি বিধ্বংসী কালাপাহাড়ের ভয়ে পূজারীরা অষ্টাদশভূজা মহিষাসুরমর্দিনী বিগ্রহটিকে একটি পুকুরে ডুবিয়ে রেখে গিয়েছিলেন পালিয়ে। পরবর্তীকালে পুষ্করিণী সংস্কারের সময় মূর্তিটিকে পাওয়া যায় সেখানে। ইতিমধ্যে বক্রেশ্বর মন্দিরে ধাতু মূর্তি হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পুরানো মূর্তি যাবে কোথায়? পূজারীরা পাথরের প্রাচীন মূর্তিটিকে নিয়ে যান ডিহি বক্রেশ্বর গ্রামে। এইজন্যই মূর্তি দু'টি। ডিহি বক্রেশ্বর গ্রামের মূর্তিই আদি বিগ্রহ। অষ্টাদশ ভুজা মহিষমর্দিনী। বক্রেশ্বর যাওয়ায় এখন কষ্ট নেই। তীর্থযাত্রীদের নিয়ে, ভ্রমণ বিলাসীদের নিয়ে, মাঝে মাঝেই এখন বাস যায় কলকাতা থেকে। উদ্দেশ্য প্রমোদ-ভ্রমণ। কিন্তু আপনি পূণ্য-ভ্রমণের ইচ্ছা নিয়ে পথে বেরোন। যদি প্রমোদ-বাসে যাবার ইচ্ছা না হয়, তাহলে

রেলপথে যান বোলপুর, সিউড়ি বা দুবরাজপুর। সেখান থেকে বাস পাবেন।

বক্রেশ্বর শেষ করে নিশ্চয়ই আপনি থাকবেন না ঘরে বসে। কারণ, একান্নপীঠের পরিক্রমায় আপনার যে অভিযাত্রা, তা শেষ হতে পারে না ষট্‌চত্বারিংশৎ পীঠ দেখেই। এবার আপনাকে এগুতে হবে সপ্তচত্বারিংশৎ পীঠের খোঁজে। কোথায় সেই সাতচল্লিশ নম্বর পীঠস্থান? পীঠনির্ণয়ে এ-সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই ধরনের:

"যশোরে পাণিপদ্ম দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধির্ণসংশয়॥"

অর্থাৎ যশোরে পড়েছে দেবীর পাণিপদ্ম। দেবীর নাম সেখানে 'যশোরেশ্বরী' এবং ভৈরবের নাম 'চণ্ড'। সেখানে গিয়ে যদি আপনি পুজো দেন, তাহলে সিদ্ধি সম্পর্কে নেই কোন সংশয়। কিন্তু যশোরে কোথায় এই পীঠস্থান? 'যশোরেশ্বরী' নাম হলেও আসলে কিন্তু এ-দেবী নেই যশোরে। তিনি বস্তুতঃ আছেন খুলনায়! হাসনাবাদ রেলস্টেশন থেকে ২৫ মাইল দূরে, ঈশ্বরীপুরে।

২৪ পরগণা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ নদী পার হয়ে বাংলাদেশের বসন্তপুর হাট। ওখান থেকে মাইল বিশেক দূরে হল যশোরেশ্বরীর মন্দির। মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন বসন্তরায়, প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। বর্তমানে যে মূর্তি আছে তা অর্থহীন। আদি যশোরেশ্বরীর মূর্তি মানসিংহ নিয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে সঙ্গে করে। বর্তমানে সে মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে রাজস্থানে, জয়পুরের যশোরেশ্বরী মন্দিরে। কিন্তু তীর্থপুণ্য যদি সঞ্চয় করতে হয়, তাহলে রাজস্থানে নয় আপনাকে যেতে হবে খুলনা জেলার ঈশ্বরীপুরে। বর্তমানে বাংলা দেশে। সেখানে পড়েছিল সতীর পাণিপদ্ম। বাঙ্গালী হয়েও বাংলাদেশে আজ আপনার নেই অবাধ প্রবেশাধিকার। রাজনীতিতে এক জাতি বিভক্ত আজ দুই ভাগে। সুতরাং নিন পাসপোর্ট, সংগ্রহ করুন ভিসা। যদিও নিকট এখন অনেক দূর, তবুও পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য সে দূরত্বকে করতেই হবে অতিক্রম। সুতরাং—

সুতরাং যশোরেশ্বরী-পীঠ দেখবার পর এগিয়ে চলুন—অষ্টচত্বারিংশৎ পীঠের দিকে, যে পীঠ আছে অট্টহাসে। পীঠনির্ণয়ে এ সম্পর্কে বর্ণনা আছে এইরকম, যেমন :

অট্টহাসেচোষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র সর্বাভিষ্ট প্রদায়কঃ॥

অর্থাৎ অট্টহাসে পড়েছে ওষ্ঠ। দেবীর নাম 'ফুল্লরা' ভৈরবের নাম 'বিশ্বেশ'। সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হয় এখানে পুজো দিলে।

কিন্তু কোথায় এই অট্টহাস, যেখানে গেলে আপনি অভীষ্ট পুরণের জন্য পারবেন পুজো দিতে? ঐতিহাসিকদের ধারণা, মূলতঃ এ-পীঠের নাম ছিল না পীঠবর্ণনায়, এসেছে পরে। এপীঠের সন্ধান পাবেন আপনারা বীরভুম জেলার লাভপুরের কাছে। এর নাম 'ফুল্লরা পীঠ'। 'ফুল্লরাপীঠ' লাভপুর স্টেশনের কাছেই। দেবীর মন্দির ছোট। পুরানো। সামনেই থামওয়ালা প্রকাণ্ড নাটমন্দির। তার সামনে উপরে পাকা ছাদ আচ্ছাদিত চাঁদনী। তারপর সোপাণমণ্ডিত একটি সরোবর। উপরে তিন দিকেই শ্মশানভূমি। দক্ষিণদিকে কতকটা জঙ্গল। শ্মশানে সর্বত্রই নরকপাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শ্মশানের পরে রেল লাইন। দেবীর মূর্তি সবটাই রক্তবস্ত্রে ঢাকা। কেবল মুকুটপরা মাথা ও মুখটুকু খোলা। বাকী অঙ্গ জুড়ে আছে সিঁদুরের প্রলেপ। দেবীর ভোগ হয় প্রথমেই শিবাভোগ। নিত্যভোগ আমিষ ও নিরামিষ দুই-ই। বিশেষ পার্বনে ও অমাবস্যায় হয় ছাগবলি। পঞ্চ 'ম'-কারের অনুষ্ঠান কম। এ পীঠ অতি প্রাচীন তান্ত্রিক আভিচারের ক্ষেত্র। তবে পীঠের নাম 'অট্টহাস' হওয়াতে এ পীঠ নিয়ে কিন্তু আছে ভিন্ন মতও। অনেকেরই ধারণা, এ-পীঠ নয় বীরভুমে, এ-পীঠ হল বর্ধমান জেলার, কেতুগ্রামে, বস্তুতঃ কেতুগ্রাম থানার অধীনস্থ দক্ষিণডি অর্থাৎ দক্ষিণডিহি নামক গ্রামে। কাটোয়ার আধ কিলোমিটার দূরে অজয় নদীর শাখানদী ইশান-নদীর তীরে আছে এই গ্রাম। কেতুগ্রামের প্রাচীন নাম হল বাহুলা। এখানে আছে প্রাচীন মন্দির, বিগ্রহ চামুণ্ডা—মুণ্ডমালিনী ৺মা কালী। কিন্তু স্থানীয়

পুজারীরা দেবীর নাম বলবে 'অধরেশ্বরী', যেহেতু দেবীর অধর পড়েছিল এখানে। দেবীর মন্দির ছোট ও পুরানো। পীঠস্থানের পাশেই ছাদ আচ্ছাদিত একটি নাট মন্দিরের মত স্থান। প্রাঙ্গণে একটি বটগাছ। মূর্তি অস্পষ্ট। যেন রক্তবস্ত্র আচ্ছাদিত কোন স্তূপ। অধিকাংশই ফুল বেলপাতা আচ্ছাদিত। মূর্তির একটি আভাষের উপর অলংকারও আছে কিছু। আসলে মূর্তি হল একখণ্ড খোদাই করা পাথর। এমূর্তি কি রকম, পুরোহিতদেরও নেই ধারণা। মূর্তি হয়তো কোন প্রাচীন ভাস্কর্যকলার নষ্টসৌন্দর্য মাত্র। ক্ষয়প্রাপ্ত নিদর্শন। আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিদর্শন লুপ্তপ্রায়। কোন্‌কালে কার দ্বারা সংগৃহীত জানেনা কেউ। অট্টহাস ও লাভপুর দুটো ক্ষেত্রই আপনার হাতের কাছে। ইচ্ছে করলে নিজেই ঘুরে এসে নিঃসন্দেহ হতে পারেন এ-ব্যাপারে এবং সেই সঙ্গে পারেন পুণ্য সঞ্চয় করতে স্বল্প ব্যয়ে। তবে আমার নিজের মত, বীরভুম জেলার লাভপুরের কাছেই এ-পীঠ। এবং লাভপুরের দেবীর নামও শাস্ত্রসঙ্গত অর্থাৎ 'ফুল্লরা'। তবে কেতুগ্রামের লোকদের একটা মনগড়া সমর্থন আছে নিজেদের পক্ষে, যেমন: তারা বলে, তীর্থক্ষেত্র যথার্থই তীর্থক্ষেত্র যখন তার পাশে কোন নদী থাকে উত্তরবাহিনী। কেতুগ্রামে সেই ধরণের নদী আছে, নেই লাভপুরে। সেই কারণেই লাভপুর নয় পীঠস্থান, কেতুগ্রামই প্রকৃত পক্ষে অট্টহাস। কেতুগ্রামও যে খুব একটা আধুনিক স্থান তা নয়। কারণ, তন্ত্রপীঠ হিসাবে প্রাচীন গ্রন্থ 'কুব্জিকাতন্ত্রে' আছে এর উল্লেখ। 'কুব্জিকাতন্ত্র' 'পীঠনির্ণয়' থেকেও প্রাচীন। রাজা চন্দ্রকেতর নাম অনুসারে প্রাচীন 'বাহলার' নাম হয় কেতুগ্রাম।

এবার কাছাকাছি আছে আরও একটি পীঠস্থান, উনপঞ্চাশৎ। ঐ শাক্তপীঠের নাম নন্দিপুর। পীঠনির্ণয়ে এ-সম্পর্কে বর্ণনা আছে এই রকম:

"হার পাতো নন্দিপুরে ভৈরব নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধি ভবাপ্নুয়াত্‌॥"

অর্থাৎ, নন্দিপুরে পড়েছে সতীর হার। দেবীর নাম 'নন্দিনী'। ভৈরবের

নাম 'নন্দিকেশ্বর'। এখানে সাধনা করলে হয় সিদ্ধিলাভ। কিন্তু কোথায় এই নন্দিপুর, যেখানে গেলে সাধনা করে আপনি লাভ করতে পারেন পরম সিদ্ধি? ঐতিহাসিকের ধারণা, এ পীঠ আছে বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ায়। যাঁদের আছে বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাঁদের মতে সাঁইথিয়াই হল 'নন্দিপুর'। আগে ছিল এই নামই। সাঁইথিয়া জংসন রেলষ্টেশনের পাশেই পাঁচিল ঘেরা জায়গায় একটা গাছের নীচে দেবীপীঠ। ইচ্ছে করলে যে-কোন সময় এখানে গিয়ে সঞ্চয় করে আসতে পারেন তীর্থ-পুণ্য। যদি মনে করেন, থাকতেও পারেন দু-একদিন। অসুবিধা নেই কোন কিছু। হোটেল আছে, বাংলো আছে, থাকতে পারেন যেখানে ইচ্ছা।

সাঁইথিয়া থেকে আপনাকে যদি দেখতে যেতে হয় পঞ্চাশৎ পীঠ সেটাই হল অসুবিধার কারণ, সে একেবারে ভারতবর্ষের বাইরে। এ পীঠ সম্পর্কে পীঠনির্ণয় রেখেছে এই ধরনের বর্ণনা, যেমন,

"লঙ্কায়াং নূপুরশ্চৈব ভৈরবো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তত্র ইন্দ্রেণোপাসিতা পুরা ॥"

অর্থাৎ লঙ্কায় পড়েছে সতীর নূপুর। ভৈরব হলেন সেখানে 'রাক্ষসেশ্বর'। দেবী 'ইন্দ্রাক্ষী'। পুরাকালে ইন্দ্র পূজা করেছিলেন এই দেবীকে। মূল পাণ্ডুলিপিতে লঙ্কার নাম ছিলনা, এসেছে পরে। এ-লঙ্কা যে ঘরের কাছে কোথাও, এরকম মনে করবারও কারণ নেই। 'রাক্ষসেশ্বর' নামে ভৈরবের পরিচয় দেখে মনে হয়, রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কাতেই এই পীঠস্থান। সুতরাং সেখানে যদি যেতে হয়, শ্রীরামচন্দ্রের সাগরপাড়ির মত কিছুটা কষ্ট স্বীকার করতেই হবে আপনাকে। যেমন ধরুন, ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে সশরীরে। সেখানে গিয়ে ধর্ণা দিতে হবে শিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার মেসার্স কে. ও. নাগুরমেরা এণ্ড সন্স-এ, ১৪ বি বাজার ষ্ট্রীট রামেশ্বরম-এ। তার আগে তামিলনাড়ু সরকারের সঙ্গে প্রয়োজন যোগাযোগ। সপ্তাহে তিনদিন রামেশ্বর এবং তলাইমান্না-এর (লঙ্কা) মধ্যে যাত্রীবাহী জাহাজ করে যাতায়াত। পার হতে সময় লাগে

সাড়ে তিনঘণ্টা। তারপর তালিবন শোভিত শ্রীলঙ্কার সমুদ্র উপকূলে নেমে প্রথমেই আপনি মনে করুন 'রাক্ষসেশ্বর' ভৈরবকে এবং পরে দেবী 'ইন্দ্রাক্ষী'কে। লক্ষ্যস্থলে গিয়ে নিশ্চয়ই আপনি পৌঁছুবেন। গুপ্তপ্রেস পাঁজির মতে সমুদ্রতীরে আছে এই পীঠস্থান। তবে ইদানীং কালে লঙ্কা নিয়ে দেখা দিয়েছে সমস্যা। প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ সাংকালিয়ার মতে রামায়ণের লঙ্কা নয় পক প্রণালীর উপর অবস্থিত সিংহল দ্বীপ। রামায়ণের লঙ্কা ছিল ওড়িশায়। আরও অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদও মনে করেন এ ধরনের কথাই। এঁদের মতে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল এ লঙ্কা শহর। মধ্য প্রদেশের গোঁড় করকু উপজাতির লোকেরা লঙ্কা বলতে বোঝে বিস্তির্ণ জলে ঘেরা স্থানকে। ওড়িশার মহানদী ও তেল নদীর সঙ্গমে সোনেপুরের কাছে আধ কিলোমিটার চওড়া জায়গায় খুঁজে পাওয়া গেছে এক পুরানো শহরের ধ্বংসাবশেষ। সাংকালিয়ার মতে এই হল রামায়ণের সোনার লঙ্কা। এখানকার লোকেরা প্রায়ই সোনার জন্য খোঁড়াখুঁড়ি করে এ অঞ্চল। অনেকে এখনও সোনেপুরকে বলে সোনার লঙ্কা, পোড়ায় হনুমানের কুশপুতুল। এখানকার ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গেছে দুর্গেরও সন্ধান। যদি সত্যি সত্যি রামায়ণের সোনার লঙ্কা হয় ওড়িশায় তাহলে এ শাক্ততীর্থ খুঁজতে যেতে হবে ওড়িশাতে, নয় সিংহলে। শক্তি সাধনার অন্যতম পাঠ ওড়িশাতে লঙ্কা তীর্থ থাকা নয় অসম্ভব। যদি এতে বিশ্বাস হয় চলে যান ওড়িশার মহানদী ও তেলনদীর সঙ্গমে সোনেপুরে।

লঙ্কা অনেক দূর, তার আগে যদি মনে করেন—ঘরের কাছে আর একটি পীঠ সেরেই আপনি পাড়ি জমাতে পারেন সাগরে, অর্থাৎ এক-পঞ্চাশৎ পীঠ সেরে। পীঠনির্ণয়ের মতে, একপঞ্চাশৎ শাক্তপীঠ হল বিরাটে। এ বিষয়ে বর্ণনা হল এই রকম:

"বিরাট দেশ মধ্যে তু পাদাঙ্গুলি নিপাততম।
ভৈরবশ্চামৃতাক্ষশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা॥

অর্থাৎ বিরাট দেশে পড়েছে দেবীর পাদাঙ্গুলি। সেখানে ভৈরব হলেন 'অমৃতাক্ষ' এবং দেবী হলেন 'অম্বিকা'। কিন্তু কোথায় এই বিরাট

দেশ যেখানে গেলে আপনি পুণ্য সঞ্চয় করতে পারেন 'অম্বিকা' এবং 'অমৃতাক্ষে'র আরাধনা করে ? যদি বিরাট দেশ বলতে আপনি বোঝেন প্রাচীন বিরাট, তাহলে সে বিরাট বা মৎস্য দেশ হল রাজপুতানার জয়পুর, আলোয়ার ও ভরতপুর অঞ্চলে। কিন্তু পরবর্তী মধ্যযুগে বঙ্গালীরা বিরাটদেশ বলতে বোঝাতেন ভিন্ন এক অঞ্চলকে। এবং সেটা আমাদের এই বঙ্গদেশেই, উত্তরবঙ্গে। পীঠনির্ণয়ের এই বিরাট দেশ হয়তো উত্তরবঙ্গেই কোথাও। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোথায়, সেটা আজও সম্ভব হয়নি বের করা। যদি উত্তরবঙ্গে না হয়ে হয় প্রাচীন বিরাট দেশেতেই, সেটাও নির্দিষ্ট নেই কোথাও। সুতরাং এ খোঁজার দায়িত্ব আপনার, তীর্থপুণ্যপ্রয়াসীর। তবে তন্ত্রাচার্য সৌরেন মৈত্র এক্ষেত্রে দিয়েছেন স্পষ্ট নির্দেশ। তাঁর মতে ময়ূরভঞ্জের 'পঞ্চসাগর' পীঠের কাছেই আছে 'বিরাটতীর্থ', বিরাট দেশ। নিবিড় অরণ্যে ও পাহাড়ের মধ্যে এ-পীঠ অবস্থিত। মৈত্রমশাইকে বিশ্বাস করলে যান ওড়িশাতে। শাক্তপীঠের প্রত্যেকটিতেই সাধনা করে আপনি যদি চান অনন্ত পুণ্য, তাহলে আপনাকেই বেরুতে হবে অজানাকে জানার জন্যে। যা ধরা দিয়েছে চোখের উপর, সেখানে পুজো হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যা এখনও রইল চোখের অগোচর, তাকেও নিয়ে আসতে হবে ভক্তজনের দৃষ্টির সামনে। সুতরাং আপনার বিশ্রাম নেই, আমারও নয়, যতক্ষণ না যথার্থ একান্নপীঠের পুণ্যভূমি স্পর্শ করতে পারছি স্বশরীরে। এজন্য রইল আকূতি এবং চেষ্টা। স্বয়ং ঈশ্বরী তা পূর্ণ করুন ভক্তের এই প্রার্থনা।

কিন্তু শেষ হয়েও বক্তব্য রইল একটুখানি। নানা মত সতী-পীঠের স্থাননির্ণয় নিয়ে। নানা গ্রন্থে আছে এ-নিয়ে নানা বর্ণনা। যে পাঠক পড়েছেন ভিন্ন গ্রন্থ তাঁর মনঃপুত নাও হতে পারে আমাদের ব্যাখ্যা। সেজন্য বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন পীঠের যে বর্ণনা, তার কয়েকটা তালিকা তুলে দিচ্ছি আপনাদের কাছে, যা দেখে ঠিক করবেন নিজের ইচ্ছামত, কোন্ তালিকা আপনার মনের মতন। যেমন ধরুন, তন্ত্রচূড়ামণিতে আছে এই ধরনের বর্ণনা, যা নাকি পীঠনির্ণয়ের বর্ণনার

ুবে কাছাকাছি :

তন্ত্রচূড়ামণিতে একান্নপীঠের বর্ণনা

সংখ্যা	পীঠস্থান	দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	দেবী	ভৈরব
১।	হিঙ্গুলা	ব্রহ্মরন্ধ্র	কোট্টরীশা	ভীমলোচন
২।	শর্করার	তিনচক্ষু	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ
৩।	সুগন্ধা	নাসিকা	সুনন্দা	ত্র্যম্বক
৪।	কাশ্মীর	কণ্ঠদেশ	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্যেশ্বর
৫।	জ্বালামুখী	মহাজিহ্বা	সিদ্ধিদা	উন্মত্ত ভৈরব
৬।	জালন্ধর	স্তন	ত্রিপুর-মালিনী	ভীষণ
৭।	বৈদ্যনাথ	হৃদয়	জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
৮।	নেপাল	জানু	মহামায়া	কপালী
৯।	মানস	দক্ষিণ হাত	দাক্ষায়ণী	অমর
১০।	উৎকল (বিরজাক্ষেত্রে)	নাভিদেশ	বিমলা	জগন্নাথ
১১।	গণ্ডকী	গণ্ডস্থল	গণ্ডকী	চক্রপাণি
১২।	বহুলা	বামবাহু	বহুলাদেবী	ভীরুক
১৩।	উজ্জয়িণী	কূর্পর	মঙ্গলচণ্ডিকা	কপিলাম্বর
১৪।	চট্টল	দক্ষিণ বাহু	ভবানী	চন্দ্রশেখর
১৫।	ত্রিপুরা	দক্ষিণ পদ	ত্রিপুর-সুন্দরী	ত্রিপুরেশ
১৬।	ত্রিস্রোতা	বামপদ	ভ্রামরী	ভৈরবেশ্বর
১৭।	কামগিরি	যোনিদেশ	কামাখ্যা	উমানন্দ
১৮।	প্রয়াগ	হস্তাঙ্গুলী	ললিতা	ভব
১৯।	জয়ন্তী	বামজঙ্ঘা	জয়ন্তী	ভৈরবেশ্বর

সংখ্যা	পীঠস্থান	দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	দেবী	ভৈরব
২০।	যুগাদ্যা	দক্ষিণাঙ্গুলি	ভূতধাত্রী	ক্ষীরখণ্ডক
২১।	কালীপীঠ	দক্ষিণ পাদাঙ্গুলী	কালিকা	নকুলীশ
২২।	কিরীট	কিরীট	বিমলা	সম্বর্ত্ত
২৩।	বারানসী	কর্ণকুণ্ডল	বিশালাক্ষি বা মণিকর্ণী	কালভৈরব
২৪।	কন্যাশ্রম	পৃষ্ঠ	সর্বাণী	নিমিষ
২৫।	কুরুক্ষেত্র	গুল্‌ফ	সাবিত্রী	স্থানু
২৬।	মণিবন্ধ	দুই মণিবন্ধ	গায়ত্রী	সর্ব্বানন্দ
২৭।	শ্রীশৈল	গ্রীবা	মহালক্ষ্মী	শম্বরানন্দ
২৮।	কাঞ্চী	অস্থি	দেবগর্ভা	রুরু
২৯।	কালমাধব	নিতম্ব	কালী	অসিতাঙ্গ
৩০।	শোনদেশ	নিতম্বক	নর্ম্মদা	ভদ্রসেন
৩১।	রামগিরি	অন্যস্তন	শিবাণী	চণ্ডভৈরব
৩২।	বৃন্দাবন	কেশপাশ	উমা	ভূতেশ
৩৩।	শুচি	উর্দ্ধদন্ত	নারায়ণী	সংহার
৩৪।	পুবসাগর	অধোদন্ত	বারাহী	মহারুদ্র
৩৫।	করতোয়াতট	তল্প	অর্পণা	বামনভৈরব
৩৬।	শ্রীপর্বত	দক্ষিণ গুল্‌ফ	শ্রীসুন্দরী	সুন্দরানন্দ ভৈরব
৩৭।	বিভাষ	বাম গুল্‌ফ	কপালিণী	সর্বানন্দ
৩৮।	প্রভাস	উদর	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
৩৯।	ভৈরবপর্বত	উর্দ্ধ ওষ্ঠ	অবন্তী	লম্বকর্ণ
৪০।	জনস্থল	চিবুকদ্বয়	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ
৪১।	গোদাবরী-তীর	গণ্ড	বিশ্বেশী	দণ্ডপাণি

সংখ্যা	পীঠস্থান	দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	দেবী	ভৈরব
৪২।	সর্বশৈল	বামগণ্ড	রাকিণী	বৎস্যনাভ
৪৩।	রত্নাবলী	দক্ষিণ স্কন্ধ	কুমারী	শিব
৪৪।	মিথিলা	বাম স্কন্ধ	উমা	মহোদর
৪৫।	নলহাটী	নলা	কালিকাদেবী	যোগেশ
৪৬।	কর্ণাট	কর্ণ	জয়দুর্গা	অভীরু
৪৭।	বক্রেশ্বর	মনঃ	মহিষমর্দ্দিনী	বক্রনাথ
৪৮।	যশোর	পাণিপদ্ম	যশোরেশ্বরী	চণ্ড
√৪৯।	অট্টহাস	ওষ্ঠ	ফুল্লরা	বিশ্বেশ
৫০।	নন্দিপুর	কণ্ঠহার	নন্দিনী	নন্দিকেশ্বর
৫১।	লঙ্কা	নূপুর	ইন্দ্রাক্ষী	রাক্ষসেশ্বর
„	বিরাট	পাদাঙ্গুলী	অম্বিকা	অমৃত
„	মগধ	দক্ষিণ জঙ্ঘা	সর্ব্বানন্দকরী	ব্যোমকেশ

শিবচরিতেও আছে পীঠবর্ণনা। তবে পীঠনির্ণয় বা তন্ত্রচূড়ামণির বর্ণনা থেকে অনেক অংশেই সে বর্ণনা উল্লেখ করার মত পৃথক। শিব চরিতে আছে ৫১টি মহাপীঠ এবং সেই সঙ্গে ২৬টি উপপাঠের কথা, অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে গুনে গুনে ৭৭টি পীঠ। সেখানে পাঠবর্ণনা দেওয়া আছে এই রকম :

শিবচরিতে সতীপীঠ বর্ণনা

সংখ্যা	পীঠস্থান	দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	দেবী	ভৈরব
১।	ব্রহ্মরন্ধ্র	হিঙ্গুলা	কোট্টবী	ভীমলোচন
২।	ত্রিনেত্র	সর্কর	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ
৩।	তারা	নেত্রাংশতারা	তারিণী	উন্মত্ত

সংখ্যা	দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	পীঠস্থান	দেবী	ভৈরব
৪।	বামকর্ণ	করতোয়াতট	অপর্ণা	বামেশ
৫।	ডানকর্ণ	শ্রীপর্বত	সুন্দরী	সুন্দরানন্দ
৬।	নাসিকা	সুগন্ধা	সুনন্দা	ত্র্যম্বক
৭।	মনঃ	বক্রনাথ	পাপহরা	বক্রনাথ
৮।	বামগণ্ড	গোদাবরী	বিশ্বমাতৃকা	বিশ্বেশ
৯।	ডানগণ্ড	গণ্ডকী	গণ্ডকীচণ্ডী	চক্রপাণি
১০।	ঊর্দ্ধদন্ত	অনল	নারায়ণী	সংক্রুর
১১।	অধোদন্ত	পঞ্চসাগর	বারাহী	মহারুদ্র
১২।	জিহ্বা	জ্বালামুখী	অম্বিকা	বটুকেশ্বর বা উন্মত্ত
১৩।	কণ্ঠ	কাশ্মীর	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্য
১৪।	গ্রীবা	শ্রীহট্ট	মহালক্ষ্মী	সর্বানন্দ
১৫।	ওষ্ঠ	ভৈরব পর্বত	অবন্তী	নম্রকর্ণ
১৬।	অধর	প্রভাস	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
১৭।	মর্ম্ম	প্রভাসখণ্ড	সিদ্ধেশ্বরী	সিদ্ধেশ্বর
১৮।	চিবুক	জনস্থান	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ
১৯।	দ্বিহস্তাঙ্গুলি	প্রয়াগ	কমলা	বেণীমাধব
২০।	ডান হস্তার্দ্ধ বা বামহস্ত	মানসরোবর	দাক্ষায়ণী	হর
২১।	ডান হস্তার্ধ	চট্টগ্রাম	ভবানী	চন্দ্রশেখর
২২।	বামস্কন্ধ	মিথিলা	মহাদেবী	মহোদর
২৩।	ডানস্কন্ধ	রত্নাবলী	শিবা	শিব বা কুমার
২৪।	বাম-মণিবন্ধ	মণিবন্ধ	গায়ত্রী	শঙ্কর বা সর্বাণ
২৫।	ডান-মণিবন্ধ	মণিবেদ	সাবিত্রী	স্থানু

সংখ্যা	দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	পীঠস্থান	দেবী	ভৈরব
২৬।	বাম কনুই	উজানি	মঙ্গলচণ্ডী	কপিলাম্বর
২৭।	ডান কনুই	রণখণ্ড	বহুলাক্ষি	মহাকাল
২৮।	বাম বাহু	বহুলা	বহুলা	ভীরুক
২৯।	ডান বাহু	বক্রেশ্বর	বক্রেশ্বরী	বক্রেশ্বর
৩০।	বামস্তন	জালন্ধর	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
৩১।	ডানস্তন	রামগিরি	শিবানী	চণ্ড
৩২।	পৃষ্ঠ	বৈবস্বত	ত্রিপুটা	শমনকর্মা
৩৩।	হৃদয়	বৈদ্যনাথ	নবদুর্গা বা জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
৩৪।	নাভি	উৎকল	বিজয়া	জয়
৩৫।	জঠর	হরিদ্বার	ভৈরবী	বক্র
৩৬।	কোঁক	কোঁকামুখ	কোঁকেশ্বরী	কোঁকেশ্বর
৩৭।	কাঁকালি	কাঞ্চীদেশ	বেদগর্ভ	রুরু
৩৮।	বামনিতম্ব	কালমাধব	কালী	অসিতাঙ্গ
৩৯।	ডাননিতম্ব	নর্মদা	সোনাক্ষি	ভদ্রসেন
৪০।	মহামুদ্রা	কামরূপ	কামাখ্যাদেবী বা নীলপার্বতী	রাবাণন্দ বা উমানন্দ
৪১।	বামজানু	মালব	শুভচণ্ডী	তাম্র
৪২।	ডান জানু	ত্রিস্রোতা	চণ্ডিকা	সদানন্দ
৪৩।	বামজঙ্ঘা	জয়ন্তী	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
৪৪।	ডানজঙ্ঘা	নেপাল	মহামায়া বা নবদুর্গা	কপালী
৪৫।	বামপদ	ত্রিহুত	অমরী	অমর
৪৬।	ডানপদ	ত্রিপুরা	ত্রিপুরা	নল
৪৭।	ডানপাদাঙ্গুষ্ঠ	ক্ষীরগ্রাম	যোগন্থা	ক্ষীরখণ্ড
৪৮।	ডানপাদাঙ্গুলী	কালীঘাট	কালিকা	নকুলেশ

সংখ্যা	দেবী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	পীঠস্থান	দেবী	ভৈরব
৪৯।	বামগুল্‌ফ	বিভাস	ভীমরূপা	কপালী
৫০।	ডানগুল্‌ফ	কুরুক্ষেত্র	সম্বরী বা বিমলা	সম্বর্ত্ত
৫১।	বাম পাদাঙ্গুলি	বিন্ধ্যশেখর	বিন্ধ্যবাসিনী	পুণ্যভাজন

উপপীঠ

১।	কিরীট	কিরীটকোণা	ভুবনেশী	কিরীটি
২।	কেশ	কেশজাল	উমা	ভূতেশ
৩।	কুণ্ডল	বারানসী	বিশালাক্ষি বা অন্নপূর্ণা	কালভৈরব বা বিশ্বেশ্বর
৪।	বামগণ্ডাংশ	উত্তরা	উত্তরীণি	উৎসাদন
৫।	ডান গণ্ডাংশ	নলস্থান	ভ্রমরী	বিরূপাক্ষ
৬।	ওষ্ঠাংশ	অট্টহাস	ফুল্লরা	বিশ্বনাথ
৭।	দণ্ডাংশ	সংহর	সুরেশী	সুরেশ
৮।	উচ্ছিষ্ট	নীলাচল	বিমলা	জগন্নাথ
৯।	কণ্ঠহার	অযোধ্যা	অন্নপূর্ণা	হরিহর
১০।	হারাংশ	নন্দীপুর	নন্দিনী	নন্দীশ্বর
১১।	গ্রীবাংশ	শ্রীশৈল	সর্বেশ্বরী	চর্চ্চিতানন্দ
১২।	শিরোংশ	কালীপীঠ	চণ্ডেশ্বরী	চণ্ডেশ্বর
১৩।	অস্ত্র	চক্রদ্বীপ	চক্রধারিণী	শূলপাণি
১৪।	পাণিপদ্ম	যশোর	যশোরেশ্বরী	প্রচণ্ড
১৫।	করাংশ	সতীচল	সুনন্দা	সুনন্দ
১৬।	স্কন্ধাংশ	বৃন্দাবন	কুমারী	কুমার

সংখ্যা	দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	পীঠস্থান	দেবী	ভৈরব
১৭।	বসাচর্ব্বি	গৌরীশেখর	যুগাদ্যা	ভীম
১৮।	শিরানলি	নলহাটী	শেফালিকা	যোগীশ
১৯।	কক্ষাংশ	সর্বশৈল	বিশ্বমাতা	দণ্ডপাণি
২০।	নিতম্বাংশ	শোণ	ভদ্রা	ভদ্রেশ্বরী
২১।	পদাংশ	ত্রিস্রোতা	পার্ব্বতী	ভৈরবেশ্বর
২২।	নূপুর	লঙ্কা	ইন্দ্রাক্ষি	রাক্ষসেশ্বর
২৩।	চর্ম্মাংশ	কটক	কটকেশ্বরী	বামদেব
২৪।	লোম	পুণ্ড্র	সর্ব্বাক্ষিণী	সর্ব্ব
২৫।	লোমখণ্ড	তৈলঙ্গ	চণ্ডদায়িকা	চণ্ডেশ
২৬।	ভগ্নাংশ	শ্বেতাঙ্গ	জয়া	মহাভীম

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে'ও নানা বিচারের পর দেওয়া হয়েছে একটি একান্নপীঠের তালিকা। তাতে আবার আছে কিছু কিছু স্থানের ভৌগোলিক নির্দেশও। যেমন :

সংখ্যা, অঙ্গ ও অঙ্গ ভূষণ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা ভৈরবী	ভৈরব
১। ব্রহ্মরন্ধ্র	হিঙ্গুলায় (বেলুচিস্থানে)	কোট্টরী	ভীমলোচন
কিরীট (উপ)	কিরীট (কিরীট-কোণায়। বড়নগর গঙ্গাতীরে)	ভুবনেশ্বরী (বিমলা)	কিরীটী বা সিদ্ধরূপ (মঃ সম্বর্দ্ধ)
কেশ (উপ.)	কেশজাল (বৃন্দাবনে)	উমা	ভূতেশ
মুণ্ড (মঃ মহা-	কালীঘাটে	জয়দুর্গা	অভীরুক

সংখ্যা, অঙ্গ ও অঙ্গ ভূষণ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা ভৈরবী	ভৈরব
পীঠের তালিকা (কাটোয়ার নিকট)			
• ভুক্ত)			
২। মনঃ (মঃ ভ্রূমধ্য)	বক্রনাথে	পাপহরা (মহিষমর্দ্দিনী)	বক্রনাথ
৩। ত্রিনেত্র	সর্করে (করবীপুরে)	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ
৪। নেত্রাংশতারা	তারায়	তারিণী	উন্মত্ত
৫। বামকর্ণ	করতোয়াতটে (বগুড়া-শেরপুর)	অপর্ণা	বামেশ (মঃ বামন)
৬। দক্ষিণ কর্ণ (মঃ কর্ণদ্বয়)	শ্রীপর্ব্বততে (মঃ কর্ণাটে)	সুন্দরী (সুনন্দা) মঃ জয়দূর্গা	সুন্দরানন্দ (মঃ নন্দ বা অভিমান)
• কুণ্ডল (উপ)	বারানসীতে	বিশালাক্ষি বা অন্নপূর্ণা	কালভৈরব বা বিশ্বেশ্বর
৭। নাসিকা (বরিশাল, শিকারপুর)	সুগন্ধায়	সুনন্দা	ত্র্যম্বক (মঃ বটুকেশ্বর)
৮। বামগণ্ড	গোদাবরীতে	বিশ্বমাতৃকা	বিশ্বেশ (মঃ দণ্ডপাণি)
বাম গণ্ডাংশ (উপ)	উত্তরায়	উত্তরিণী	উৎসাদন
৯। দক্ষিণ গণ্ড (উপ)	গণ্ডকীতে (নদীতীরে)	গণ্ডকীচণ্ডী	চক্রপাণি
দক্ষিণ-গণ্ডাংশ	নলস্থলে	ভ্রমরী	বিরূপাক্ষ

সংখ্যা	অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা ভৈরবী	ভৈরব
১০।	ঊর্দ্ধদন্ত-পঙ্‌ক্তি	অনলে (মঃ শুচিদেশে)	নারায়ণী	সংক্রুর (মঃ সংহার)
১১।	অধোদন্ত-পঙ্‌ক্তি	পঞ্চসাগরে	বারাহী	মহারুদ্র
১২।	জিহ্বা	জ্বালামুখী (পাঞ্জাব, জালন্ধর)	অম্বিকা	বটুকেশ্বর বা উন্মত্ত
	উচ্ছিষ্ট (উপ)	নীলাচল	বিমলা	জগন্নাথ
১৩।	ওষ্ঠ (মঃঊর্দ্ধ ওষ্ঠ)	ভৈরব পর্বতে (অবন্তীদেশে উজ্জয়িনীর নিকট)	অবন্তী (মহাদেবী)	নম্রকর্ণ (মঃ লম্বকর্ণ)
	ওষ্ঠাংশ (মঃ অধঃ)	অট্টহাস (কলিকাতা হইতে ৫৬ ক্রোশ দূরে লাভপুরের নিকট)	ফুল্লরা	বিশ্বনাথ
১৪।	অধর (মঃ উদর)	প্রভাসে (মথুরামণ্ডলে)	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
১৫।	চিবুক	জনস্থানে (মধ্যপ্রদেশে)	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ
১৬।	কণ্ঠ	কাশ্মীরে (অমরনাথে)	মহামায়া (মঃ ভগবতী)	ত্রিসন্ধ্য (মঃ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর)
	কণ্ঠহার (উপ)	অযোধ্যায়	অন্নপূর্ণা	হরিহর।
	হারাংশ (উপ)	নন্দীপুরে (লুপ লাইনে সাঁইথিয়া ষ্টেসনের নিকট)	নন্দিনী	নন্দীশ্বর বা নন্দীকেশ্বর
১৭।	গ্রীবা	শ্রীহট্টে	মহালক্ষ্মী	সর্ব্বানন্দ

সংখ্যা	অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা ভৈরবী	ভৈরব
	গ্রীবাংশ (উপ)	শ্রীশৈলে	সর্ব্বেশ্বরী	চর্চ্চিতানন্দ
	শিরানলি (মঃ নালি) (উপ)	নলহাটীতে	শেফালিকা (মঃ কালিকা)	যোগীশ
১৮।	বামস্কন্ধ	মিথিলায় (জনকপুর স্টেশনের নিকট)	মহাদেবী	মহোদর
১৯।	দক্ষিণস্কন্ধ	রত্নাবলীতে	শিবা বা কুমারী	শিব বা কুমার
	স্কন্ধাংশ (উপ)	বৃন্দাবনে	কুমারী বা কাত্যায়নী	কুমার
২০।	মর্ম্ম	প্রভাসখণ্ডে	সিদ্ধেশ্বরী	সিদ্ধেশ্বরী
২১।	বামস্তন	জালন্ধরে (জ্বালামুখীতে)	ত্রিপুর-মালিনী	ভীষণ
২২।	দক্ষিণস্তন (মঃ জঘনাস্থি)	রামগিরিতে (চিত্রকূট পর্বতে)	শিবানী	চণ্ড
২৩।	হৃদয়	বৈদ্যনাথে	নবদুর্গা বা জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
	শিরাংশ (উপ)	কালীপীঠ	চণ্ডেশ্বর	চণ্ডেশ্বর
	বসাচর্ব্বি (উপ)	গৌরিশেখরে	যুগাদ্যা	ভীম
২৪।	পৃষ্ঠ	বৈবস্বতে (কালিকাশ্রমে)	ত্রিপুটা (মঃ সর্ব্বাণী)	শমণকর্মা (মঃ নিমিষ)

সংখ্যা	অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা ভৈরবী	ভৈরব
২৫।	বামবাহু	বাহুলায় (কাটোয়ার কেতুগ্রামে)	বাহুলা বা বাহুলী	ভীরুক
২৬।	দক্ষিণবাহু	বক্রেশ্বর	বক্রেশ্বরী	বক্রেশ্বর
২৭।	বাম কনুই	উজানিতে (কোগ্রামে)	মঙ্গলচণ্ডী	কপিলাম্বর
২৮।	দক্ষিণ কনুই	রণখণ্ডে	বহুলাক্ষি	মহাকাল
২৯।	বামহস্ত (মঃ দক্ষিণহস্তার্ধ)	মানস সরোবরে (মঃ মানসক্ষেত্রে)	দাক্ষায়ণী	হর (মঃ অমর)
৩০।	দক্ষিণহস্তার্দ্ধ	চট্টগ্রাম বা চট্টলে	ভবানী	চন্দ্রশেখর
৩১।	বাম মণিবন্ধ	মণিবন্ধে	গায়ত্রী	শঙ্কর বা সর্বাণ (মঃ সর্বনান্দ)
৩২।	দক্ষিণ	মণিবেদে	সাবিত্রী	স্থাণু
	করাংশ (উপ)	সতীচলে	সুনন্দা	সুনন্দ
৩৩।	দ্বিহস্তাঙ্গুলী	প্রয়াগে	কমলা ব কল্যাণী (মঃ ললিতা)	বেণীমাধব (মঃ ভব)
	পাণিপদ্ম (উপ)	যশোর	যশোরেশ্বরী	প্রচণ্ড (মঃচণ্ড)
	দণ্ডাংশ (উপ)	সংহরে	সুরেশী	সুরেশ
	অস্ত্র (উপ)	চক্রীদ্বীপে	চক্রধারিণী	শূলপাণি।
৩৪।	নাভি	উৎকলে (পুরী)	বিজয়া (মঃ বিমলা)	জয় (মঃ জগন্নাথ)
৩৫।	জঠর	হরিদ্বারে	ভৈরবী	বক্র
৩৬।	কক্ষ	কোঁকে	কোঁকেশ্বরী	কোঁকেশ্বর
	কক্ষাংশ(উপ)	সর্ব্বসৈন্যে	বিশ্বামাতা	দণ্ডপাণি

সংখ্যা	অঙ্গ বা অঙ্গভূষণ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা ভৈরবী	ভৈরব
৩৭।	কঙ্কাল	কাঞ্চীদেশে (বোলপুর স্টেশন হতে ৫ মাইল দূরে কোপাই নদীর তীরে)	বেদগর্ভা	রুরু।
৩৮।	বামনিতম্ব (মঃ দক্ষিণ নিতম্ব)	কালমাধবে (শোণনদে)	কালী (নর্মদা)	অসিতাঙ্গ বা অসিতানন্দ (মঃ ভদ্রসেন)
৩৯।	দক্ষিণ নিতম্ব নিতম্বাংশ (উপ)	নর্মদা শোণে	শোণাক্ষী ভদ্রা	তদ্রসেন ভদ্রেশ্বর
৪০।	মহামুদ্রা (যোনি)	কামরূপে	কামাখ্যা বা নীলাপার্বতী	রাবানন্দ বা উমানন্দ
৪১।	বামজানু } মঃ জানুদ্বয়	মালবে (মঃ নেপালে)	শুভচণ্ডী	তাম্র সদানন্দ মঃ কাপালি
৪২।	দক্ষিণজানু	স্রোতায়	চণ্ডী	
৪৩।	বাম জঙ্ঘা	জয়ন্তিয়ায়	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
৪৪।	দক্ষিণ জঙ্ঘা	নেপালে (মঃ মগধে)	মহামায়া বা নবদুর্গা (মঃ সর্ব্বানন্দকরী)	কপালী মঃ ব্যোমকেশ
৪৫।	বামচরণ	তিরোতা (তিস্রোতা)	অমরী (মঃ ভ্রামরী)	অমর (মঃ ঈশ্বর)
৪৬।	দক্ষিণ চরণ বা চরণাংশ (উপ) (জলপাইগুড়ির	ত্রিপুরায়	ত্রিপুরা	নল (মঃ ত্রিপুরেশ)

সংখ্যা	অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা ভৈরবী	ভৈরব
	শালবাড়ী গ্রামে, তীস্তা নদীর তীরে)	ত্রিস্রোতা	পার্বত	ভৈরবেশ্বর
	নূপুর (উপ)	লঙ্কায়	ইন্দ্রাক্ষি	রক্ষেশ্বর
৪৭।	দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ	ক্ষীর গ্রামে (বর্দ্ধমানন স্টেশন থেকে ২০ মাইল উত্তর)	যোগাদ্যা···	ক্ষারকণ্ঠ
৪৮।	বাম পদাঙ্গুলি	বিশ্যশেখরে	বিন্ধ্যবাসিনী	পূণ্যভাজন
৪৯।	দক্ষিণ চরণের দুটি অঙ্গুলি (মঃ পদাঙ্গুলি)	কালীঘাটে (মঃ বিরাটে)	কালিকা (মঃ অম্বিকা)	নকুলেশ বা নকুলেশ্বর (মঃ অমৃত)
৫০।	বামগুল্ফ	বিভাসে বা বিভাসকে (তমলুকে)	ভীমরূপা	কপালী (মঃ সর্ব্বানন্দ)
৫১।	দক্ষিণ গুল্ফ	কুরুক্ষেত্রে	সম্বরী বা সাবিত্রী	সম্বর্ত (মঃ স্থাণু)
	চার্মাংশ (উপ)	কটকে	কটকেশ্বরী (কাত্যায়নী)	বামদেব
	লোম (উপ)	পুণ্ডরে	সর্বাক্ষিণী	সর্ব্ব
	লোমখণ্ড (উপ)	তৈলঙ্গে	চণ্ডনায়িকা	চণ্ডেশ
	ভগ্নাংশ	শ্বেতবন্ধে	জয়া	মহাভীম

সমাপ্তির পর আরও একটু, পুণ্যার্থীর সহায় হিসেবে দিচ্ছি কয়েকটি সিদ্ধপীঠের নাম,—যে নাম শাক্তপীঠ ভ্রমণকালে সাহায্য করতে পারে তাঁকে আরও পুণ্য সঞ্চয়ে। এ-সকল সিদ্ধপীঠের নাম

আছে কুব্জিকা তন্ত্রের সপ্তম পটলে। সেখানে যে বর্ণনা আছে তা হল এই রকম :

কুব্জিকা তন্ত্রের সপ্তম পটলে বর্ণিত সিদ্ধপীঠ

মায়াবতী	বিমলা	ভৃগুতুঙ্গ
মধুপুরী	মাহেষ্মতীপুরী	কেদার
কাশী	বারাহী	কৈলাস
গোরক্ষচারিণী	ত্রিপুরা	সুগন্ধা
হিঙ্গুলা	বাগ্মতী	শাকম্ভরীপুর
জালন্ধর	নীলবাহিনী	কর্ণতীর্থ
জ্বালামুখী	গোবর্দ্ধন	মহাগঙ্গা
নগরসম্ভব	বিন্ধ্যগিরি	তণ্ডিকাশ্রম
রামগিরি	কামরূপ	কুমার
গোদাবরী	ঘণ্টাকর্ণ	প্রভাস
নেপাল	অক্ষয়গ্রীব	অগস্ত্যাশ্রম
কর্ণস্বর্ণ	মাধব	কণ্বাশ্রম
মহাকর্ণ	ক্ষীরগ্রাম	কৌশিকী
অযোধ্যা	বৈদ্যনাথ	সরযূ
কুরুক্ষেত্র	পুষ্কর	কালোদক
সিংহল	গয়াক্ষেত্র	উত্তর মানস
মণিপুর	অক্ষয়বট	বৈদ্যনাথ
হৃষীকেশ	বরাহপর্বত	কালঞ্জরগিরি
প্রয়াস	অমরকণ্টক	রামোদ্ভেদ
তপোবন	নর্মদা	গঙ্গোদ্ভেদ
বদরী	যমুনা	

ত্রিবেণী	পিঙ্গা	ভদ্রেশ্বর
গঙ্গাসাগর সঙ্গম	গঙ্গাদ্বার	লক্ষ্মণোদ্ভেদ
নারিকেলা	বিল্বক	কাবেরী
জ্যোতিঃস্বর	শ্রীনীলপর্বত	সোমেশ্বর
বিরজা	কলম্ব	শুক্লতীর্থ
কমলা	কুব্জিক	পাটনা
মহাবোধি	নগতীর্থ	রামেশ্বর
মেঘবন	ঐলেয়বন	গোবর্দ্ধন
অজপ্রিয়, ইন্দ্রনীল	হরিশ্চন্দ্র	পৃথুদক
মহানাদ	মৈনাক	পঞ্চাপ্সর
পঞ্চবটী	পর্ব্বটিকা	গঙ্গাবিল্বপ্রসঙ্গ
প্রিয়াদবট	গঙ্গা	রামাচল
ঋণমোচন	গৌতমেশ্বর তীর্থ	বশিষ্ঠতীর্থ
হারিত	ব্রহ্মাবর্ত	কুশাবর্ত
হংসতীর্থ	পিণ্ডারকরণ	হরিদ্বার
বদরীতীর্থ	রামতীর্থ	জয়ন্ত
বিজয়ন্ত	বিজয়া	সারদাতীর্থ
ভদ্রকালেশ্বর	অশ্বতীর্থ	ঔঘবতী নদী
অশ্বপ্রদতীর্থ	সপ্ত গোদাবর	লিঙ্গতীর্থ
কিরীটতীর্থ	বিশালতীর্থ	বৃন্দাবন ও গণেশ্বরতীর্থ

শাস্ত্রে আছে, এ-সব সিদ্ধপীঠে সর্বদা থাকেন পিতৃগণ, সিদ্ধগণ দেবগণ এবং মহর্ষিগণ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়ে এখানে কেউ যদি করেন ধর্মকর্ম সিদ্ধিলাভ তাঁর সুনিশ্চয়।

শুধুমাত্র পীঠস্থান নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পীঠস্থানের সঙ্গে কুব্জিকাতন্ত্রে আছে আধিষ্ঠাত্রী দেবতারও নাম। সে-সব স্থান ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম দিচ্ছি নিচে লিখে, যেমন—

স্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী	স্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী
পুষ্কর	কমলাক্ষী	গয়া	গয়েশ্বরী
অক্ষয় বট	অক্ষয়া	অমর কণ্টক	অমরেশী
বরাহপর্বত	বারাহী	নর্ম্মদা	নর্ম্মদা
যমুনাজল	কালিন্দী	গঙ্গা	শিবামৃতা
দেহলিকাশ্রম	অশ্বা	সরযুতীর	শারদা
শোণ	কনকেশ্বরী	সমুদ্রসঙ্গম	জ্যোতির্ময়
শ্রীপর্বত	শ্রী	মুণ্ডপৃষ্ঠ	শিবাত্মিকা
কালাদক	কালী	কনখল	শ্রদ্ধা মুনিশ্বরী, শুদ্ধবুদ্ধি
মহাতীর্থ	মহোদরা		
উত্তর মানাস	নীলা	মানস সরোবর	সুরেশা, সুমলা, গৌরী
মতঙ্গ	মাতঙ্গিনী		
বিষ্ণুপদ	গুপ্তাচ্চিঃ	নন্দাপুর	মহানন্দা
স্বর্গমার্গ	স্বর্গদা	ললিতপুর	ললিতা
গৌদাবরী	গবেশ্বরী	ব্রহ্মশিব	ব্রহ্মাণী
গোমতী	বিমুক্তি	ইন্দুমতী	পুর্ণিমা
বিপাশা	মহাবলা	সিন্ধু	অতিপ্রিয়া
শতদ্রু	শতরূপা	জাহ্নবীসঙ্গম	বৃত্তিস্বধা
চন্দ্রভাগা	চন্দ্রভাগা		
ঐরাবতী	ঐরাবতী	বহুসীতা	পুণ্যা
সিদ্ধিতীর	সিদ্ধিদা	প্রপা	পাপনাশিনী
পঞ্চনদ	দক্ষা, দক্ষিণা	শঙ্খসংহরণ	ঘোররূপা
ঔজস	বীর্যাদা	স্বর্গোদ্ভেদ	মহাকালী
তীর্থসঙ্গম	সঙ্গমা	মহাবন	প্রবলা
বাহুদা	অনন্তা	ভদ্রেশ্বর	ভদ্রা, ভদ্রকালী
কুরুক্ষেত্র	অরুণেক্ষণা	বিষ্ণুপদ	বিষ্ণুপ্রিয়া

স্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী	স্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী
ভরতাশ্রম	ভারতী	নর্মদোদ্ভেদ	দারুণা
নৈমিষারণ্য	সুকথা	কাবেরী	কপিলেশ্বরী
পাণ্ডু	পাণ্ডুরাননা	কৃষ্ণবেণ্বা	ভেদিনী
বিশালা	বিশালাক্ষী	সংভেদ	শুভবাসিনী
শুক্রতীর্থ	শ্রদ্ধা	পঞ্চাপ্সর	সারঙ্গা
প্রভাস	ঈশ্বরী	পঞ্চবটি	তপস্বিনী
মহাবোধি	মহাবুদ্ধি	বটিকা	বটীশী
পাটল	পাটলেশ্বরী	সর্ব্ববর্ণ	সুরঙ্গিনী
নাগতীর্থ	সুবলা	সঙ্গম	বিন্ধ্যগঙ্গা
	নাগেশী	বিন্ধ্য	বিন্ধ্যবাসিনী
মদস্তি	মদস্তী	নন্দবট	মহানন্দা
	প্রমদা	গঙ্গবাটাচল	শিবা
	মদস্তিকা		
মেঘবাস	মেঘস্বনা	আর্যাবর্ত্ত	মহার্য্যা
	বিদ্যুৎ	ঋণমোচন	বিমুক্তি
	সৌদামিনী		
রামেশ্বর	মহাবুদ্ধি	অট্টহাস	চামুণ্ডা
ঐলাপুর	বীরা	তন্ত্র	শ্রীগৌতমেশ্বরী
			বেদময়ী
			ব্রহ্মবিদ্যা
পিয়ালমার্গ	দুর্গা, সুবেশা	বশিষ্ঠ	অরুন্ধতী
	সুরসুন্দরী		
গোবর্দ্ধন	কাত্যায়নী	হারিত	হরিণাক্ষী
	মহাদেবী		ব্রজেশ্বরী
হরিশ্চন্দ্র	শুভেশ্বরী	ব্রহ্মাবর্ত	গায়ত্রী
			সাবিত্রী

স্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী	স্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী
পুরশ্চন্দ্র	পুরেশ্বরী	কুশাবর্ত্ত	কুশপ্রিয়া
পৃথুদক	মহাবেগা	মহাতীর্থ	হংসেশ্বরী
মৈনাক	অখিলবর্দ্ধিনী	পিণ্ডারকবন	সুরমা, ধন্যা
ইন্দ্রনীল	মহাকান্তা	গঙ্গাদ্বার	নারায়নী
	রত্নাবেশা		বৈষ্ণবী
মহানাদ	মাহেশ্বরী	বদরীতীর্থ	শ্রীবিদ্যা
মহাবন	মহাতেজা	রামতীর্থ	মহাধৃতি
জয়ন্ত	জয়ন্তী	কাঞ্চী	কনককাঞ্চী
বৈজয়ন্ত	অপরাজিতা	অবন্তী	অতিপাবনী
	বিজয়া	বিদ্যাপুর	বিদ্যা
	মহাশুদ্ধি		
সারদা	সারদা	নীলপর্ব্বত	বিমলা
সুভদ্র	ভদ্রদা	সেতুবন্ধ	রামেশ্বরী
ভদ্রকালেশ্বর	ভবা, মহাভদ্রা,	পুরুষোত্তম	বিমলা
	মহাকালী		
ছয়তীর্থ	গবেশ্বরী	নাগাপুরী	বিরজা
বিদিশা	বেদদা	ভদ্রাশ্ব	ভদ্রকর্ণিকা
বেদ মস্তক	বেদমাতা	তমোলিপ্তি	তমোঘ্নী
যুবতী	মহাবিদ্যা	সাগর সঙ্গম	স্বাহা
মহানদী	মহোদয়া	মঙ্গলকোট	মঙ্গলা
ত্রিপাদ	চণ্ডা	রাঢ়	মঙ্গল চণ্ডিকা
		শিবাপীঠ	জ্বালামুখী
ছাগলিঙ্গ	বলিপ্রিয়া	মন্দর	ভূবনেশ্বরী
মাতৃদেশ	জগন্মাতা	করবীপুর	সতী
মানব	রঙ্গিনী	সপ্তগোদাবরতীর্থ	পরমেশ্বরী
দেবর্ষি	অখিলেশ্বরী	অযোধ্যা	ভবানী

স্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী	স্থান	অধিষ্ঠাত্রী দেবী
মথুরা	মাধবী, দেবকী, যাদবেশ্বরী		জয়মঙ্গলা
বৃন্দাবন	বৃন্দা, গোপেশ্বরী, রাধা, কাত্যায়নী, মহামায়া, ভদ্রকালী, কলাবতী, চন্দ্রমালা, মহাযোগীণী, মহাযোগিন্দ্রধীশ্বরী, বজ্রেশ্বরী, যশোদা ব্রজগোকুলেশ্বরী।		

এর পর সামান্য আর একটু নতুন সংযোজন। এত বর্ণনার পরও পাওয়া যাচ্ছে নতুন কিছু শাক্ত পীঠস্থান যেখানে রয়েছেন দেবতা এবং শিব একাম্নপীঠের দেবতা ও শিবের মতই। সুতরাং সেটুকুও তুলে দিচ্ছি শেষ করবার আগে। যেমন,—

স্থান	দেবতা	শিব
অমরেশ	চণ্ডিকা মহেশ্বরী	কুশতুঙ্গার
প্রভাস	পুষ্করেক্ষণা	সোমনাথ
নিমিষ	প্রজ্ঞা, শিবানী	মহেশ্বর
পুষ্কর	পুরহূতা	রাজগন্ধি
শ্রীপর্বত	মায়াবী, শঙ্করী	ত্রিপুরান্তক, শ্রীশঙ্কর
জলেশ্বর	ত্রিশূলিনী	ত্রিশূলী
আম্রাতকেশ্বর	সূক্ষ্মা	সূক্ষ্ম
গণক্ষেত্র	মঙ্গলা	প্রপিতামহ
কুরুক্ষেত্র	স্থানুপ্রিয়া	স্থানু
ইষ্টনাভ	স্বায়ম্ভুবা	স্বয়ম্ভু
কনখল	শিববল্লভা	উগ্র
অট্টহাস	মহানন্দা	মহানন্দ
বিমলেশ্বর	বিশ্বপ্রিয়া	বিশ্বশম্ভু
মহেন্দ্র	মহান্তকা	মহান্তক

স্থান	দেবতা	শিব
ভীমপীঠ	ভীমেশ্বরী	ভীমেশ্বর
বস্ত্রাপথ	ভূবনেশ্বরী	ভব
অদ্রিকূট	রুদ্রাণী	মহাযোগী
অবিমুক্ত	বিশালাক্ষি	মহাদেব
গোকর্ণ	শিব ভদ্রা	মহাবল
ভদ্রকর্ণ	ভদ্রা, কর্ণিকা	মহাদেব
সুপর্ণ	উৎপলা	সহস্রাক্ষ
স্থানুপীঠ	শ্রীধরা	জানু
কমলালয়পীঠ	কমলাক্ষি	কমল
অরণ্য	সন্ধ্যা	উর্দ্ধরেতা
মাকোট	মুণ্ডকেশ্বরী	মহাকোট

আপাততঃ শেষ এখানেই। যদি পুণ্যপ্রয়াসী ও সন্ধানীদের সামান্য কাজেও আসে এ-লেখা তাহলে পীঠ সম্পর্কে আরো কিছু নতুন বর্ণনার আশা রেখে শেষ করছি বর্তমান রচনা।

—: শুদ্ধিপত্র :—

[যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য প্রথম দিকের দুটো ফর্মার বিভিন্ন পৃষ্ঠাতে 'আ'কার 'ই'কার গেছে ভেঙে। অক্ষর গেছে স্থানচ্যুত হয়ে নতুন করে অক্ষর সন্নিবেশের সময় অবধারিত রূপে মুদ্রণ প্রমাদও দেখা দিয়েছে বেশ কিছু। অত্যন্ত বেদনা দায়ক ত্রুটি গুলির প্রতি সেই জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পাঠকদের। নিশ্চয়ই তাঁরা ক্ষমার চোখে দেখবেন সেই ত্রুটি গুলি। নিচে বেদনা দায়ক কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদের শুদ্ধি পত্র দেওয়া হল এই ভাবে :—]

পৃঃ	লাইন	ভুল	শুদ্ধ
৭	২৪	বেডাল	বেড়াল
৭	২৪	দষ্টি	দৃষ্টি
৯	১০	বেশা	বেশী
১০	৭,	বে ধহয়,	বোধহয়
১০	২৬	মা,	মা
১১	৮	ম	মা
১২	১১	শল্পীরা	শিল্পীরা
১২	১২	আকবার	আঁকবার
১২	১৩	আকেন	আঁকেন
১৪	২	আধ্যাত্ম	অধ্যাত্ম
১৫	৮, ১৮	শিক্ষত, মুতিটির	শিক্ষিত, মূর্তিটির
১৫	২৫	প্রতিপালিক	প্রতিপালিকা
১৬	৯	ধরণের	ধরনের (এরকম ভুল আরও কিছু আছে)
২৫	১৬	অংশে	অংশ
২৫	২৪	আর্য সাধনায়	আর্ধ-সাধনায়
২৬	২	িতার	পিতার

পৃঃ	লাইন	ভুল	শুদ্ধ
২৭	২১	পার্বতী দুর্গার	পার্বতী-দুর্গার
২৭	২১	কেশরী সিংহের	কেশরী-সিংহের
২৮	১৮	যার	যার
৩১	১২	আর্টেমিম	আর্টেমিস্
৩১	১৩	ননইয়ার	নণইয়ার
৩৪	২২	অনুকুল্যে	আনুকুল্যে
৩৪	২৫	তুকতাককারিনী	তুক্তাক্কারিণী
১৭৬	১৯	বাঁনর	বানর
১৬৬	১৬	করেণ	করেন